নূহ সম্প্রদায় এক ভয়ঙ্কর
বন্যায় নিমজ্জিত হল . . .
অবিশ্রান্ত বালুঝড়ে প্রোথিত
হয়েছিল আ'দ জাতি . . .
পায়ুকামী লূত সম্প্রদায় আগ্নেয় গিরির
লাভা ও ভূমিকম্পে
পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় . . . .
ফেরাউনের সেনাবাহিনী সমুদ্রে
অন্তর্হিত হল
আরও বহু অতীত সম্প্রদায়
নাস্তিকতার কারণে পৃথিবী
পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে . . .
কোরআনে বর্ণিত এই সকল জাতি
কিভাবে নির্মূল হয়ে গেল— তাই
পর্যবেক্ষণ করেছে এই বইখানা।
বইটি এ সকল সম্প্রদায়গুলোর
দলিলাদির সাক্ষ্য - প্রমাণ,
প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যাবলী এবং
ঐতিহাসিক নথিপত্র উপস্থাপন করছে।

খোশরোজ কিতাব মহল
১৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১১৭০৮৪, ৭১১৭৭১০

নূহ (আঃ)-এর মহাপ্লাবন এবং নিমজ্জিত ফেরাউন

নূহ (আঃ)-এর মহাপ্লাবন এবং নিমজ্জিত ফেরাউন
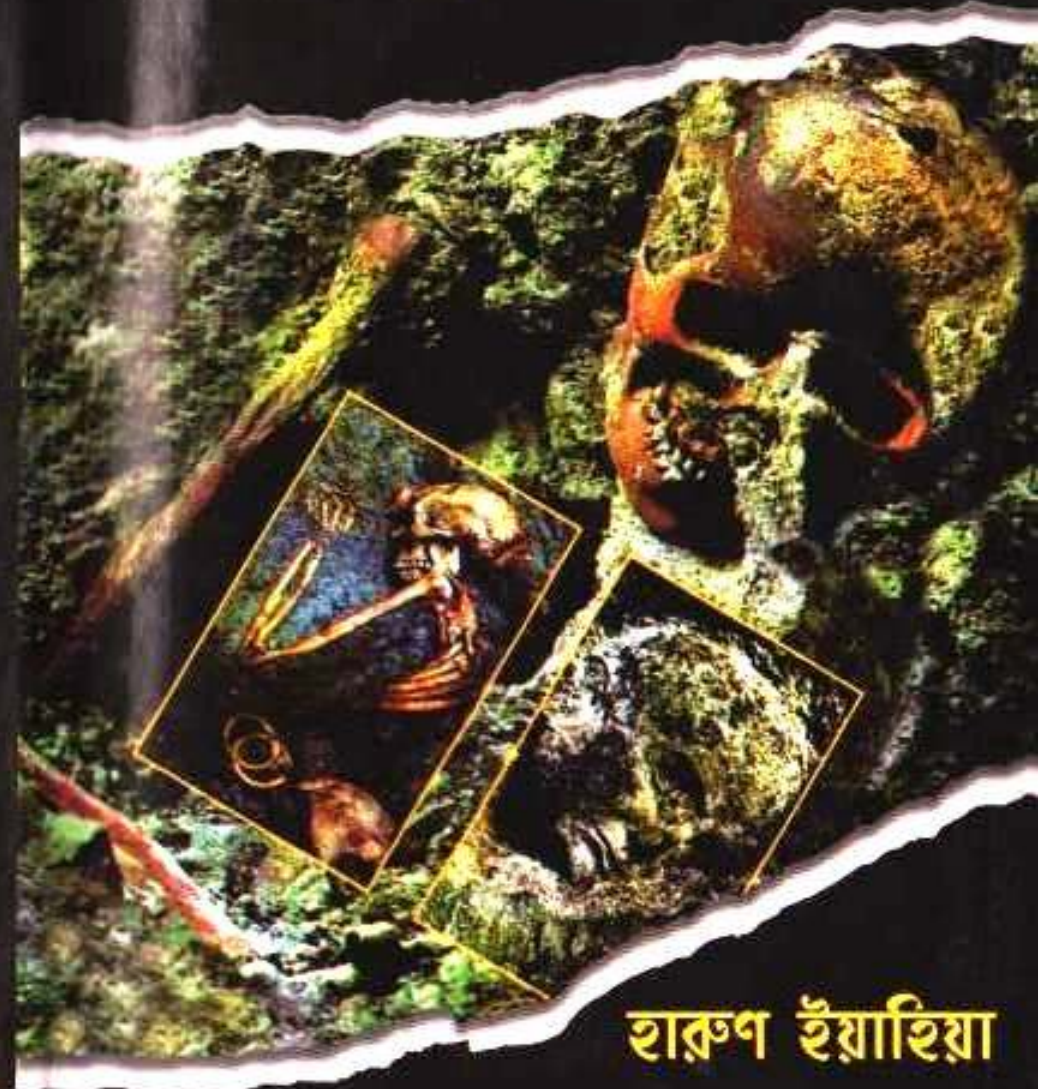
হারুণ ইয়াহিয়া

নূহ (আঃ)-এর মহা প্লাবন

এবং

নিমজ্জিত ফেরাউন

মূল

হারুণ ইয়াহিয়া

ভাষান্তর

ডাঃ উম্মে কাউসার হক

উম্মে মোহসিনা

খোশরোজ কিতাব মহল

১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ৭১১৭০৮৪, ৭১১৭৭১০

প্রকাশক
মহীউদ্দীন আহমদ
খোশরোজ কিতাব মহল
১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৭০৫৪, ৭১১৭৭১০

প্রথম বাংলা সংস্করণ : মে, ২০০৫

ISBN 984 - 438 - 017 - 0

মূল্য : তিনশত টাকা মাত্র

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ
পেপার প্রসেসিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড
১০৯ হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন ৭১২০০৫৩, ৭১২০০১২

Bengali Translation of Perished Nations by Harun Yahya
Translated by Dr. Umme Kawser Haque and
Umme Mohsina

পাঠকের প্রতি

লেখকের প্রতিটি গ্রন্থেই বিশ্বাস-সম্পর্কিত (আকীদা-সংক্রান্ত) বিষয়গুলো কোরআনের আয়াতসমূহের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর মানবসমাজকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে আল্লাহ তায়ালার বাণীসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে সেগুলো অনুসরণের মাধ্যমে জীবনকে পরিচালিত করার জন্য। আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেন তা পাঠক সাধারণের মনে কোন ধরনের সন্দেহের উদ্রেক না করে কিংবা কোন প্রশ্ন রেখে না যায়। এখানে আন্তরিক, সরল আর সাবলীল রচনাশৈলীর ব্যবহার করা হয়েছে। যেন সব বয়সের এবং সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ এই গ্রন্থগুলোর বিষয়বস্তু সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। মনে দাগ কেটে যাওয়া এই প্রাঞ্জল কাহিনীগুলো গ্রন্থটিকে পাঠকের পক্ষে মাত্র এক বৈঠকেই শেষ করে উঠতে পারাকে সম্ভব করে তুলেছে। এমন কি যারা আধ্যাত্মিকতা বিষয়টিকে প্রচণ্ডভাবে অস্বীকার করে, তারাও এই গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত প্রকৃত সত্যগুলো পড়ে প্রভাবিত হয়ে যায় ; আর তাই এগুলোর বিষয়বস্তুকে তারা আর অসত্য বা অমূলক বলে প্রতিপন্ন করতে পারে না।

এই গ্রন্থটিসহ লেখকের অন্যান্য রচনাবলী একাকী পড়া যায় কিংবা দলীয়ভাবেও আলাপ-আলোচনা করা যেতে পারে।

পাঠকদের মাঝে যারা এই গ্রন্থগুলো থেকে সুফল পেতে ইচ্ছুক, তারা এ অর্থে আলোচনা করে এই সুফলটি পাবেন যে, তারা তাদের নিজেদের ভাবনা ও অভিজ্ঞতা একে অপরের কাছে বর্ণনা করতে পারবেন।

তদুপরি, একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির নিমিত্তে লেখা এই গ্রন্থগুলোকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপনা ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে ধর্মের এক বিরাট সেবা করা হবে। লেখকের সবগুলো গ্রন্থই অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করে। এ কারণেই যারা লোকজনকে ধর্ম সম্পর্কে অবহিত করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য সবচাইতে কার্যকরী ব্যবস্থা হল এ গ্রন্থগুলো পড়ার ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহিত করা।

আশা করছি যে, পাঠকগণ গ্রন্থখানির শেষের পৃষ্ঠাগুলোতে দেয়া আরও কিছু বইয়ের পরিচিতিমূলক আলোচনায় কিছু সময় নিয়ে চোখ বুলিয়ে যাবেন, আর বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট উৎসসমূহের– যা খুবই উপকারী, পড়তেও আনন্দদায়ক– সঠিক মূল্যায়ন করবেন।

এই গ্রন্থগুলোতে, আর সকল গ্রন্থের মত লেখকের ব্যক্তিগত মতামত, সন্দেহজনক (অনির্ভরযোগ্য) সূত্র থেকে নেয়া ব্যাখ্যাবলী, এমন রচনাশৈলী যা পবিত্র বিষয়াবলীতে সম্মান ও গভীর শ্রদ্ধা ও প্রদর্শনে অমনোযোগী, হতাশাব্যঞ্জক, সংশয় উদ্রেককারী এবং নৈরাশ্যজনক বর্ণনা যা পাঠকের অন্তরে বিচ্যুতির সৃষ্টি করে– এগুলোর কোন কিছুই পাবেন না।

লেখক পরিচিতি

এ গ্রন্থের লেখকের ছদ্মনাম হারুণ ইয়াহিয়া। এ নামেই তিনি লেখালেখি করে আসছেন।

তিনি ১৯৫৬ সনে আংকারায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইস্তাম্বুলের মিমার সিনান ইউনিভার্সিটিতে শিল্পকলায় আর ইস্তাম্বুল ইউনিভার্সিটিতে দর্শন শাস্ত্রে পড়াশোনা করেন।

১৯৮০-র দশক থেকে তিনি রাজনৈতিক, ধর্মীয় বিশ্বাস-সংক্রান্ত ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রসঙ্গ নিয়ে বহু গ্রন্থ প্রকাশ করে আসছেন। গ্রন্থকার হিসেবে হারুণ ইয়াহিয়া নামটি সুপরিচিত যিনি বিবর্তনবাদীদের প্রবঞ্চনা, তাদের দাবিসমূহের অসারতা, আর ডারউইনবাদ ও রক্তপাতে বিশ্বাসী ভাবাদর্শের মধ্যকার যোগাযোগ এসব বিষয় ফাঁস করে দিয়ে খুবই গুরুত্বসম্পন্ন বহু গ্রন্থ লিখেছেন।

তার ছদ্মনামটি 'হারুণ' ও 'ইয়াহিয়া' এই দুটি নাম নিয়ে গঠিত। দু'জন সম্মানিত নবীর নামে এই দু'টি নাম নেয়া হয়েছে, যে নবীদ্বয় অবিশ্বাসীগণের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন।

লেখকের গ্রন্থগুলোর (মূল ইংরেজী গ্রন্থের) প্রচ্ছদসমূহে যে সীল রয়েছে তাতে এদের বিষয়সমূহের সংযোগে প্রতীকী অর্থ রয়েছে। এই মোহর আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ গ্রন্থ ও বাণী হিসেবে কোরআনকে এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে সকল নবীর শেষ নবী হিসেবে তুলে ধরে। পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা পরিচালিত হয়ে লেখক তার মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে এটা ধরে নিয়েছেন যে তিনি যেন অবিশ্বাস জন্মানো ভাবাদর্শগুলোর প্রতিটি মৌলিক বিশ্বাসকে ভুল বলে প্রমাণিত করেন আর এমনভাবে তিনি তার 'চূড়ান্ত কথা' বলে দিতে চান, যা ধর্মের বিরুদ্ধে উত্থাপিত

আপত্তিসমূহ সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ করে দিতে পারে। সর্বোচ্চ প্রজ্ঞা ও নৈতিক পূর্ণতা অর্জনকারী নবী (সঃ)-এর সীল বা মোহরটি লেখকের এই শেষ কথাটি বলার আন্তরিক ইচ্ছা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে।

লেখকের এ সব কার্যাবলী একটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে ঃ তাহল মানুষের কাছে কোরআনের বার্তা পৌঁছে দেয়া, আর আকীদা বা মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কিত বস্তুগুলো যেমন আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর একত্ববাদ ও পরকাল এগুলো সম্বন্ধে চিন্তা করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী স্মরণ করিয়ে দেয়া।

লেখক হারুণ ইয়াহিয়া ভারতবর্ষ, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, পোল্যাণ্ড, বসনিয়া, স্পেন, ব্রাজিল ইত্যাদি নানা দেশের পাঠকদের অনুরাগ অর্জন করেছেন। অসংখ্য ভাষায় তার গ্রন্থগুলো অনূদিত হয়েছে আর ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়ান, পর্তুগীজ, উর্দু, আরবী, আলবেনিয়ান, রাশিয়ান, বসনিয়ান (সার্বো ক্রোট), তুর্কী ও ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় অনূদিত তাঁর গ্রন্থসমূহ পাওয়া যাচ্ছে। (বর্তমানে বাংলা ভাষায়ও কয়েকটি গ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে)।

পৃথিবীর সর্বত্র অত্যন্ত সমাদৃত এই সৃষ্টিকর্মগুলো, বহু লোকের আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং আরও অনেক মানুষের ক্ষেত্রে তাদের ঈমানের গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করার ক্ষেত্রে, নিমিত্ত বা উপায় স্বরূপ কাজ করছে। এই গ্রন্থগুলোতে যে প্রজ্ঞা, আর আন্তরিক ও সহজে বোধগম্য শৈলী ব্যবহৃত হয়েছে তা গ্রন্থগুলোতে এক স্বতন্ত্র ছোঁয়া রেখে গিয়েছে, ফলে যারা এই গ্রন্থগুলো পাঠ ও পর্যবেক্ষণ করে তাদের প্রত্যক্ষভাবে নাড়া দেয়। আপত্তিকর প্রভাবমুক্ত এই লেখাসমূহে দ্রুত কার্যকারিতা, সুস্পষ্ট ফলাফল, অকাট্যতা এসব গুণাবলীমণ্ডিত বৈশিষ্ট্যাবলী বিদ্যমান রয়েছে। গ্রন্থগুলোতে যে ব্যাখ্যাবলী প্রদান করা হয়েছে তা অবশ্যস্বীকার্য, সুস্পষ্ট এবং আন্তরিক আর এগুলো সুস্পষ্ট উত্তরের মাধ্যমে পাঠকের মানোন্নয়ন ঘটে। যারা এই গ্রন্থগুলো পড়বেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করবেন তাদের পক্ষে আর কখনও আন্তরিকভাবে বস্তুবাদী দর্শন, নাস্তিকতা এবং অন্যান্য যেকোন ধরনের বিকৃত ভাবাদর্শ কিংবা দর্শনকে আন্তরিকতাসহ সমর্থন করা সম্ভব হবে না। এমনকি যদিও তারা সমর্থন করেই যায় ; সেগুলো হবে কেবল ভাবাবেগপূর্ণ জেদেরই প্রমাণ ; কেননা, এই গ্রন্থগুলো উক্ত ভাবাদর্শগুলোকে মূল বা ভিত্তি থেকেই অসত্য বা অমূলক প্রতিপন্ন করে। হারুণ ইয়াহিয়া কর্তৃক লিখিত গ্রন্থসমূহের বদৌলতে সমসাময়িক সব ধরনের নীতির বিপ্লব আজ আদর্শগতভাবেই পরাজিত হয়েছে।

এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, এগুলোর বৈশিষ্ট্যাবলী এদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞা ও সহজবোধ্যতারই ফলস্বরূপ। এটা নিশ্চিত যে, লেখক নিজেকে কখনও গর্বিত বোধ করেন না ; তিনি কেবল আল্লাহর সঠিক পথ সন্ধানের ক্ষেত্রে কারো উপায় হিসেবে সাহায্য করে যাওয়ার সংকল্প করেন। অধিকন্তু, লেখক তার গ্রন্থগুলো থেকে পার্থিব কোন লাভ অর্জনের চেষ্টা করেন না। এই লেখক তো নয়ই, এমনকি অন্য যাঁরাই এই গ্রন্থগুলোর প্রকাশ কিংবা পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার কাজে জড়িত, তারা কেউই পার্থিব কোন লাভ অর্জন করেন না। তাঁরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই কাজ করে যাচ্ছেন।

এসব তথ্যগুলো বিবেচনা করে, যারা মানুষের অন্তরের চোখ খুলে দেয়ার এবং মানুষকে আল্লাহর আরো অধিক অনুরক্ত বান্দা হওয়ার জন্য পরিচালনাকারী এই গ্রন্থগুলো সবাইকে পড়ার জন্য উৎসাহিত করবেন, তাঁরা অমূল্য এক সেবা করে যাবেন নিঃসন্দেহে।

ইতিমধ্যে, যেসব গ্রন্থ মানুষের অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করে, ভাবাদর্শগত বিভ্রান্তির দিকে মানুষকে পরিচালিত করে, এবং মানুষের মনের সন্দেহ দূর করতে যে গ্রন্থগুলোর সুস্পষ্টভাবে কোন শক্তিশালী ও সঠিক প্রভাব নেই, সেগুলো প্রচার হবে কেবলই সময় ও শক্তির অপচয় মাত্র। এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, পথ হারিয়ে ফেলা থেকে মানুষকে মুক্ত করা ছাড়া শুধুমাত্র লেখকের সাহিত্যিক দক্ষতার উপর জোর দিয়ে রচিত গ্রন্থের পক্ষে এমন বড় ধরনের প্রভাব ফেলা অসম্ভব। এটা যারা সন্দেহ করে, তারা সহজেই দেখতে পাবে যে হারুণ ইয়াহিয়ার বইগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবিশ্বাসের বিষয়গুলোকে পরাভূত করা আর কোরআনের

নৈতিক মূল্যবোধগুলো সর্বত্র প্রচার করা। এই সেবাকর্ম যে ধরনের সাফল্য, প্রভাব কিংবা আন্তরিকতা অর্জনে সাহায্য করে তা পাঠকদের বিশ্বাস উৎপাদন থেকেই প্রকাশিত হয়।

একটি বিষয় মনে রাখা দরকার ; মুসলমানগণ আজ যে অবিরত নিষ্ঠুরতা, দ্বন্দ্ব আর যেসব অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছে তা ধর্মহীন, আদর্শগত প্রচারেরই ফল। এগুলোর অবসান হতে পারে বিশ্বাসহীন ভাবাদর্শের পরাজয়ের মাধ্যমে এবং এটা নিশ্চিত করার মাধ্যমে যে প্রতিটি ব্যক্তি সৃষ্টির রহস্য ও কোরআনের মূল্যবোধ সম্পর্কে এমন জ্ঞান রাখে যেন তার মাধ্যমে জীবনযাপন করতে পারে। পৃথিবীর এখনকার হালচাল বিবেচনা করলে, যা মানুষকে সহিংসতা, দুর্নীতি ও দ্বন্দ্বের সর্পিল নিম্নগতির দিকে পরিচালিত করতে বাধ্য করছে, এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই কাজটি আরো দ্রুতগতিতে ও কার্যকরীরূপে করা দরকার। অন্যথায় তা অত্যন্ত বিলম্ব হয়ে যাবে।

এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে হারুণ ইয়াহিয়ার ধারাবাহিক সৃষ্টিকর্মগুলো এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আল্লাহর ইচ্ছায়, একবিংশ শতাব্দীতে মানুষেরা কোরআনে প্রতিশ্রুত শান্তি ও রহমত, সুবিচার ও সুখের সন্ধান খুঁজে পাওয়ার উপায় খুঁজে পাবে তাঁর লেখা গ্রন্থগুলোর মাধ্যমে।

মুখবন্ধ

"এগুলো হচ্ছে কতিপয় জনপদের ইতি কথা যা আমি আপনার কাছে বর্ণনা করছি, ওসবের কতিপয় তো এখনও বিদ্যমান আছে, আর কতিপয় তো সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়ে গিয়েছে।

আর আমি তাহাদের প্রতি কোন অবিচার করি নাই, বরং তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করিয়াছে, অনন্তর তাহাদের কোনই উপকারে আসিল না, তাহাদের সেই সমস্ত মা'বুদ যাহাদের তাহারা বন্দেগী করিয়াছিল আল্লাহকে বর্জন করিয়া, আপনার প্রভুর আদেশ যখন আসিল ; (তাহারা তাহাদের রক্ষা করা দূরে থাকুক) বরং বিপরীতক্রমে তাহাদের আরো ক্ষতি সাধন করিল।

— সূরা হূদ : ১০০-১০১

আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন, দিয়েছেন তাকে শারীরিক এবং আত্মিক রূপ, তাকে এক নির্দিষ্ট পথে জীবনযাপন করার তৌফিক দিয়েছেন এবং তারপর অবশেষে তিনিই তার মৃত্যু ঘটিয়ে নিজের সান্নিধ্যে হাজির করবেন।

আল্লাহ মানব জাতির সৃষ্টিকর্তা এবং এই আয়াতের বক্তব্য অনুসারে :

"আর তিনি কি জানিবেন না যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন ?

— সূরা মূলক : ১৪

তিনিই তাদেরকে সবচেয়ে ভালভাবে জানেন ও চেনেন আর তিনিই তাদের শিক্ষা দেন ও তিনিই তাদের প্রয়োজনসমূহ মেটান।

আর তাই মানবজীবনের একমাত্র প্রকৃত উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তায়ালার গুণগান করা, তাঁরই কাছে প্রার্থনা করা এবং তাঁরই উপাসনা করা। ঠিক একই কারণে, নবীগণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার যে পবিত্র বার্তা ও গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা হয়েছে– তাই মানবজাতির একমাত্র পথচালিকা।

পবিত্র কোরআন আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত সর্বশেষ ও একমাত্র অবিকৃত গ্রন্থ। সে কারণেই আমাদের কর্তব্য পবিত্র কোরআনকে জীবনের সত্যিকারের পথনির্দেশ (চালিকা) হিসেবে গ্রহণ করা। এতে বর্ণিত সকল আদেশ এবং নিষেধ মেনে চলার জন্য অত্যন্ত যত্নবান ও মনোযোগী হওয়া। ইহকাল ও পরকালে নাজাত প্রাপ্তির এটাই একমাত্র পথ।

সুতরাং, আমাদের উচিত অত্যন্ত যত্ন আর মনোযোগের সাথে পবিত্র কোরআনে আমাদের উদ্দেশ্যে বর্ণিত বিষয়গুলো অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করা এবং এগুলোর উপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা (অনুধ্যান) করা। পবিত্র কোরআনেই মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ এই পবিত্র গ্রন্থ নাজিলের উদ্দেশ্য হল, মানুষকে ভাবনার জগতে পরিচালনা করা (চিন্তা-ভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করা) ঃ

> "ইহা (কোরআন) হইল, মানুষের জন্য বিধানসমূহের বার্তা এবং তাহারা যেন তাহা দ্বারা সতর্ক হয় এবং যেন এই বিশ্বাস করে যে, তিনিই প্রকৃত মা'বুদ এবং যেন জ্ঞানবান লোকেরা উপদেশ অর্জন করে।"
>
> — সূরা ইবরাহীম ঃ ৫২

পবিত্র কোরআনের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে পূর্ববর্তী (অতীত) সম্প্রদায়সমূহের তথ্যাবলী। আর এগুলো এমনই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাদের উপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। এই সম্প্রদায়গুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাদের কাছে প্রেরিত নবীগণকে অস্বীকার করেছে। তাঁদের (নবীগণের) প্রতি বিদ্বেষও পোষণ করেছে। তাদের এ ধরনের ধৃষ্টতার কারণে তারা নিজেরাই নিজেদের উপর আল্লাহ তায়ালার ভয়ানক রোষানল বহন করে নিয়ে এসেছে এবং পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্নও হয়ে গেছে।

ধ্বংসযজ্ঞের এই ঘটনাসমূহ যে পরবর্তী বংশধরদের জন্য সাবধান বাণী বহন করছে এটাই পবিত্র কোরআন আমাদের অবহিত করছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধাচরণ করার ফলে ইহুদীদের একটি দলের উপর যে শাস্তি নেমে এসেছিল তা কোরআনে বর্ণনা করার পরপরই বলা হয়েছে।

> "তাই আমরা ইহাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ রাখিয়া দিলাম তাহাদের নিজেদের সময়ের জন্য এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এবং ইহা এক ধরনের শিক্ষা তাহাদের জন্য, যাহারা আল্লাহকে ভয় করে।
>
> — সূরা বাকারা ঃ ৬৬

এই গ্রন্থে আমরা এমন কতিপয় অতীত সম্প্রদায়ের আলোচনা করব, যারা আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে নির্মূল হয়ে গিয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য হল, এসব ঘটনাবলীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা, যেগুলোর প্রতিটিই "তাদের নিজস্ব কালের উদাহরণ" যেন তা "হুঁশিয়ারি বাণী" হিসেবে বিবেচিত হয়।

দ্বিতীয় যে কারণে আমরা এই ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনাসমূহের অনুসন্ধান করছি সেটা হল কোরআনের পবিত্র বাণীগুলোর যে বাহ্যিক প্রকাশ বা লক্ষ্য এই পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে তা দৃষ্টিগোচর করানো এবং এই মহাগ্রন্থের বর্ণনাসমূহের সত্যতা প্রমাণ করে দেখানো।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা সত্য প্রত্যয়ন (সত্য বলে ঘোষণা) করে বলেছেন যে বাহ্যিক পৃথিবীতে তাঁর আয়াতসমূহের ফলিত ও গুরুত্বের প্রতিফলন পর্যবেক্ষণ করা যায়।

> "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি শীঘ্রই তোমাদের নিকট তাঁহার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করিবেন, আর তোমরা তাহাদের জানিতে পারিবে।
>
> — সূরা নামল ঃ ৯৩

আর ঈমানের দিকে নিজেকে পরিচালিত করার প্রাথমিক উপায় ঐ নিদর্শনগুলোকে জানা ও সনাক্ত করতে পারা।

বর্তমানকালে, ঐতিহাসিক দলিলপত্র ঘেঁটে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপায়ে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর মাধ্যমে কোরআনে উল্লেখিত ধ্বংসাত্মক ঘটনাবলীর প্রায় সবগুলোই 'পর্যবেক্ষণ' ও 'সনাক্ত' করা সম্ভব হয়েছে। এই গ্রন্থে আমরা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত ঘটনাসমূহের সামান্য একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। [এটা লক্ষণীয় যে, পবিত্র কোরআনে বর্ণিত কিছু সম্প্রদায়ের কথা এই গ্রন্থের আওতায় আনা হয়নি, কেননা কোরআনে এই ঘটনাগুলোর নির্দিষ্ট সময় ও স্থানের উল্লেখ নেই। কেবল এই সম্প্রদায়গুলোর বিদ্রোহী আচরণ ও আল্লাহর নবীগণের প্রতি তাদের সক্রিয় বিরোধিতার কারণেই এগুলো বর্ণিত হয়েছে। যেসব কারণে তাদের উপর আল্লাহ তায়ালার যে গজব নেমে এসেছিল তা বর্ণনা করার জন্যই কোরআনে তাদের উল্লেখ রয়েছে। এভাবে মানব সমাজ যেন তাদের থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে এ আহবানও জানান হয়েছে।]

আমাদের উদ্দেশ্য সমসাময়িক আবিষ্কার ও উদঘাটনের মাধ্যমে কোরআনে বর্ণিত প্রকৃত সত্য ঘটনাগুলোর উপর আলোকপাত করা। আর এভাবেই, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলকেই আল্লাহর ধর্মের সত্যতা প্রদর্শন করা।

ভূমিকা

আদি প্রজন্মসমূহ

"ইহাদের নিকট কি তাহাদের পূর্বে যাহারা অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের (শাস্তি ও নিপাতের) সংবাদ পৌঁছে নাই ? যথা ঃ নূহ ও আ'দ এবং সামুদের বংশধরগণ এবং ইবরাহিমের বংশধরগণ, মাদায়েনবাসীগণ আর বিধ্বস্ত জনপদ (অর্থাৎ লূত -এর বংশধরগণ)। তাহাদের নিকট তাহাদের পয়গম্বরগণ স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ লইয়া আগমন করিয়াছিলেন। অতএব আল্লাহ তো তাহাদের প্রতি কোন অবিচার করেন নাই বরং তাহারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করিয়াছিল।"

— সূরা তওবা ঃ ৭০

মানব সৃষ্টির লগ্ন থেকেই, মানব জাতির প্রতি নবীগণের মাধ্যমে যেসব পবিত্র বার্তাসমূহ প্রেরিত হয়েছে সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের অবহিত করে এসেছেন। কোন কোন সমাজ-গোষ্ঠী বার্তাগুলোকে মেনে নিয়েছে। আবার কখনও বা অন্যরা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। কখনো কখনো সমাজের সংখ্যালঘু অংশ এই বার্তাগুলোকে গ্রহণ করে নবীগণকে অনুসরণ করেছে।

বহুক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় বাণীগুলো প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু তারা তা মেনে নেয়নি। তারা শুধু নবীগণের প্রচারিত বার্তাসমূহকে অশ্রদ্ধা করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তারা নবীগণ ও তাদের অনুসরণকারীদের নানাভাবে ক্ষতি করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। নবীগণের বিরুদ্ধে তারা সাধারণত মিথ্যাবাদ, যাদু, মস্তিষ্ক বিকৃতি, মন ভুলানো বাক্যের ব্যবহার ইত্যাদি নানা ধরনের অপবাদ দাঁড় করাত আর এমনকি বহু সম্প্রদায়ের নেতা তাদের (নবীগণকে) হত্যার উপায় বা পথ খুঁজে বেড়াত।

জনগণ যেন আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করে এটাই নবীগণ তাঁদের জনগণের কাছে প্রত্যাশা করতেন। বিনিময়ে তাঁরা (নবীগণ) কোন ধরনের অর্থাদি কিংবা অন্য কোন পার্থিব বিষয়াদি অর্জনের আকাঙ্খা

পোষণ করতেন না। এ ব্যাপারে তাঁরা লোকদের জোর-জবরদস্তি করার প্রচেষ্টায়ও লিপ্ত হননি। তাঁরা যা করতেন, তা তাদের সম্প্রদায়কে সত্য ধর্মের দিকে দাওয়াত দেয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না ; আর তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায় থেকে পৃথকভাবে নিজেদের অনুসারীগণকে নিয়ে এক ভিন্ন পথে জীবনযাপন করার আকাঙ্খা করতেন।

মাদায়েনবাসীদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন, শো'আইব (আঃ)। তিনি ও মাদায়েনবাসীগণের মাঝে যা ঘটেছিল তা পুর্বোল্লেখিত পয়গম্বর-সম্প্রদায় সম্পর্ক চিত্রিত করে। শো'আইব (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে আহবান করেছিলেন যেন তারা আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান আনে এবং তাদের চালিয়ে আসা অবিচার-অনাচার ত্যাগ করে। এতে করে তাঁর সম্প্রদায় যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আর যেভাবে তারা এই পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে যায়, তা অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক।

"আর আমি মাদায়েনবাসীগণের নিকট তাহাদের ভ্রাতা শো'আইব- কে পাঠাইলাম, তিনি বলিলেন, হে আমার কওম ! তোমরা (কেবল) আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নাই। আর তোমরা পরিমাপ ও ওজনে কম করিও না, আমি তোমাদিগকে স্বচ্ছল অবস্থায় দেখিতেছি, আর আমি তোমাদের উপর এমন দিনের আযাবের আশঙ্কা করিতেছি, যাহা নানাবিধ বিপদের সমষ্টি হইবে।

আর হে আমার কওম ! তোমরা পরিমাপ ও ওজনে পরিপূর্ণতা বজায় রাখ আর লোকদের তাহাদের প্রাপ্য বস্তু হইতে হ্রাস করিয়া দিও না, আর জগতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকরতঃ সীমাতিক্রম করিও না।

আর আল্লাহ প্রদত্ত (হালাল মাল হইতে) যাহা অবশিষ্ট থাকে উহা তোমাদের জন্য (এই হারাম উপার্জন অপেক্ষা) উত্তম যদি তোমরা বিশ্বাস কর, আর আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক তো নহি।

তাহারা বলিতে লাগিল, হে শো'আইব ! তোমার ধর্মনিষ্ঠা কি তোমাকে (এইরূপ) শিক্ষা দিতেছে যে, আমরা সেই সমস্ত বস্তু বর্জন করিয়া দেই যাহাদের উপাসনা আমাদের পূর্বপুরুষেরা করিয়া আসিয়াছে ? অথবা এই বিষয় পরিত্যাগ করিয়া দেই যে, আমরা আমাদের সম্পদে যথেচ্ছ ব্যবস্থা অবলম্বন করি ? বাস্তবিকই তুমি হইতেছ বড় জ্ঞানবান, ধর্মপরায়ণ।

শো'আইব বলিলেন, হে আমার কওম ! আচ্ছা বলত, আমি যদি স্বীয় প্রভুর স্পষ্ট প্রমাণের উপর (প্রতিষ্ঠিত) থাকি এবং তিনি আমাকে আপন সান্নিধ্য হইতে একটি উত্তম সম্পদ (অর্থাৎ নবুওয়াত) প্রদান করেন, তবে আমি কিরূপে প্রচার না করিয়া থাকিতে পারি ? আর আমি না ইহা চাহিতেছি যে, আমি তোমাদের বিপরীত সেই সমস্ত কাজ করি, যাহা হইতে আমি তোমাদিগকে বাধা দিতেছি। আমি তো কেবল আমার সাধ্যানুযায়ী সংস্কার চাহিতেছি। আর আমার যাহা কিছু তওফিক হয় কেবল আল্লাহর সাহায্যেই হইয়া থাকে। তাঁহার উপর ভরসা রাখি এবং (প্রত্যেক বিষয়ে) তাঁহারই প্রতি রুজু করিতেছি।

আর হে আমার কওম ! আমার সহিত মতানৈক্য ও (শত্রুতা) যেন তোমাদের এমন আচরণে লিপ্ত না করে যদ্দ্বারা তোমাদের উপর অনুরূপ বিপদসমূহ আপতিত হয় যেরূপ বিপদসমূহ নূহ সম্প্রদায় অথবা হুদ সম্প্রদায় অথবা সালেহ সম্প্রদায়ের প্রতি আপতিত হইয়াছিল, আর লূত সম্প্রদায়তো তোমাদের (এ যুগ) হইতে (তেমন) দূরবর্তী (যুগের) নহে।

আর তোমরা আপন প্রভু সকাশে ক্ষমা চাও, তৎপর তাহার প্রতি নিবিষ্ট থাক। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অতিশয় দয়াবান অতীব প্রেমময়।

তাহারা বলিল, হে শো'আইব ! তোমার অনেক কথাই আমরা বুঝি না, আর আমরা তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বলই দেখিতেছি আর তোমার স্বজনবর্গ যদি না থাকিত, তবে আমরা প্রস্তর নিক্ষেপে তোমাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতাম, আর আমাদের দৃষ্টিতে তোমার কোন প্রতিভা (বড় পদমর্যাদা) নাই। আর তুমি তো আমাদের উপর শক্তিশালী নও।

শো'আইব বলিলেন, হে আমার কওম ! আমার স্বজনবর্গ কি তোমাদের নিকট আল্লাহ্ অপেক্ষাও প্রতিভাবান ? আর তোমরা তাঁহাকে (আল্লাহকে) পশ্চাতে নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছ ? প্রকৃতপক্ষে আমার প্রভু তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ বেষ্টন করিয়া আছেন।

আর হে আমার কওম ! তোমরা আপন অবস্থায় যেমন করিতেছ তেমন করিতে থাক, আমিও করিতেছি। শীঘ্র তোমরা জানিতে পারিবে, সেই ব্যক্তিকে যাহার উপর এমন আযাব আসন্ন, যাহা তাহাকে লাঞ্ছিত করিবে এবং কে ছিল মিথ্যাবাদী ? আর তোমরাও প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষায় আছি।

আর আমার আদেশ (আযাবের) যখন আগমন করিল, (তখন) আমি শো'আইবকে এবং যাহারা তাঁহার সহিত ঈমান আনিয়াছিল তাহাদেরকে আপন (বিশেষ) অনুগ্রহে রক্ষা করিয়া লইলাম, আর সেই জালিমদেরকে একটি বিকট নিনাদে আক্রমণ করিল, যেন সেই গৃহসমূহে কেহই বসত করে নাই। শুনিয়া লও, মাদায়েনবাসীরা রহমত হইতে তিরোহিত হইল যেমন হইয়াছিল সামূদ (কওম)।"

— সূরা হুদ ঃ ৮৪-৯৫

শো'আইব (আঃ), যিনি তাদের কেবল কল্যাণের দিকে আহবান ছাড়া অন্য কিছু করেননি, সেই নবীকে পাথর নিক্ষেপের পরিকল্পনা করতে গিয়ে মাদায়েনবাসীরা আল্লাহর তীব্র ক্রোধানলে পড়ে শাস্তি প্রাপ্ত হয়। আর উপরের আয়াতে যেমনভাবে বর্ণিত আছে, ঠিক তেমনিভাবে তারা নির্মূল হয়ে যায়। তবে মাদায়েনবাসীরাই একমাত্র উদাহরণ নয়। পক্ষান্তরে শো'আইব (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের সঙ্গে কথোপকথনের সময় অন্যান্য নানা অতীত সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেন যারা মাদায়েন সম্প্রদায়ের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। আর মাদায়েন সম্প্রদায়ের পরও অনেক সম্প্রদায় আল্লাহ তায়ালার রোষানলের শিকার হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা পূর্বে উল্লেখিত ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়গুলোর কথা আর তাদের থেকে যাওয়া অবশিষ্টাংশের কথা বর্ণনা করব। পবিত্র কোরআনে এই সম্প্রদায়গুলোর কথা সবিস্তারে বর্ণিত আছে এবং মানবসমাজকে আহবান করা হয়েছে তারা যেন গভীরভাবে ভেবে দেখে যে, কিভাবে এই সম্প্রদায়গুলোর পরিণতি ঘটেছিল। আর এ পরিণতি থেকে মানবসমাজ যেন শিক্ষা গ্রহণ করে, সে ব্যাপারেও পবিত্র কোরআনে মানবজাতিকে আহবান করা হয়েছে।

ঠিক এই স্থলে, কোরআন বিশেষভাবে এই সত্যটুকুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছে যে, লুপ্ত হয়ে যাওয়া এই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলো এক বড় ধরনের সভ্যতার বুনিয়াদ সৃষ্টি করেছিল। পবিত্র কোরআনে "ধ্বংসপ্রাপ্ত এই সম্প্রদায়গুলোর" এই বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

> **"আর আমি ইহাদের (মক্কাবাসীদের) পূর্বে বহু জাতিকে নিপাত করিয়া দিয়াছি, যাহারা তাহাদের অপেক্ষা শক্তিতে অধিক ছিল এবং দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত ; (কিন্তু আমার আযাব যখন আসিল তখন) তাহারা কোন পলায়নের স্থানই পাইল না।"**

— সূরা ক্বাফ ঃ ৩৬

আয়াতটিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর দু'টি বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রথমটি হল তাদের "শক্তিতে অধিক হওয়া"। এটা এ বার্তাই বহন করে যে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলো অত্যন্ত সুশৃঙ্খল আর শক্তিশালী সামরিক আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং তাদের শাসিত অঞ্চলে তারা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছিল। আর 'দ্বিতীয় বিষয়টি' হল, পূর্বোল্লেখিত সম্প্রদায়গুলো বড় বড় নগরী নির্মাণ করেছিল, সেগুলো কি-না স্থাপত্যকলার মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

এটাও লক্ষণীয় যে বর্তমান সভ্যতারও এ দুটি গুণ ও বৈশিষ্ট্যই রয়েছে; যারা কি-না বর্তমানের প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের মাধ্যমে বিস্তৃত এক বিশ্ব-সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করেছে, আর গড়ে তুলেছে কেন্দ্রীয় রাজ্যসমূহ, বিশাল নগরীসমূহ। কিন্তু তারা

ভুলে গিয়েছে যে একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতার সাহায্যেই এগুলো করা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে আর এভাবেই তারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার ও উপেক্ষাই করছে। কিন্তু আয়াতটিতে যেমন উল্লেখ রয়েছে যে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলো তাদের গড়ে তোলা সভ্যতা দিয়ে তাদের সম্প্রদায়কে টিকিয়ে রাখতে পারেনি কেননা আল্লাহকে অস্বীকারের উপর ভিত্তি করেই তাদের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

যতদিন না আজকের এই সভ্যতা আল্লাহকে অস্বীকার করে যাবে এবং নীতি বিগর্হিত কাজের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত তাদের পরিণাম (অতীত সম্প্রদায়গুলোর পরিণাম থেকে) ভিন্ন হবে না।

আধুনিককালে, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে বেশ কিছু ধ্বংসাত্মক ঘটনার সত্যতা প্রতিপাদন করা গেছে, যেগুলোর কিছু কিছু ঘটনা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত রয়েছে। কোরআনে বর্ণিত ঘটনাগুলো প্রকৃতই যে ঘটেছিল তার প্রমাণ দিয়েছে এই তথ্যগুলো। আর এই ঘটনাবলীর নিদর্শন থেকে "আগাম সতর্ক হওয়ার" প্রয়োজনীয়তাকে কোরআনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলীতে এমন লক্ষণীয় ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণরূপে এত বেশি উপস্থাপন করা হয়েছে যে, প্রকৃতই এটা বিচার-বিশ্লেষণের গুরুত্ব বহন করে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে "পৃথিবী ভ্রমণ করার" এবং "আমাদের পূর্বে তাদের কি পরিণাম হয়েছিল তা দেখার" প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন।

> "আর আমি আপনার পূর্বে বিভিন্ন জনপদবাসীগণ হইতে যত সংখ্যক (রাসূল) প্রেরণ করিয়াছি তাঁহারা সকলেই মানুষ ছিলেন, যাহাদের নিকট অহী প্রেরণ করিতাম।
>
> তবে কি তাহারা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে নাই। যাহাতে দেখিতে পাইত তাহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হইয়াছিল ? আর পরকাল নিশ্চয়ই সেই সকল লোকের জন্য উত্তম যাহারা সতর্কতা অবলম্বন করে, তোমরা কি এতটুকুও বুঝ না ?
>
> অবশেষে রাসূলগণ যখন নিরাশ হইয়া পড়িলেন এবং (আযাবের প্রতিশ্রুত সময় নির্ধারণের ব্যাপারে) তাঁহাদের ধারণা জন্মিল যে তাহাদের বুঝার ভুল হইয়াছে তখন তাহাদের নিকট আমার সাহায্য আসিল।
>
> অনন্তর যাহাকে আমি ইচ্ছা করিলাম সে রক্ষা পাইল, আর অপরাধী সম্প্রদায় হইতে আমার শাস্তি নিবারিত হয় না। ইহাদের কাহিনীসমূহে মহা উপদেশ রহিয়াছে বিবেকসম্পন্ন লোকদের জন্য। এই কোরআন কোন মনগড়া কথাও নহে যাহা দ্বারা উপদেশ পাওয়া যায় না। বরং উহা পূর্বগ্রন্থসমূহের সমর্থনকারী এবং প্রত্যেক বিষয়ের বিশদ বর্ণনাকারী এবং ঈমানদারদের জন্য হেদায়েত ও রহমতস্বরূপ।
>
> — সূরা ইউসুফ ঃ ১০৯-১১

বাস্তবিকই বিবেকবান বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের জন্য অতীত সম্প্রদায়সমূহের ঘটনা-কাহিনীগুলোতে বহু নিদর্শনাবলী বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে এবং তাঁর আদেশ প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনে বিলুপ্ত এই সম্প্রদায়গুলো আমাদের এটাই দৃষ্টিগোচর করাচ্ছে যে আল্লাহ তায়ালার সকাশে মানবজাতি 'কতই না দুর্বল ও অসহায়'। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা এই কাহিনীগুলো কালানুক্রমে পর্যবেক্ষণ করে দেখব।

সূচি

অধ্যায় এক

অধ্যায় দুই

অধ্যায় তিন

অধ্যায় চার

অধ্যায় পাঁচ

অধ্যায় ছয়

অধ্যায় সাত

অধ্যায় আট

অধ্যায় নয়

অধ্যায় এক

নূহ (আঃ)-এর মহাপ্লাবন

"আর আমি নূহকে তাঁহার স্বজাতির নিকট পাঠাইলাম, অনন্তর তিনি তাহাদের মধ্যে পঞ্চাশ বর্ষ কম এক হাজার বৎসর অবস্থান করিলেন (এবং বুঝাইতে থাকিলেন) ; অতঃপর (অন্যায়ে লিপ্ত থাকার দরুন) তাহাদের তুফানে পাইল। আর তাহারা ছিল অত্যন্ত যালেম লোক।"

— সূরা আনকাবুত : ১৪

পবিত্র কোরআনে বহুল উল্লেখিত ঘটনাবলীর মাঝে নূহ (আঃ) (নুআহ)-এর প্লাবনের ঘটনাটি অন্যতম, যা-কিনা প্রায় সব সংস্কৃতি বা কৃষ্টিতেই উল্লেখিত রয়েছে। নূহ (আঃ)-এর উপদেশ ও সাবধান বাণীর প্রতি তাঁর সম্প্রদায়ের উদাসীনতা, তাদের প্রতিক্রিয়া আর কিভাবে ঘটনাটি ঘটেছিল, তা বহু আয়াতেই বিশদভাবে বর্ণিত রয়েছে।

নূহ (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে, যারা আল্লাহর বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গে শরীক সাব্যস্ত করে আসছিল। নূহ (আঃ) এসেছিলেন তাদের আহবান জানাতে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করার ও তাদের বিরুদ্ধাচরণের সমাপ্তি ঘটানোর জন্য। নূহ (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বারংবার আল্লাহর আদেশের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করার কথা বলা ও তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার ক্রোধানল সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া সত্ত্বেও তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেই যাচ্ছিল এবং আল্লাহর সঙ্গেও ক্রমাগত শরীক সাব্যস্ত করে যেতে লাগল। সূরা মুমিনুন-এ কিভাবে বিষয়টি শুরু হল তার বর্ণনা নিম্নরূপে দেয়া আছে :

আর আমি নূহকে তাঁহার সম্প্রদায়ের প্রতি নবী বানাইয়া পাঠাইলাম, অতঃপর নূহ বলিলেন, "হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর এবাদত করিতে থাক। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নাই, তবুও কি তোমরা (তাঁহাকে) ভয় কর না?"

তখন তাঁহার সম্প্রদায়ের কাফের নেতারা বলিল, "এই ব্যক্তি তোমাদেরই অনুরূপ একজন মানুষ ব্যতীত অন্য কিছু নহে, সে তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বনিতে চাহিতেছে; আর যদি (রাসূল পাঠাইবার জন্য) আল্লাহর অভিপ্রায় হইত, তবে ফেরেশতাদেরকে পাঠাইতেন, এই কথাতো আমাদের পূর্বপুরুষদের নিকটও শুনি নাই; বস্তুত সে এমন ব্যক্তি যাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তোমরা এক বিশেষ সময় (তাঁহার মৃত্যু) পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

তিনি বলিলেন, "হে প্রভু! প্রতিশোধ গ্রহণ করুন, তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছে।"

— সূরা মুমিনুন ঃ ২৩-২৬

আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, সম্প্রদায় প্রধানরা এই অভিযোগ আনার চেষ্টা চালিয়েছে যে নূহ (আঃ) তাদের (তার সম্প্রদায়ের) উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার প্রয়াস চালাচ্ছেন; যেমন; নেতৃত্ব, সম্মান এবং সম্পদের জন্য নিজের ব্যক্তিস্বার্থ অন্বেষণ করছেন নূহ (আঃ)। আর তারা তাঁকে উন্মাদ বলে চিহ্নিত করার অপচেষ্টাও চালায়। তারা তাঁর (নূহ আঃ) সম্পর্কে কিছুদিন সহনশীল হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তাঁকে চাপের মুখে রাখার চেষ্টা করে।

এতে আল্লাহ তায়ালা নূহ (আঃ)-কে বললেন যে, যারা অবিশ্বাসী হয়েছে আর অন্যায় করেছে, তাদের নিমজ্জিত করে শাস্তি প্রদান করা হবে; আর যাঁরা ঈমান এনেছে তাঁরা রেহাই পেয়ে যাবে।

সত্যিই যখন শাস্তির সময় সমাগত হল, পানি আর উপচে পড়া ঝরণাগুলো যেন মাটি ফেটে বেরিয়ে এল; আর তা অতিরিক্ত বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশে বিশাল এক বন্যার রূপ ধারণ করল। আল্লাহ তায়ালা নূহ (আঃ)-কে বললেন,

> **"প্রতি প্রজাতির পশুর স্ত্রী ও পুরুষ মিলাইয়া একজোড়া করিয়া লইতে; আর যাহাদের বিরুদ্ধে আদেশ জারি হইয়াছে তাহাদের ছাড়া বাদবাকী তাঁহার পরিবারবর্গসহ সবাইকে লইয়া নৌকায় আরোহণ করিতে।"**

নূহ (আঃ)-এর এক পুত্র, যে কিনা ভেবেছিল নিকটবর্তী পর্বতে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে যেতে পারবে, সে সহ সেই অঞ্চলের সকল লোক নিমজ্জিত হল। যারা নূহ (আঃ)-এর সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করেছিল তারা ছাড়া বাকী সবাই পানিতে ডুবে মারা পড়ল। বন্যা শেষে পানি যখন কমে আসল এবং **"সেই ব্যাপারটি সাঙ্গ হল"** তখন নৌকাটি এসে জুদি নামক এক উঁচু জায়গায় অবস্থান নিয়েছিল বলে কোরআন আমাদের অবহিত করছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক, ভূতাত্ত্বিক আর ঐতিহাসিক অনুসন্ধান এসবই আমাদের জানাচ্ছে যে ঘটনাটি ঘটেছিল ঠিক সেভাবে, যেভাবে কোরআনে সেটির উল্লেখ রয়েছে। অতীত সভ্যতাসমূহের বহু রেকর্ড ও বহু ঐতিহাসিক দলিল পত্রে বন্যাটিকে খুব সদৃশভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও স্থান, কাল ও বৈশিষ্ট্যে তা ভিন্নতা প্রদর্শন করে, আর **"যা কিছু বিপথগামী লোকদের বেলায় ঘটেছিল"** তা সমসাময়িক জনসমাজের প্রতি হুঁশিয়ারি বাণী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাইবেলের ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্ট ছাড়া সুমেরিয়া আর এসিরিয়ান-ব্যাবিলনিয়ান নথিপত্রে, গ্রীক পুরানে, শতপদ্যে, ভারতের ব্রাহ্মণা আর মহাভারত মহাকাব্যসমূহে, ব্রিটিশ আইসলস-এর ওয়েলস উপাখ্যানে, নরডিক এডডাতে লিথুয়ানিয়া উপাখ্যানে এবং এমনকি কিছু চাইনীজ গল্পেও বন্যার এই ঘটনা অত্যন্ত সদৃশভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ভৌগোলিকভাবে দূরবর্তী ও বিসদৃশ সংস্কৃতির এই দেশগুলো, যেগুলো বন্যা কবলিত অঞ্চল হতে এবং নিজেরাও একে অপর হতে দূরে অবস্থিত ছিল সেই দেশগুলো হতে কেমন করে এমন বিস্তারিত ও প্রাসঙ্গিক' তথ্য সংগ্রহ করা গেল?

জবাব অত্যন্ত স্পষ্ট ঃ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যে সম্প্রদায়গুলোর একে অন্যের সঙ্গে অত্যন্ত কম যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল, তাদেরই নথিপত্র ও অভিলিখনসমূহে **"এই একই ঘটনা"** বর্ণিত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঐ অঞ্চলের লোকেরা যে ঘটনাটি সম্পর্কে কোন **"দৈব উৎস"** হতে জ্ঞাত হয়েছিল এটা তারই নিদর্শন। মনে হয় যে, ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ ও সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক এই বন্যার ঘটনাটিকে বিভিন্ন সভ্যতায় প্রেরিত নবীগণ উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এভাবেই বন্যার সংবাদ বিভিন্ন কৃষ্টিতে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

তথাপি, অসংখ্য সংস্কৃতি ও ধর্মীয় উৎসসমূহে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও বন্যার এই ঘটনা ও নূহ (আঃ)-এর কাহিনীটি বেশ পরিবর্তিত হয়েছে, আর মূলধারা হতে ঘটনাটি বহুদূর সরে এসেছে; কেননা এই উৎসসমূহে মিথ্যায়ন করা হয়েছিল এবং ভুল তথ্য সরবরাহ করা হয়েছিল। আর এমনটিও হতে পারে যে, অসৎ কোন অভিপ্রায় এখানে কাজ করেছিল।

গবেষণায় উন্মোচিত হয়েছে যে, মূলত বিভিন্ন তারতম্য সহকারে বর্ণিত এই বন্যার ঘটনার বর্ণনাসমূহের মাঝে একমাত্র পবিত্র কোরআনের বর্ণনাই সবচাইতে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পবিত্র কোরআনে নূহ (আঃ) এবং প্লাবন

পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে নূহ (আঃ)-এর প্লাবনের উল্লেখ রয়েছে। ঘটনার ধারাবাহিকতা অনুসারে প্রাপ্ত আয়াতগুলো নিম্নরূপে সাজানো গেল!

নূহ (আঃ) কর্তৃক তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি সত্য ধর্মের আহবান

আমি নূহকে তাঁহার কওমের নিকট পাঠাইলাম, অতঃপর তিনি বলিলেন, "হে আমার বংশধরেরা! তোমরা কেবল আল্লাহর এবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নাই, আমি তোমাদের জন্য এক কঠিন দিবসের শাস্তির অপেক্ষা করিতেছি।"

— সূরা আরাফ ঃ ৫৯

(নূহ) "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল, সুতরাং তোমরা বিশ্বপ্রতিপালককে ভয় কর এবং আমার কথা মানিয়া চল। আর আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন (পার্থিব) বিনিময় চাহিতেছি না। আমার পুরস্কার তো কেবলমাত্র বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর নিকট হইতে; তাই আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান।"

— সূরা শু'আরা ঃ ১০৭—১১০

আর আমি নূহকে তাঁহার সম্প্রদায়ের প্রতি নবী বানাইয়া পাঠাইলাম, অতঃপর নূহ বলিলেন, "হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর এবাদত করিতে থাক। তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কোন মা'বুদ নাই; তবুও কি তোমরা ভয় কর না (তাঁহাকে) ?"

— সূরা মুমিনুন ঃ ২৩

আল্লাহর গজবের ব্যাপারে নূহ সম্প্রদায়ের প্রতি নূহ (আঃ)-এর সতর্কবাণী

"আমি নূহকে তাঁহার স্বজাতির প্রতি (নবী বানাইয়া) পাঠাইয়াছিলাম যে, আপনি আপনার গোত্রকে ভয় দর্শান, ইহাদের পূর্বে যে তাহাদের প্রতি মর্মন্তুদ শাস্তি নামিয়া আসে।"

— সূরা নূহ ঃ ১

(নূহ!) "অতএব অচিরেই জানিতে পারিবে, সেই ব্যক্তিকে যার উপর এমন শাস্তি আসার উপক্রম, যাহা তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়া দিবে এবং (মৃত্যুর পর) তাহার উপর চিরস্থায়ী আজাব আসিবে।"

— সূরা হুদ ঃ ৩৯

(নূহ) "আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করিও না; তোমাদের সম্বন্ধে ভয় করি আজাবের মর্মন্তুদ দিবসের।"

— সূরা হুদ ঃ ২৬

নূহ (আঃ) সম্প্রদায়ের প্রত্যাখ্যান

তাঁহার সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত লোকেরা বলিল, "আমরা তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তীতে লিপ্ত দেখিতেছি।"

— সূরা আরাফ ঃ ৬০

তাহারা বলিতে লাগিল, "হে নূহ! তুমি আমাদের সহিত তর্ক করিয়াছ এবং তর্কও অনেক বেশি করিয়াছ; অতএব, আমাদেরকে তুমি (আজাব আগমনের) যে ধমক দিতেছিলে উহা আমাদের সম্মুখে নিয়া আস যদি তুমি সত্যবাদী হও।"

— সূরা হুদ ঃ ৩২

আর তিনি তরী নির্মাণ করিতে লাগিলেন; আর (নির্মাণরত অবস্থায়) তাঁহার নিকট দিয়া যখনই তাঁহার কওমের কোন নেতাদলের যাতায়াত হইত তখন তাঁহার সহিত উপহাস করিত; তিনি বলিতেন, "তোমরা যদি (এখন) আমাদের প্রতি ঠাট্টা কর, তবে আমরাও তোমাদের উপর (সত্বর) ঠাট্টা করিব, তোমরা যেমন আমাদের প্রতি ঠাট্টা করিতেছ।"

— সূরা হুদ ঃ ৩৮

তখন তাঁহার সম্প্রদায়ের কাফের নেতারা বলিল, "এই ব্যক্তি তোমাদেরই অনুরূপ একজন মানুষ ব্যতীত অন্য কিছু নহে, সে তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বনিতে চাহিতেছে; আর যদি আল্লাহর অভিপ্রায় হইত তবে ফেরেশতাদেরকে পাঠাইতেন, এই কথাতো আমাদের পূর্বপুরুষদের নিকটও শুনি নাই; বস্তুত সে এমন এক ব্যক্তি যাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তোমরা এক বিশেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর।"

— সূরা মুমিনুন ঃ ২৪-৫

"ইহাদের পূর্বে নূহ সম্প্রদায় অবিশ্বাস করিয়াছিল অর্থাৎ আমার বান্দা (নূহকে) প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, সে তো 'পাগল' এবং নূহকে ধমক দেওয়া হইয়াছিল।"

— সূরা কামার ঃ ৯

নূহ (আঃ)-এর অনুসারীদের প্রতি তাদের অবহেলা প্রদর্শন

অতঃপর তাঁহার সম্প্রদায়ের কাফের নেতারা বলিল, "আমরা তোমাকে আমাদেরই অনুরূপ মানুষ দেখিতেছি, তোমার অনুসরণ কেবল ঐ সকল লোকেরাই করিতেছে যাহারা আমাদের মধ্যে একেবারে অধম, (তাহাও আবার) অনুধাবনহীন, আর আমরা তোমাদের মধ্যে আমাদের অপেক্ষা অধিকও কিছু দেখিতে পাইতেছি না; অধিকন্তু আমরা তোমাদেরকে মিথ্যুকই মনে করি।"

— সূরা হূদ ঃ ২৭

তাহারা বলিতে লাগিল, "আমরা কি তোমাকে মান্য করিব ? অথচ নীচ লোকেরা তোমার সহচর হইয়াছে।" নূহ বলিলেন, "তাহাদের কাজ সম্বন্ধে আমার জানার দরকার কি ? তাহাদের নিকট হইতে হিসাব গ্রহণ করাতো আল্লাহর কাজ, কি উত্তম হয় যদি তোমরা বুঝ। আর আমি ঈমানদারগণকে তাড়াইয়া দিতে পারি না, আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।"

— সূরা শু'আরা ঃ ১১১-১১৫

আল্লাহ তায়ালা নূহ (আঃ)-কে মনে করিয়ে দিলেন যেন তিনি শোকাহত না হন

"আর নূহের প্রতি অহী পাঠান হইল যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাঁহারা ব্যতীত তোমার কওম হইতে অন্য কেহই ঈমান আনিবে না, সুতরাং ইহারা (ঠাট্টা-বিদ্রূপ) যাহা করিতেছে উহাতে মোটেও ক্ষুণ্ন হইও না।"

— সূরা হূদ ঃ ৩৬

নূহ (আঃ)-এর প্রার্থনাসমূহ

"সুতরাং আমার ও তাহাদের মধ্যে এমন একটি (কার্যকরী) মীমাংসা করিয়া দিন এবং আমাকে এবং আমার সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিস্তার দিন।"

— সূরা শু'আরা ঃ ১১৮

অতঃপর নূহ আপন প্রভু সকাশে প্রার্থনা করিলেন, "আমি তো অসহায়, অতএব আপনি আমাকে সাহায্য করুন।"

— সূরা ক্বামার ঃ ১০

(নূহ) বলিলেন, "হে প্রভু ! আমি আমার জাতিকে রাতে এবং দিনে ডাকিয়াছি; কিন্তু আমার ডাকে তাহারা আরও দূরে পলায়ন করিতেছে।"

— সূরা নূহ ঃ ৫-৬

নূহ বলিলেন, "হে আমার প্রভু ! আমাকে সাহায্য করুন। তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছে।"

— সূরা মুমিনুন ঃ ২৬

"আর নূহ আমাকে ডাকিলেন, বস্তুত আমি উত্তম প্রার্থনা শ্রবণকারী।"

— সূরা সাফফাত ঃ ৭৫

নৌকা নির্মাণ

"আর আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার আদেশে তুমি একটি তরী নির্মাণ করিয়া নাও, আর আমার নিকট কাফেরদের সম্বন্ধে কোন আলাপ করিও না, (কারণ) তাহারা সকলেই নিমজ্জিত হইবে।"

— সূরা হূদ ঃ ৬৪

নূহ (আঃ) সম্প্রদায় ধ্বংস হল নিমজ্জিত হয়ে

"অনন্তর তাঁহাকে তাহারা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়া যাইতেছিল; অতএব আমি নূহকে এবং তাঁহার সঙ্গে যাহারা নৌকায় ছিল তাহাদেরকে বাঁচাইলাম আর যাহারা আমার আয়াতসমূহে অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদের নিমজ্জিত করিয়া দিলাম, নিঃসন্দেহে তাহারা অন্ধ সাজিয়াছিল।"

— সূরা আরাফ ঃ ৬৪

"অতঃপর নিমজ্জিত করিয়া দিলাম যাহারা পিছনে রহিয়া গিয়াছিল।"

— সূরা শুআরা ঃ ১২০

"আর আমি নূহকে তাহার স্বজাতির নিকট পাঠাইলাম, অনন্তর তিনি তাহাদের মধ্যে পঞ্চাশ বর্ষ কম এক হাজার বৎসর অবস্থান করিলেন (এবং বুঝাইতে লাগিলেন); অতঃপর অন্যায়ে লিপ্ত থাকার দরুন প্লাবন তাহাদের গ্রাস করে, আর তাহারা ছিল অত্যন্ত যালেম লোক।"

— সূরা আনকাবুত ঃ ১৪

"মোট কথা হইল আমি তাঁহাকে এবং তাঁহার সহচরবৃন্দকে আমার রহমতে রক্ষা করিলাম, আর ঐ সকল লোকের মূলোৎপাটন করিয়া দিলাম যাহারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রত্যায়ন করিতেছিল এবং তাহারা ঈমানদার ছিল না।"

— সূরা আরাফ ঃ ৭২

নূহ (আঃ)-এর পুত্রের শেষ পরিণাম

বন্যার প্রাথমিক পর্যায়ে নূহ (আঃ) ও তাঁর পুত্রের মাঝে যে কথোপকথন হয়েছিল তা নিম্নের আয়াতগুলো বর্ণনা করছে ঃ

আর সেই তরীটি তাহাদের লইয়া চলিল পর্বতসম তরঙ্গের মধ্যে। আর নূহ আপন পুত্রকে ডাকিলেন, সে ছিল (নৌকা হইতে) পৃথক স্থানে, "হে আমার স্নেহের পুত্র! আমাদের সঙ্গে আরোহণ কর এবং কাফেরদের দলভুক্ত হইও না।" সে বলিতে লাগিল, "আমি এখনই কোন পাহাড়ে আশ্রয় নিব, যাহা আমাকে বন্যার পানি হইতে রক্ষা করিবে।" নূহ বলিলেন, "অদ্যকার দিন আল্লাহর কহর হইতে কেউই রক্ষাকারী নাই, কিন্তু যাহার প্রতি তিনি দয়া করেন।

আর তৎক্ষণাৎ পিতা-পুত্র উভয়ের মধ্যে একটি তরঙ্গ আসিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল; অনন্তর সে (অন্যান্য কাফেরদের অনুরূপ) ডুবিয়া গেল।

— সূরা হূদ ঃ ৪২-৪৩

ঈমানদারগণকে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করা হল

"তখন আমি তাঁহাকে এবং তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা বোঝাপূর্ণ নৌকায় ছিল, তাঁহাদিগকে রেহাই দিলাম।"

— সূরা শু'আরা ঃ ১১৯

"পক্ষান্তরে তাঁহাকে এবং নৌকারোহীদেরকে আমি রক্ষা করিলাম, আর আমি এই ঘটনাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশের উপকরণ বানাইয়া দিলাম।"

— সূরা আনকাবুত ঃ ১৫

বন্যার প্রাকৃতিক রূপ

"অতঃপর আমি আসমানের দরজা খুলিয়া দিলাম প্রচুর বর্ষণমুখর বারিপাতে এবং মৃত্তিকা হইতে উৎসারিত করিয়া দিলাম প্রস্রবণসমূহ। অতঃপর (আসমান-জমিনের) জলরাশি মিলিত হইয়া গেল সেই উদ্দেশ্যে যাহা সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। আর আমি নূহ (আঃ)-কে কাষ্ঠফলক ও পেরেক আঁটা পোতের উপর (সংশ্লিষ্ট মুমিনগণসহ) আরোহণ করাইলাম, যাহা আমার তত্ত্বাবধানে চলমান ছিল।"

— সূরা কামার ঃ ১১—১৩

অবশেষে যখন আমার (শাস্তির) আদেশ সমাগত হইল এবং ভূপৃষ্ঠ হইতে পানি উথলাইয়া উঠা আরম্ভ করিল, আমি বলিলাম, "প্রত্যেক শ্রেণীর (জীব) হইতে একটি নর ও একটি মাদী অর্থাৎ দুইটি করিয়া উহাতে (নৌকায়) উঠাইয়া নাও এবং তোমার পরিবারবর্গকেও, কিন্তু উহাকে ব্যতীত যাহার সম্বন্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হইয়াছে, আর অপরাপর ঈমানদারগণকেও (উঠাইয়া নাও)।" আর অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত কেহই তাঁহার সঙ্গে ঈমান আনে নাই। আর তিনি বলিলেন, "এই নৌকায় আরোহণ কর, ইহার গতি ও স্থিতি (সবই) আল্লাহর নামে, নিশ্চয়ই আমার প্রভু অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"

— সূরা হূদ ঃ ৪০—৪২

অতঃপর আমি তাঁহার প্রতি আদেশ দিলাম যে, "তুমি নৌকা বানাও আমার তত্ত্বাবধানে এবং আমার আদেশে অতঃপর আমার (আজাবের) হুকুম যখন আসিয়া পৌছিবে এবং (উহার আলামতস্বরূপ) জমিন হইতে পানি উথলাইয়া উঠা আরম্ভ করিবে তখন প্রত্যেক প্রকার (জীব) হইতে দুইটি করিয়া– একটি নর ও একটি মাদী উহাতে উঠাইয়া নাও এবং তোমার পরিবারবর্গকেও; উহাদের মধ্যে সে ব্যতীত যাহার উপর (নিমজ্জিত হওয়ার) আদেশ জারি হইয়া গিয়াছে এবং (শ্রবণ কর!) আমাকে কাফেরদের (মুক্তি) সম্বন্ধে কিছুই বলিও না; (কারণ) উহাদিগকে অবশ্যই নিমজ্জিত করা হইবে।"

— সূরা মুমিনুন ঃ ২৭

উঁচু স্থানে নৌকার অবস্থান গ্রহণ

আর (সকল কাফের ডুবিয়া গেলে) আদেশ দেওয়া হইল, "হে জমিন! আপন পানি শোষণ করে নাও, আর হে আকাশ! (বর্ষণ হইতে) ক্ষান্ত হও, অতঃপর বন্যা প্রশমিত হইল এবং ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটিল আর তরী আসিয়া জুদী (পর্বত)-এর উপর স্থির হইল এবং বলা হইল, কাফের সম্প্রদায় রহমত হইতে বহু দূরে!"

— সূরা হূদ ঃ ৪৪

বন্যার ঘটনাটির শিক্ষামূলক দিক

"পানি যখন স্ফীত হইল তখন তোমাদিগকে (অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী মুমিনদেরকে) নৌকায় উঠাইলাম; যেন আমি তোমাদের জন্য স্মরণীয় বিষয় করি এবং স্মরণকারী কর্ণসমূহ যেন উহা স্মরণ রাখে।"

— সূরা হাক্কাহ ঃ ১১-১২

নূহ (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহর প্রশংসাবাণী

"যে নূহ-এর প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক, জগতবাসীর মধ্যে। আমি নিষ্ঠাবানদের এইরূপ পারিতোষিক দিয়া থাকি। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন আমার বিশ্বাসী বান্দাগণের অন্যতম।"

— সূরা সাফফাত ঃ ৭৯-৮১

মহাপ্লাবন কি গোটা বিশ্বজুড়ে হয়েছিল না কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল

নূহ (আঃ)-এর প্লাবনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে যে জনগোষ্ঠী, তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর জোর সমর্থন করে বলে যে, "বিশ্বব্যাপী বন্যা অসম্ভব"। যাহোক, বন্যার ঘটনা সম্পর্কে তাদের কোন রকম অস্বীকৃতি পবিত্র কোরআনের উপর আক্রমণেরই শামিল। তাদের মতানুসারে কোরআনসহ সব ধর্মগ্রন্থগুলোই যেন মনে হয় সারা পৃথিবীব্যাপী বন্যার সমর্থনে কথা বলে আর এভাবেই তারা ভুল করে যাচ্ছে।

তথাপি কোরআনের প্রতি এই অস্বীকৃতি সত্য নয়। পবিত্র কোরআন আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নাজিল হয়েছে এবং তা একমাত্র অবিকৃত আসমানী গ্রন্থ। পেন্টাটিউচ এবং অন্যান্য অসংখ্য সংস্কৃতিতে বর্ণিত বন্যার উপাখ্যানগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টি বিন্দু থেকে পবিত্র কোরআন বন্যার ঘটনাটিকে দেখে থাকে।

ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম পাঁচটি বইয়ের নাম পেন্টাটিউচ, যা কিনা বন্যার ঘটনাটিকে "বিশ্বব্যাপী ছিল" বলে বর্ণনা করে আর বলে যে বন্যাটি পুরো পৃথিবীকেই প্লাবিত করেছিল। কিন্তু কোরআন এধরনের কোন জোরাল উক্তি সরবরাহ করে না, বরং উল্টো, প্রাসঙ্গিক আয়াতগুলো এটাই বলে যে বন্যাটি ছিল অঞ্চলভিত্তিক এবং পুরো দুনিয়াকে প্লাবিত করেনি, কিন্তু শুধু নূহ (আঃ) সম্প্রদায়কেই নিমজ্জিত করে, যাদেরকে নূহ (আঃ) আগেই সতর্ক করেছিলেন এবং এভাবেই তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়।

ওল্ড টেস্টামেন্টে ও পবিত্র কোরআনে বন্যার বর্ণনাগুলো অনুসন্ধান করে দেখলে ধরা পড়ে যে এ পার্থক্য খুবই সরল। সমগ্র ইতিহাস জুড়ে অসংখ্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের শিকারে পরিণত হয় যে ওল্ড টেস্টামেন্ট, সেটিকে মূল নাজিলকৃত ধর্মগ্রন্থ হিসেবে এখন আর ধরে নেয়া যায় না। সেই ওল্ড টেস্টামেন্ট, বন্যার শুরু কিভাবে হয়েছিল, তার বর্ণনা করে এভাবে ঃ

আর ঈশ্বর দেখলেন ভূপৃষ্ঠে মানুষের দুরাচার চরমে উঠেছে আর তার চিন্তার প্রতিটি কল্পনাই ক্রমে ক্রমে কেবল অসৎই হতে যাচ্ছিল। আর ভূপৃষ্ঠে তিনি যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন এ ব্যাপারটি তাঁকে অনুতপ্ত

করে তুলল আর তাঁর অন্তরে শোকের সৃষ্টি করল। আর ঈশ্বর বললেন, যে মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছিলাম, তাদের এই দুনিয়ার বুক থেকে নির্মূলও করে দেব; মানুষ ও পশু দুটিকেই আর হামাগুড়ি দিয়ে চলে এমন বস্তুসমূহকে, আর পক্ষীকূল; কেননা তাদের আমি সৃষ্টি করেছি, এরাই আমাকে দিয়ে অনুতাপ করাচ্ছে। কিন্তু নূহ ঈশ্বরের চোখে অনুগ্রহ খুঁজে পেয়েছিলেন।

— জেনেসিস ৬ ঃ ৫-৮

যাহোক, কোরআনে এটা সুস্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে সারা পৃথিবী নয় বরং এটা ছিল কেবলই 'নূহ (আঃ) সম্প্রদায়'– যারা ধ্বংস হয়ে যায়। ঠিক যেমন আ'দ জাতির কাছে হূদ (আঃ) (— সূরা হূদ ঃ ৫০), সালেহ (আঃ) সামূদ জাতির কাছে (— সূরা হূদ ঃ ৬১), মুহাম্মদ (সঃ)-এর পূর্বে অন্যান্য নবীরা শুধু তাদের সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন, নূহ (আঃ)-ও তেমনি শুধু তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। আর বন্যাটি শুধুমাত্র নূহ (আঃ) সম্প্রদায়েরই অন্তর্ধান ঘটায়।

"আর আমি নূহকে তাঁহার স্বজাতির নিকট পাঠাইলাম (এই বাণী লইয়া), যে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও এবাদত করিও না, (বিপরীতক্রমে) আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী, আমি তোমাদের উপর এক মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তির আশংকা করিতেছি।"

— সূরা হূদ ঃ ২৫-২৬

ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যে লোক সকল, তারা নূহ (আঃ) কর্তৃক আল্লাহর বাণী প্রচারকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে যাচ্ছিল আর লাগাতার বিরোধিতা করছিল। প্রাসঙ্গিক আয়াতে এ বিষয়টি বেশ সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে;

"অনন্তর তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিতে থাকিল। অতএব আমি নূহকে এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে নৌকায় ছিল তাঁহাদেরকে বাঁচাইলাম আর যাহারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদেরকে নিমজ্জিত করিয়া দিলাম, নিঃসন্দেহে তাহারা অন্ধ সাজিয়াছিল।"

— সূরা আ'রাফ ঃ ৬৪

"মোট কথা হইল আমি তাঁহাকে এবং তাঁহার সহচরগণকে আমার রহমতে রক্ষা করিলাম আর ঐসব লোকের মূলোৎপাটন করিয়া

দিলাম যাহারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রত্যায়ন করিতেছিল এবং তাহারা ঈমানদার ছিল না।"

— সূরা আ'রাফ ঃ ৭২

তাছাড়া পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা মন্তব্য করেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতির প্রতি আল্লাহ তাঁর কোন দূত না প্রেরণ করেন, ততদিন পর্যন্ত তিনি সেই জাতিকে ধ্বংস করে দেন না। ধ্বংস ক্রিয়া কেবল তখনই সংঘটিত হয়, যদি কোন নির্দিষ্ট জাতির প্রতি একজন সতর্ককারী ইতিমধ্যে তাদের কাছে পৌঁছে থাকে আর যখন সেই সতর্ককারীকে মিথ্যাবাদী বলে তিরস্কার করা হয়। সূরা কাসাসে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

"আর আপনার প্রভু জনপদসমূহ ধ্বংস করেন না, যদ্যাবধি উহাদের কেন্দ্রস্থলে কোন রাসূল পাঠাইয়া না দেন, যেন তিনি তাহাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনান; আর আমি জনপদসমূহ ধ্বংস করি না, কিন্তু সেই অবস্থায় যখন তথাকার অধিবাসীগণ চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে থাকে।"

— সূরা কাসাস ঃ ৫৯

যে জাতির প্রতি নবী পাঠানো হয়নি, সেই জাতিকে ধ্বংস করা কখনও আল্লাহ তায়ালার পরিকল্পনা হয় না। নূহ (আঃ) কেবল তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন সতর্ককারী হিসেবে। আর তাই আল্লাহ তায়ালা কেবল নূহ (আঃ) সম্প্রদায় ছাড়া সেই সময়কালে এমন অন্য কোন সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেননি যাদের প্রতি রাসূল পাঠানো হয়নি।

পবিত্র কোরআনের এসব উক্তিগুলো থেকে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, নূহ (আঃ)-এর সময়ের প্লাবনটি একটি আঞ্চলিক বিপর্যয় ছিল, পুরো বিশ্বে তা ঘটেনি। আমরা নিচে আলোচনা করব যে, বন্যা যে এলাকায় হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়, সেই প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চলে যে খননকার্যগুলো চালানো হয়েছে, সেগুলো প্রমাণ করছে যে বন্যা পৃথিবীব্যাপী হয়নি, যা হলে পৃথিবীতে তার প্রভাব থেকে যেত বরং মেসোপটেমিয়ার একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বিস্তৃত ও ভয়াবহ দুর্যোগ হিসেবে ঘটেছিল এ বন্যাটি।

সব ধরনের প্রাণীই কি নৌকায় উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল

বাইবেলের ব্যাখ্যাকারকগণ মনে করেন যে, নূহ (আঃ) ভূপৃষ্ঠের সমস্ত প্রজাতির পশুকেই নৌকায় উঠিয়েছিলেন এবং নূহ (আঃ)-এর বদৌলতেই

প্রাণীগুলো বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পেয়েছে। এই বিশ্বাস অনুসারে, ভূপৃষ্ঠে স্থলচর সব প্রাণীরই এক জোড়া নিয়ে নৌকায় উঠান হয়েছিল।

যারা এই উক্তি অভ্রান্ত বলে সমর্থন করে, তারা বহুক্ষেত্রে ভয়ানক সমস্যার সম্মুখীন হয়। কিভাবে প্রাণী প্রজাতিগুলো নৌকায় উঠান হল, কিভাবে তাদের খাওয়ান হত, অধিকন্তু কিভাবে নৌকায় তাদের স্থান সংকুলান করা হয়, আর কিভাবেই বা তাদের পরস্পর থেকে পৃথক পৃথকভাবে রাখা হল এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া অসম্ভব। তদুপরি, আরো প্রশ্ন থেকে যায় ঃ কিভাবে বিভিন্ন মহাদেশ থেকে প্রাণীগুলো একত্রে আনা হয়েছিল মেরুর স্তন্যপায়ী প্রাণী, অস্ট্রেলিয়ার ক্যাংগারু কিংবা কেবল আমেরিকার বাইসন?

অধিকন্তু, এরপর আরো প্রশ্ন এসে যায় যে, অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রাণী, সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদির ন্যায় বিষাক্ত প্রাণী এবং অন্যান্য বন্য প্রাণীগুলো কিভাবে ধরা হয়েছিল আর কিভাবেই বা বন্যার পানি হ্রাস না পাওয়া পর্যন্ত তাদের প্রাকৃতিক বাসস্থান থেকে দূরে এনে প্রতিপালন করা হত?

ওল্ড টেস্টামেন্ট এ প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন হয়। কোরআনে এমন কোন উক্তি নেই যা এই বলে যে, ভূপৃষ্ঠের সব প্রাণী প্রজাতিই নৌকায় তুলে নেয়া হয়েছিল। যেমন, পূর্বেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে, একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল জুড়ে বন্যা হয়েছিল, তাই নৌকায় তোলা প্রাণীগুলো কেবল নূহ (আঃ) সম্প্রদায়ের আবাসভূমিতে বিরাজমান প্রাণী হয়ে থাকবে।

তার উপর, ঐ অঞ্চলে বসবাসরত সব প্রাণীকেই সংগ্রহ করাটাও অসম্ভব ঘটনা। এটা চিন্তা করাও কঠিন যে নূহ (আঃ) এবং তাঁর সহচরগণ (—সূরা হুদ ঃ ৪০) চারদিকে ঘুরছেন আর শত শত প্রাণী প্রজাতির দুটি করে সংগ্রহ করতে যাত্রা করছেন তাদের আশে-পাশের এলাকায়। এমনকি এটা অত্যন্ত অভাবনীয় তাদের বেলায় যে, তারা তাদের অঞ্চলের পতঙ্গগুলোকেও সংগ্রহ করেছেন; আর, অধিকন্তু পুরুষ পতঙ্গ থেকে স্ত্রী পতঙ্গগুলো পৃথকও করতে পেরেছেন! এ কারণেই এটা ভাবাটাই অধিকতর সহজ যে যেসব প্রাণী সহজেই ধরা যায় ও পালন করা যায় কেবল তাদেরকেই সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং তাই মানুষের ব্যবহৃত গৃহপালিত পশুই হয়ে থাকবে এগুলো। নূহ (আঃ) খুব সম্ভবত গরু, ভেড়া, ঘোড়া, উট এবং এরূপ আরো অন্যান্য প্রাণীগুলোকেই

নৌকায় নিয়েছিলেন, কেননা বন্যার ফলে কোন অঞ্চল প্রচুর পরিমাণ গৃহপালিত জন্তু হারায় আর তাই কোন অঞ্চলে নতুন জীবন শুরু করতে গেলে এগুলোই প্রাথমিক পর্যায়ের প্রাণী হিসেবে দরকার হয়ে থাকে।

প্রাণী সংগ্রহের ব্যাপারে নূহ (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহর আদেশের দিব্য জ্ঞান এতেই নিহিত ছিল যে, এতে করে প্রাণীকূল রক্ষা নয় বরং বন্যার পর নতুন জীবন প্রতিষ্ঠা করতে যে প্রাণীগুলো দরকার হবে সেগুলো সংগ্রহের দিকেই নূহ (আঃ) পরিচালিত হয়েছিলেন; এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট।

যেহেতু বন্যাটি ছিল আঞ্চলিক সেজন্য প্রাণী প্রজাতিগুলোর নির্মূল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। বন্যার পর সময়ের গতিতে খুব সম্ভবত অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রাণীসমূহ সেই অঞ্চলে চলে এসেছে এবং সেখানে সংখ্যা বৃদ্ধি করে সেই অঞ্চলের জীবন্ত ভাবকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। যা গুরুত্বের বিষয় ছিল, তাহল ঠিক বন্যার পরপরই অঞ্চলটিতে বসতি স্থাপন করা এবং মূলত সেই উদ্দেশ্যেই প্রাণীসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছিল।

পানি কত উঁচুতে উঠেছিল

বন্যাটি নিয়ে আরেকটি বিতর্কের বিষয় হল যে, বন্যার পানি কি এত উঁচুতে উঠেছিল যা পর্বতমালাকে প্লাবিত করেছিল? এটা স্বীকৃত যে, কোরআন আমাদের অবহিত করে যে, বন্যার পর নৌকা এসে আল-জুদিতে অবস্থান নেয়। জুদি শব্দটি সাধারণত কোন পর্বতময় এলাকার উল্লেখ করে, যেখানে আরবী ভাষায় এর অর্থ উঁচু স্থাপনা বা পাহাড় বলে প্রতীয়মান হয়। তাই এটা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, পবিত্র কোরআনে জুদি শব্দটি কোন নির্দিষ্ট পার্বত্য অবস্থানের নাম হিসেবে ব্যবহৃত নাও হতে পারে বরং এটাও নির্দেশ করতে পারে যে, নৌকাটি একটি উঁচু জায়গায় এসে অবস্থান নেয়। তাছাড়া 'জুদি' শব্দটির পূর্বোল্লেখিত অর্থখানা এটাও বুঝাতে পারে যে, পানি একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছেছে, কিন্তু তাই বলে পর্বত-শৃঙ্গের সমতলে নয়। এটাই বলতে হয় যে, খুব সম্ভবত বন্যা পুরো পৃথিবী ও এর পর্বতমালাগুলো গ্রাস করেনি যেমনটি ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত আছে (গ্রাস করেছিল বলে), বরং একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকেই প্লাবিত করেছিল।

নূহ (আঃ)-এর প্লাবনে যে অঞ্চল প্লাবিত হয়েছিল

মেসোপটেমিয়ার সমতলভূমিকেই বন্যার অবস্থান হিসেবে ভাবা হয়ে থাকে। ইতিহাস পরিচিত প্রাচীনতম সভ্যতাগুলো এ অঞ্চলেই ছিল। তাছাড়া, তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মাঝামাঝি অবস্থানে অবস্থিত এই অঞ্চলটি ভৌগোলিকভাবেই বড় বড় জলোচ্ছ্বাসের উপযুক্ত স্থান। বন্যার বিভিন্ন কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ

এক. এই দুই নদী দুই কূল ছেপে প্লাবিত হয় এবং অঞ্চলটিকে নিমজ্জিত করে।

দুই. যে কারণে এই অঞ্চলকে বন্যার অবস্থান হিসেবে বিবেচনায় আনা হয় তাহল "ঐতিহাসিক"।

অঞ্চলটির বিভিন্ন সভ্যতার যুগে রেকর্ডকৃত বহু দলিলপত্র পাওয়া যায় যা ঠিক এ সময়েই যে বন্যা হয়েছিল তার উল্লেখ করে। নূহ (আঃ) সম্প্রদায়ের ধ্বংসযজ্ঞের সাক্ষী হয়ে থাকা এই সভ্যতাগুলো– কিভাবে দুর্যোগ সংঘটিত হল আর এর কি পরিণতি হল তা লিখে রাখার তাগিদ অনুভব করেছিল। এটা জানা গেছে যে, বন্যার বেশির ভাগ উপাখ্যানগুলোর উৎপত্তি এই মেসোপটেমিয়া অঞ্চল থেকেই। আমাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হল প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যাবলী।

এগুলো এটাই প্রমাণ করে যে, বাস্তবিকই এ অঞ্চলে এক বিশাল বন্যার ঘটনা ঘটেছিল। যেমন, পরবর্তী পাতাগুলোতে আমরা সবিস্তারে অনুসন্ধান করে দেখব যে এই বন্যা সভ্যতাকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থামিয়ে রেখেছিল। খননকার্য চালিয়ে এই বিশাল দুর্যোগের স্পষ্ট চিহ্নাবলী মাটি খুঁড়ে বের করে আনা হয়েছে।

মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে খননকার্য করার ফলে এটাই জানা গিয়েছে যে জলোচ্ছ্বাস এবং তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর প্লাবনের ফলে এই অঞ্চল বিভিন্ন সময়ে দুর্যোগে আক্রান্ত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সনে, মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত "উর" নামক এক বৃহত্তর জাতির শাসক "ইব্বি-সিন"-এর সময়কালে একটি বছরের উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে, "স্বর্গ ও মর্ত্যের সীমানা মুছে দেয়া বন্যার পর আগত বছর হিসেবে।" প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ সনে, ব্যাবিলনের হাম্মুরাবির সময়কালের একটি বছর এজন্য উল্লেখিত আছে যে সে সময় "এশনুন্না নগরী" ধ্বংস হয়ে যায় জলোচ্ছ্বাসের কারণে।"

খ্রিস্টপূর্ব দশম শতকে শাসক নাবু-মুকীন-এপাল-এর সময় ব্যাবিলন নগরীতে একটি বন্যা হয়।

ঈসা (আঃ)-এর পর সপ্তম, অষ্টম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য বন্যা সংঘটিত হয়। ঠিক একই ব্যাপার ঘটে বিংশ শতাব্দীতে ১৯১৫, ১৯৩০, ১৯৫৪ সনে।[৩]

এটা স্পষ্ট যে, এ অঞ্চলটি বারংবার বন্যাজনিত দুর্যোগের শিকার হয়ে আসছে আর পবিত্র কোরআনেও নির্দেশিত আছে যে খুব সম্ভবত এক বিশালাকার বন্যা সমগ্র লোক সমাজকে ধ্বংস করতে পেরেছিল।
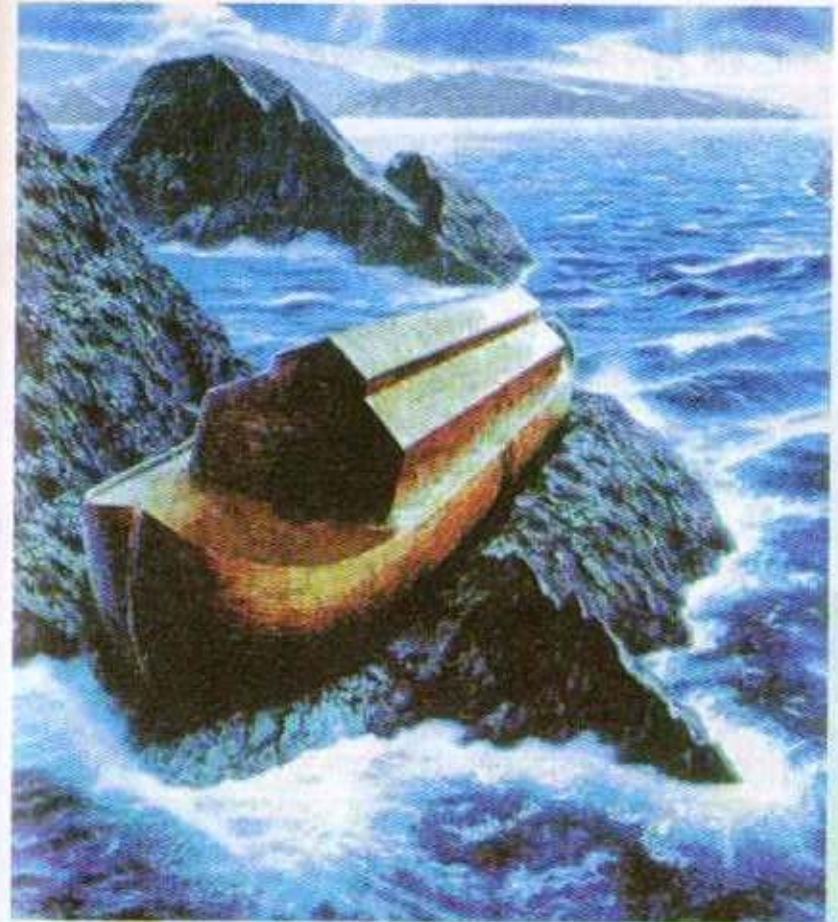
নূহ (আঃ)-এর বন্যাকে চিত্রিত করা এক ছবি

প্রত্নতাত্ত্বিক উপায়ে প্রাপ্ত বন্যার নিদর্শনাবলী

এটা কোন আকস্মিক যোগাযোগ নয় যে, পবিত্র কোরআনে যে সম্প্রদায়গুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বলে বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোর বেশির ভাগ সম্প্রদায়েরই ধ্বংসাবশেষ ও চিহ্নাবলী আজ আমরা খুঁজে পাচ্ছি। প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যগুলো থেকে যে প্রকৃত ব্যাপারটি উদঘাটিত হয়ে আসে তাহল, যত আকস্মিকভাবে একটা সম্প্রদায় নির্মূল বা আড়াল হয়ে যায়, আমাদের পক্ষে সেই সম্প্রদায়ের চিহ্নাবলী খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি বেড়ে যায়।

কখনও কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, হঠাৎ দেশান্তর কিংবা যুদ্ধ এসব ক্ষেত্রে কোন কোন সভ্যতার হঠাৎ বিলুপ্তি ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে সেই সভ্যতার চিহ্নসমূহ বেশ ভালভাবেই সংরক্ষিত থেকে যায়। যে ঘরগুলোতে এক সময় লোকজন বাস করত, আর একদা যে যন্ত্রপাতিসমূহ তারা ব্যবহার করত তাদের দৈনন্দিন জীবনে এগুলো খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে মাটির নিচে চাপা পড়ে যায়। এভাবে এগুলো মানব স্পর্শহীন অবস্থায় দীর্ঘ সময় সংরক্ষিত থাকে; এদের যখন উন্মোচন করা হয় তখন তারা অতীত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রদান করে।

ঠিক এভাবেই আমাদের কালে নূহ (আঃ)-এর বন্যার বেশ কিছু নিদর্শন উন্মোচিত হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দিতে ঘটেছিল বলে চিন্তা করা হয় যে বন্যাটিকে, সেই দুর্যোগটি নিমিষে একটি গোটা সভ্যতার অবসান ঘটায়, পরবর্তীতে এর বদলে আনকোরা এক নতুন সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হয়। এমনি করেই বন্যার স্পষ্ট নিদর্শনাবলী সহস্র বছর ধরে সংরক্ষিত হয়ে এসেছে—যেন আমরা হুঁশিয়ার হতে পারি।

মেসোপটেমিয়ার সমতলভূমিকে প্লাবিত করা এই বন্যার তদন্ত করতে গিয়ে অসংখ্য খননকার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। এ অঞ্চলে চারটি বড় বড় নগরীতে চালানো খননকার্যে যেসব চিহ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছে, অবশ্যই তা বিশেষভাবে কোন বড় ধরনের বন্যার নিদর্শন হয়ে থাকবে। মেসোপটেমিয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ চারটি নগরী হল ঃ উর, ইরেখ, কিশ আর শুরুপ্পাক নগরী।

এই নগরী চারটিতে খননকার্য চালিয়ে এটা অনুধাবন করা গেছে যে, চারটি নগরীই খ্রিস্টপূর্ব প্রায় তিন সহস্রাব্দিতে বন্যায় আক্রান্ত হয়েছিল।

চলুন আমরা সর্বপ্রথম উর নগরীর খননকার্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি

আমাদের কালে উর নগরীর নামকরণ করা হয়েছে "তেল আল মুকাইয়ার" নগরী হিসেবে। খননকার্য চালিয়ে এই নগরীতে প্রাচীনতম যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে, তা খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০ বছরের পুরনো। কোন এক প্রাচীনতম সভ্যতার বসতবাটি এই উর নগরী, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি একের পর এক স্থলাভিষিক্ত হয়ে এসেছে।

উর নগরীতে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলী প্রমাণ করে যে এক বিশাল বন্যার পর এখানকার সভ্যতা বিঘ্নিত হয় এবং এরপর নতুন সভ্যতাসমূহ আবির্ভূত হয়। ব্রিটিশ যাদুঘর থেকে মিঃ আর. এইচ. হল এখানে সর্বপ্রথম খননকার্য সম্পন্ন করেন। হল-এর পরে লিউনার্ড উলী নিজেকে খননকার্য চালিয়ে যাওয়ার কাজে নিয়োজিত করেন। তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়াম এবং পেনসিলভেনিয়া ইউনিভার্সিটি এ দুটির সমন্বয়ে চালানো খননকার্যেরও পরিদর্শন করেন। উলীর পরিচালনায় খননকার্য ১৯২২ হতে ১৯৩৪ সন পর্যন্ত চলে। এই খননকার্য বিশ্বব্যাপী এক বিশাল সাড়া জাগিয়েছিল।

স্যার উলীর এই খননকার্য বাগদাদ ও ইরান উপসাগরের মাঝের মরুভূমিটির মধ্যভাগে সম্পন্ন হয়। উর নগরীর সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠাতা ছিল উত্তর মেসোপটেমিয়া থেকে আসা এক সম্প্রদায়, যারা নিজেদের "উবায়দিয়ান" নামে সম্বোধন করত। মূলত এই লোকদের উপর তথ্য সংগ্রহের জন্যই খননকার্য শুরু হয়েছিল। জার্মান প্রত্নতত্ত্ববিদ, ওয়েরনার কেলার, উলীর খননকার্যের বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপে ঃ

"উর-এর রাজাগণের সমাধিস্থল"— এদের আবিষ্কারের আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে উলী সুমেরিয়ান অভিজাতদের সমাধিস্থলে তরবারি ছুঁইয়ে সম্মান জানালেন, যাঁদের সত্যিকারের রাজোচিত মহিমা প্রকাশ পেল তখনই যখন প্রত্নতত্ত্ববিদদের কোদাল মন্দিরের দক্ষিণে ৫০ ফুট উঁচু ঢিবিতে আঘাত করে আর একটি লম্বা সারিতে একটির উপর অন্যটি এমনভাবে উপরিস্থাপিত সমাধিসমূহ পেয়ে যায়। সত্যিই পাথরের খিলানগুলো ছিল যেন সম্পদের সিন্দুক। কেননা এগুলো পূর্ণ ছিল মূল্যবান পান পাত্রে, চমৎকার আকৃতির জগ ও ফুলদানীতে, ব্রোঞ্জের টেবল সামগ্রীতে, মুক্তার মুজাইকে, নীলকান্ত মণিতে, ক্ষয়ে যাওয়া ধূলায় পরিণত দেহগুলোর চারপাশ রৌপ্য দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় ছিল, দেয়ালে হেলান দিয়ে

রাখা ছিল বীণা ও বাদ্যযন্ত্র। তিনি পরে তাঁর ডায়েরীতে লিখেছিলেন, "প্রায় তৎক্ষণাতই, তা আবিষ্কৃত হয়েছিল। উদঘাটিত হয়েছিল তা যা আমাদের সন্দেহকে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করল।" রাজাদের সমাধির কোন একটির মেঝের নিচে আমরা কাঠ-কয়লার ছাইয়ের স্তরে কাদার অসংখ্য লিপিফলক খুঁজে পেলাম – যেগুলো কিনা কবরের উপরের অভিলিখনের চেয়েও পুরনো বর্ণমালায় খোদাইকৃত ছিল। লেখার ধরন দেখে বিচার করলে শিলালিপিগুলো খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ বছর পূর্বের বলে মনে হয়। তাই এগুলোর সমাধিগুলো হতে দুই বা তিনশত বছর পূর্বেকার হতে পারে।"

"স্তম্ভকাণ্ড (Shaft) গভীর থেকে গভীরে নেমে গিয়েছে। কাঁচের কলস, পাত্র, গামলা ইত্যাদির টুকরায় ও খণ্ডে পূর্ণ নতুন নতুন স্তর বের হতেই লাগল। কুশলীগণ দেখতে পেলেন– মৃত্তিকার তৈরি দ্রব্যগুলো আশ্চর্যজনকভাবে যথেষ্ট অপরিবর্তিত অবস্থায়ই রয়ে গিয়েছে। এগুলো দেখতে ঠিক সেগুলোর মতই যেগুলো রাজাদের সমাধিস্থলগুলোতে পাওয়া গিয়েছিল। তাই দেখে মনে হয় যেন শতকের পর শতক পর্যন্ত সুমেরিয়ান সভ্যতার মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটেনি। উপসংহারে বলা যায়, তারা আশ্চর্যজনকভাবে যথাসময়ের পূর্বেই উন্নতির উপর তলায় পৌঁছে গিয়েছিল। কিছুদিন পর যখন উলীর কিছু শ্রমিক বিস্ময়ে চিৎকার করে বলছিল, "আমরা এখন মাটির সমতলে", তখন তিনি নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিচে নেমে গেলেন। উলীর সর্বপ্রথম ভাবনা ছিল, "অবশেষে এটাই সেটা"। এ ছিল বালি, এক ধরনের স্বচ্ছ বালি, যা কেবল পানির মাধ্যমেই জমা হতে পারে এখানে। তারা খননকার্য চালিয়ে যাওয়ার ও কূপটিকে গভীরতর করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কোদাল মাটির অভ্যন্তরে গভীর থেকে গভীরে চলতে লাগলঃ তিন ফুট থেকে ছয় ফুট—এখনও পরিষ্কার খাঁটি মাটি। কাদার স্তর যেমন হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল দশ ফুটের সমতলে। প্রায় দশ ফুট পুরু জমে থাকা এই কাদার স্তরের নিচে তারা মনুষ্য বাসস্থানের তরতাজা আলামতে আঘাত করল। যে আদিম হাতিয়ারগুলো বের হয়ে আসল সেগুলো কাটা চকমকি পাথরের তৈরি। এটা অবশ্যই প্রস্তর যুগের হবে।

বন্যা প্লাবিত অঞ্চল

প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যানুসারে নূহের বন্যা মেসোপটেমিয়ার সমতলে হয়েছিল। তখন এই সমতলের আকার ছিল ভিন্ন। উপরের চিত্রে সমতলের বর্তমান সীমানা লাল কাটা লাইন দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। লাল লাইনের পিছনের বড় অংশটুকু সে সময়কার সমুদ্রের অংশ ছিল বলে জানা যায়

উর নগরীর পাহাড়ের নিচে এই বিশাল কাদার স্তূপটির একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল, 'বন্যা'— যা কিনা বেশ সুস্পষ্টভাবেই ইতিহাসের দুটি ঘটনাবহুল বসতি বা উপনিবেশকে পৃথক করেছে। কাদায় গেঁথে থাকা ক্ষুদ্র সামুদ্রিক জীবগুলোর দেহাবশেষের মাধ্যমে সমুদ্র তার অভ্রান্ত চিহ্নসমূহ রেখে গিয়েছে।[৪]

আণুবীক্ষণিক বিশ্লেষণ থেকে উন্মোচিত হয়েছে যে, উরে নগরে, পাহাড়ের নিচে এই বিশাল কাদার স্তর এমনি বিশাল বড় এক বন্যার ফলে জমা হয়েছিল, যা (বন্যা) কিনা প্রাচীন সুমেরিয়ান সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করে

দিয়েছিল। মেসোপটেমিয়ার মরুভূমির গভীরে খননকৃত এই কূপটিতে গিলগমেশের মহাকাব্য ও নূহ (আঃ)-এর গল্প যেন একত্র মিলিত হয়ে গিয়েছিল।[৪]

ম্যাক্স ম্যালওয়ান, লিউনার্ডো উলী'র ভাবনা-চিন্তাগুলোর বর্ণনা দেন, যিনি বলেছিলেন যে একটি সময়ের ভগ্নাংশে এত বিশাল পলিমাটির স্তর একমাত্র বিশাল বন্যাজনিত দুর্যোগের ফলেই গঠিত হতে পেরেছে। উলী আরও বর্ণনা করেন, বন্যার স্তরগুলো সম্পর্কে যা নাকি সুমেরিয়ান নগরী উরকে আল-উবায়েদ নগরী থেকে পৃথক করেছে যার অধিবাসীরা বন্যার অবশিষ্টাংশ হিসেবে রয়ে যাওয়া রং করা মাটির পাত্র ব্যবহার করত।[৫]

এগুলোতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, উর নগরী বন্যাকবলিত স্থানগুলোরই একটি। ওয়েরনার কেলার এই বলে উপরোল্লিখিত খননকার্যের গুরুত্ব প্রকাশ করেছেন যে, মেসোপটেমিয়ায় কর্দমাক্ত স্তরের নিচে নগরীর প্রাপ্ত ধ্বংসাবলী এটাই প্রমাণ করে যে, এখানে বন্যা হয়েছিল।[৬]
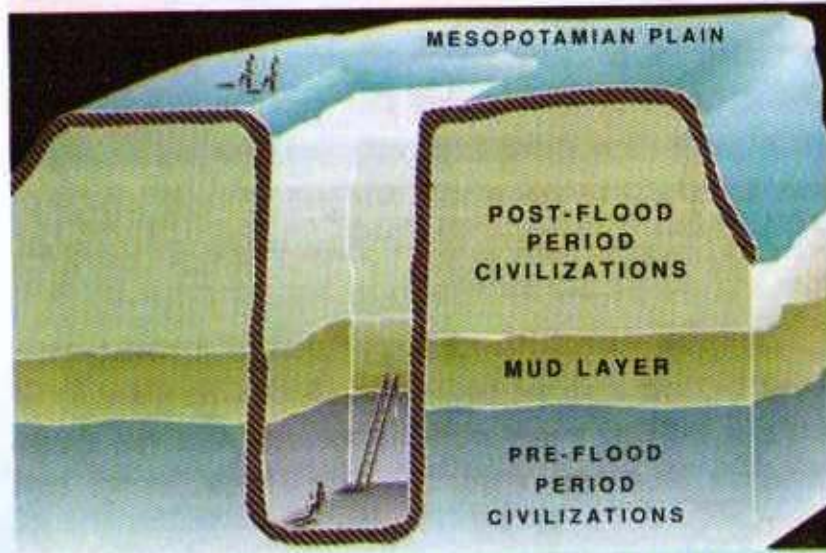
মেসোপটেমিয়ার সমতলভূমিতে লিউনার্ড উলী'র চালানো খননকার্য ভূপৃষ্ঠে মাটির ২.৫ মিটার অভ্যন্তরে কাদার স্তর উদঘাটন করেছে। কাঁদা মাটির এই স্তর খুব সম্ভবত বন্যার বয়ে আনা কাদার স্তূপ দিয়ে গঠিত হয়েছে। সারা বিশ্বে এ স্তরটি কেবল মেসোপটেমিয়ার সমতলের নিচেই রয়েছে। এই উদঘাটন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হয়ে প্রমাণ করছে যে, বন্যা কেবলমাত্র মেসোপটেমিয়ার সমতলভূমিতেই সংঘটিত হয়েছিল

অপর যে একটি নগরী বন্যার চিহ্নাবলী বহন করছে তাহল, **"সুমেরিয়ানদের কিশ"**, যা নাকি তাল-আল-উহায়মার নামে পরিচিত। প্রাচীন সুমেরিয়ান উৎস অনুসারে এ নগরীটি **"সর্বপ্রথম উত্তর ডিলুভিয়ান রাজবংশের আসন"** ছিল।[৭]

একইভাবে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় শুরুপ্পাক নগরী, যা আজ **"তাল ফা'রাহ"** নামে নামাংকিত তাও বন্যার স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ বহন করছে। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সনের মাঝামাঝি সময়ে পেনসিলভানিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে এরিখ স্মিডথ প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানগুলো পরিচালনা করেন। এই খননকার্যগুলোর ফলে মানব বসতির তিনটি স্তর আবিষ্কৃত হয় যা প্রাগৈতিহাসিক যুগের শেষের দিক থেকে উর নগরীর তৃতীয় রাজবংশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল (২১১২-২০০৪ খ্রিস্টপূর্ব)। সবচাইতে স্বাতন্ত্র্যসূচক যা কিছু খননকার্যের ফলে পাওয়া যায় তাহল ঃ প্রশাসনিক নথিপত্র ও শব্দ তালিকা সম্বলিত শিলালিপিসহ মজবুতভাবে নির্মিত বাড়িঘর, যেগুলো কিনা অগ্রসর একটি সমাজের নির্দেশ দেয়, যে সমাজ খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দির শেষের দিকে বিদ্যমান ছিল।[৮]

মুখ্য বিষয়টি হল যে বিশাল এই বন্যাজনিত দুর্যোগ খ্রিস্টপূর্ব ২৯০০ থেকে ৩০০০ সনের মাঝামাঝি সময়ে ঘটেছিল বলে অনুমান করা যায়। মেলওয়ানের বর্ণনা অনুযায়ী, মিঃ স্মিডথ ভূপৃষ্ঠের ৪-৫ মিটার নিচে একটি হলুদ মাটির স্তরে পৌঁছেন (বন্যার ফলে সৃষ্ট) যা কিনা কাদা ও বালির মিশ্রণে তৈরি হয়েছিল। এই স্তরটি সমাধিসমূহের পরিলেখগুলোর চাইতে সমতলের অধিক নিকটবর্তী ছিল, যা কিনা সমাধিস্তূপের চতুর্দিক থেকে দেখা যেতে পারে। ... মিঃ স্মিডথ এই স্তরটি কাদা ও বালুর মিশ্রণে তৈরি বলে নিরূপণ করেন। এই স্তরটিই সিমডেট নাসরের প্রাচীন রাজ্যকালের সময় থেকেই **"নদী থেকে উদ্ভূত বালিস্তর হিসেবে"** বিদ্যমান ছিল, আর এটাই নূহ (আঃ)-এর বন্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।[৯]

শুরুপ্পাক নগরীতে চালান খননকার্যে বন্যার যে নিদর্শনাবলী পাওয়া গিয়েছে, তা প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ২৯০০ থেকে ৩০০০ সনের মধ্যকার সময়ের বলে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। সম্ভবত শুরুপ্পাক নগরী অন্যান্য নগরীগুলোর মতই বন্যাকবলিত হয়েছিল।[১০]

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে সর্বশেষ যে অঞ্চলটিকে দেখান হয় তাহল, শুরুপ্পাকের দক্ষিণে 'ইরেখ নগরী"। বর্তমানে সে নগরী "তাল-আল-ওয়ারকা" নামে পরিচিত। অপরাপর নগরীগুলোর ন্যায় এই নগরীতেও বন্যার স্তর পাওয়া গিয়েছে। ঠিক অন্য নগরীগুলোর মতই এই বন্যাস্তর খ্রিষ্টপূর্ব ২৯০০ থেকে ৩০০০ সনের মধ্যবর্তী সময়ের।[১১]

এটা ভালভাবে জানা আছে যে, তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদী মেসোপটেমিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে কোণাকুণিভাবে চলে গিয়েছে। মনে হয়, ঘটনার সময় এই দুটি নদী ও অন্যান্য অনেক ছোট-বড় পানির উৎসগুলো প্লাবিত হয়ে যায় এবং বৃষ্টির পানির সঙ্গে তা একত্রিত হয়ে বিশাল বন্যার সৃষ্টি করে। এ ঘটনাটি কোরআনে বর্ণিত আছে ঃ

> "অতঃপর আমি আসমানের দরজা খুলিয়া দিলাম প্রচুর বর্ষণমুখর বারিপাতে এবং মৃত্তিকা হইতে উৎসারিত করিয়া দিলাম প্রস্রবণসমূহ; অতঃপর (আসমান-জমিনের) জলরাশি মিলিত হইয়া গেল সেই উদ্দেশ্যে যাহা সিদ্ধান্ত হইয়াছিল।
>
> — সূরা কামার ঃ ১১—১২

যখন বন্যা সৃষ্টির কারণগুলো একে একে পরীক্ষা করে দেখা হয়, তখন এগুলো সবই অতি প্রাকৃতিক বিস্ময়কর ঘটনা বলেই মনে হয়। যা এই ঘটনাটিকে অলৌকিকত্ব প্রদান করেছে তাহল ঃ এসবগুলো ব্যাপারই একই সঙ্গে ঘটেছে আর নূহ (আঃ)-ও এমন একটি দুর্যোগ সম্পর্কে তাঁর সম্প্রদায়কে পূর্ব থেকেই সতর্ক করে আসছিলেন।

পরিপূর্ণ অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত লক্ষণসমূহের মূল্যায়ন উদঘাটন করেছে যে, বন্যাকবলিত অঞ্চলটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রায় ১৬০ কিলোমিটার (প্রস্থে) এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার (দৈর্ঘ্যে) বিস্তৃত ছিল। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে প্লাবনটি পুরো মেসোপটেমিয়া সমতলভূমিকে প্লাবিত করেছিল। আমরা যখন বন্যার চিহ্ন বহনকারী উর, ইরেখ, শুরুপ্পাক ও কিশ নগরীর বিন্যাস পরীক্ষা করে দেখি তখন দেখতে পাই যে, এগুলো একটি পথ বরাবর সারিবদ্ধভাবে রয়েছে। তাই, বন্যা অবশ্যই এই চারটি নগরী ও তাদের আশেপাশের এলাকাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। তাছাড়া, এটাও লক্ষনীয় যে, খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৩০০০ সনে, আজ মেসোপটেমিয়া যেমনটি আছে, তা থেকে এর ভৌগোলিক গঠন ভিন্ন ছিল। সে সময়ে ইউফ্রেতিস নদীর তলদেশ, আজ

যেমন আছে, তার চেয়ে আরও পূর্বদিকে ছিল। পানির এই সরু রেখাখানা উর, ইরেখ, শুরুপ্পাক ও কিশ নগরীর মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত লাইনের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করে।

এটা মনে হয় যে, "আকাশ ও পৃথিবীর ঝরণাগুলো" খুলে যাওয়ার সঙ্গে, ইউফ্রেতিস নদীও প্লাবিত হয়েছিল। এভাবেই পানি ছড়িয়ে গিয়ে উপরের চারটি নগরীর ধ্বংস সাধন করে।

যে ধর্ম ও সংস্কৃতিগুলোতে বন্যাটির উল্লেখ রয়েছে

সত্যধর্ম নিয়ে আসা নবীগণের মুখ থেকে বন্যার ঘটনাটি সম্পর্কে প্রায় সবগুলো সম্প্রদায়ই অবহিত হয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনাটি এই সম্প্রদায়গুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন উপাখ্যানে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং এভাবে তা বিস্তৃত ও বিকৃতও হয়েছিল।

আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন জাতির প্রতি প্রেরিত নবীগণ ও ধর্মসমূহের মাধ্যমে বন্যার ঘটনাটি পৌঁছে দিয়েছেন যেন এই বন্যাটি মানবজাতির প্রতি উদাহরণ ও হুঁশিয়ারি হিসেবে বিবেচিত হয়। তথাপি মূল ঘটনাটিকে প্রতি-বারই পরিবর্তন করা হয়েছে এবং বন্যার ঘটনাটি বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে কেবল বিস্তৃতই হয়েছে।

বন্যার বর্ণনা বিভিন্ন অলৌকিক উপাদানযোগে প্রালম্বিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনই একমাত্র উৎস যা বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর সঙ্গে সুদৃঢ় ঐকমত্যে পৌঁছে। এর কারণ একটিই তাহল আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনকে এমনকি ন্যূনতম পরিবর্তন থেকেও রক্ষা করেছেন এবং একে বিকৃত হয়ে যেতে দেননি। নিম্নে বর্ণিত কোরআনের রায় অনুযায়ী, "আমি নিজেই কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই উহার প্রতিরক্ষক।" (—সূরা হিজর ঃ ৯)। পবিত্র কোরআন আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণের আওতাধীন রয়েছে।

এই অধ্যায়ের সর্বশেষে যে অংশে বন্যাটি আলোচিত হয়েছে, তাতে আমরা দেখব যে, কিভাবে বন্যাটি বাস্তবায়িত হয়েছিল, যদিও তা বিভিন্ন কৃষ্টি আর ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টে বেশ বিকৃত করে বর্ণনা করা হয়েছে।

ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনায় নূহ (আঃ)-এর বন্যা

মূসা (আঃ)-এর প্রতি প্রেরিত সত্যধর্ম সম্বলিত গ্রন্থ হল, তৌরাত। নাজিলকৃত এই গ্রন্থের প্রায় কোন কিছুই (মূল অংশ) বর্তমানে আর অবশিষ্ট নেই। বাইবেল গ্রন্থ (পেন্টাটিউচ), কালচক্রে অনেক আগেই নাজিলকৃত মূল গ্রন্থের সঙ্গে এর সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছে। এমনকি সন্দেহপূর্ণ এই সত্তার বেশির ভাগ অংশই ইহুদীদের ধর্মযাজকগণ কর্তৃক পরিবর্তিত হয়েছে। একইভাবে, মূসা (আঃ)-এর পর বনী ইসরাইলদের প্রতি অন্য নবীগণের সঙ্গে প্রেরিত অহীসমূহ একই আচরণের শিকার হয়ে অনেকাংশেই বিকৃত হয়ে যায়। তাঁই এই অবশিষ্ট অংশখানা আমাদের আহবান করছে আমরা যেন এটাকে **"পরিবর্তিত পেন্টাটিউচ"** নামে পুনঃ নামাঙ্কিত করি, কেননা এটা এর মূল অংশের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে। এতে আমরা একে কোন আসমানী গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ না করে বরং মানবগোষ্ঠীর ইতিহাস লিপিবদ্ধকারী একটি মনুষ্য-তৈরি পণ্য বলে বিবেচনা করার দিকেই পরিচালিত হই।

অনাশ্চর্যজনকভাবে, নূহ (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণনার বেলায় পরিবর্তিত পেন্টাটিউচের প্রকৃতি এবং এর অভ্যন্তরস্থ অসঙ্গতিসমূহ বেশ ভালভাবেই প্রকাশ পায়, যদিও অংশতঃ কোরআনের সঙ্গে এর কিছু সাদৃশ্য রয়েছে।

ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুসারে, ঈশ্বর নূহকে জানালেন যে, বিশ্বাসীরা ছাড়া বাদবাকী সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে, কেননা ভূপৃষ্ঠ সহিংসতায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তিনি নবীকে নৌকা বানানোর আদেশ প্রদান করেন। কিভাবে নৌকা প্রস্তুত করতে হবে এটাও ঈশ্বর সবিস্তারে বর্ণনা করেন। তিনি আরও বললেন যে তিনি যেন তাঁর সঙ্গে তাঁর পরিবার, তিন পুত্র, তিন পুত্রবধূসহ প্রতিটি প্রাণীর দুটি করে ও কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে নৌকায় আরোহণ করেন। সাতদিন পর, বন্যার সময় যখন সমাগত হল, মাটির নিচের সব উৎসগুলো ফেটে বেরিয়ে এল, আকাশের জানালা খুলে গেল, আর বিশাল এক বন্যা সব কিছু গ্রাস করে নিল। চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত পর্যন্ত এটা বিরাজমান ছিল। সকল পর্বত ও উঁচু পাহাড়গুলো প্লাবিত করা পানির মধ্য দিয়ে জাহাজখানা পাড়ি দিল। এভাবে নূহ (আঃ)-এর সঙ্গে যারা জাহাজে উঠেছিল তারা বেঁচে গেল আর বাকীরা বন্যার পানিতে ভেসে গেল এবং নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল।

বন্যার পর বৃষ্টি থেমে গেল, যা কিনা ৪০ দিন ও ৪০ রাত পর্যন্ত বর্ষিত হচ্ছিল, আর তারও ১৫০ দিন পরে পানি সরে যেতে লাগল।

এরপর সপ্তম মাসের সপ্তদশ দিনে, জাহাজখানা আররাত (আগ্রি) পর্বতমালায় অবস্থান নিল। পানি সম্পূর্ণরূপে সরে গেল কি-না তা দেখার জন্য নূহ (আঃ) একটি ঘুঘু পাঠালেন বাইরে; অবশেষে যখন ঘুঘুটি ফিরে আসল না তখন তিনি বুঝলেন যে পানি সম্পূর্ণরূপে সরে গেছে।

ঈশ্বর তাদের জাহাজ থেকে নেমে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে বললেন।

ওল্ড টেস্টামেন্টে এই কাহিনীটির অসঙ্গতিসমূহের একটি হল ঃ এই সারাংশের পরে উদ্ধৃত অংশের ইয়াহউয়িস্ট বর্ণনায় এটা বলা হয়েছে যে ঈশ্বর নূহকে ঐসব প্রাণীগুলোর সাতটি, স্ত্রী ও পুরুষ জোড়া হিসেবে নিতে বললেন যেগুলোকে তিনি পবিত্র বলেছেন আর তিনি যে প্রাণীগুলোকে নাপাক বলেছেন সেগুলো মাত্র একজোড়া সঙ্গে নিতে বললেন। এটা উপরের উদ্ধৃত অংশটুকুর সঙ্গে সঙ্গতি রাখে না। তাছাড়া, ওল্ড টেস্টামেন্টে বন্যার স্থিতিকালও ভিন্ন। ইয়াহউয়িস্টের (Yahwist) বর্ণনানুসারে, **পানির মাত্রা বৃদ্ধি পেতে লেগেছিল ৪০ দিন যেখানে অপেশাদার ব্যক্তিদের বর্ণনায় এটা ১৫০ দিন বলে উল্লেখ করা হয়।**

ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনায় নূহ (আঃ)-এর বন্যার কিছু অংশ

> আর ঈশ্বর নূহকে বললেন, সকল প্রাণীর সমাপ্তি আগত আমার সম্মুখে; কেননা তাদের মাধ্যমে পৃথিবী সহিংসতায় পূর্ণ হয়েছে;
>
> আর দেখুন, আমি পৃথিবীসহ তাদের ধ্বংস করব, আপনি গোফার (gopher) কাঠের একটি নৌকা নির্মাণ করুন, . . .
>
> আর দেখুন, এমনকি আমি অবশ্যই সকল প্রাণীকূলকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য স্বর্গতল থেকে পানির বন্যা নিয়ে আসব, যাতে জীবনের অতি প্রয়োজনীয় শ্বাস (রূহ) রয়েছে, আর সমস্ত কামনা-বাসনা ধ্বংস করব যেন পৃথিবীর সব কিছু মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু আপনার সঙ্গে

আমি চুক্তিপত্র সম্পাদন করব এবং আপনি এই নৌকায় চড়বেন, আপনি আর আপনার পুত্রগণ, এবং আপনার স্ত্রী, আর আপনার সঙ্গে আপনার পুত্রবধূগণ, আর সকল জীবিত প্রতিটি প্রাণীর দুটি করে নিয়ে আপনি নৌকায় উঠাবেন আপনার সঙ্গে তাদের জীবিত রাখতে; তারা হবে স্ত্রী ও পুরুষ . . .

. . . এভাবে ঈশ্বর নূহকে যা আদেশ করলেন তিনি সেভাবে সব সম্পন্ন করলেন।

— জেনেসিস ঃ ১০-২২

আর সপ্তম মাসে, সপ্তবিংশ দিনে নৌকা আরারাত পর্বতমালায় অবস্থান নিল।

— জেনেসিস ঃ ৮-৪

প্রতিটি হালাল প্রাণীর ১টি পুরুষ ও ১টি স্ত্রী এভাবে জোড়া হিসেবে ৭ জোড়া নিবেন এবং যা হালাল নয় তারও পুরুষ ও স্ত্রী জোড়া হিসেবে এক জোড়া নিবেন। পক্ষীদেরও পুরুষ ও স্ত্রী মিলে সাত জোড়া নিবেন; পৃথিবীর বুকে প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তা করবেন।

— জেনেসিস ঃ ৭, ২-৩

আমি আপনার সঙ্গে আমার চুক্তি পূর্ণ করব; না আর কোন প্রাণী বন্যার পানিতে ধ্বংস হবে; না পৃথিবীকে ধ্বংসকারী আরও কোন বন্যা হবে।

— জেনেসিস ঃ ৯, ১১

"পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হবে" সমস্ত দুনিয়া জোড়া এই বন্যায়—এই রায়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুসারে সকল মানব জাতিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কেবলমাত্র তারা বেঁচে যায় যারা নূহ (আঃ)-এর সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করেছিল।

নিউ টেস্টামেন্টে নূহ (আঃ)-এর বন্যা

আজকে নিউ টেস্টামেন্ট খানা আমাদের সামনে রয়েছে তাও প্রকাশের প্রকৃত অর্থে কোন আসমানী গ্রন্থ নয়। ঈসা (আঃ)-এর পর তাঁর কথা ও কাজ নিয়ে গঠিত নিউ টেস্টামেন্ট প্রায় ১০০ বছর বা এক শতাব্দী পর্যন্ত লেখা চারটি গসপেল নিয়ে শুরু হয়। মেথিউ, মার্ক, লিউক ও জন নামে চার ব্যক্তি যারা কখনও ঈসা (আঃ)-কে দেখেনি, কখনও তাঁর সাহচর্য লাভ করেনি — সেই

চারজনই এই গসপেলগুলো লিখেছেন। এই চারটি গসপেলের মাঝে সুস্পষ্ট অসঙ্গতি রয়েছে। বিশেষ করে জনের গসপেলে অন্য তিনটি গসপেল থেকে বেশ পার্থক্য রয়েছে; বাকি তিনটি গসপেল কিনা পুরোপুরি না হলেও একটি আরেকটির সঙ্গে কিছু পরিমাণ সামঞ্জস্য রাখে। নিউ টেস্টামেন্টের অন্যান্য বইগুলো এপস্টলস ও টারসাসের সাউল (পরবর্তী সেন্টপল নামে অভিহিত) লিখিত পত্রাবলী নিয়ে গঠিত। এগুলো ঈসা (আঃ)-এর পর তার অনুসারীদের কার্যাবলী বর্ণনা করে।

তাই আজকের নিউ টেস্টামেন্ট কোন আসমানী ধর্মগ্রন্থ নয়, বরং অর্ধ-ঐতিহাসিক একটি গ্রন্থ।

নিউ টেস্টামেন্ট নূহর বন্যা সংক্ষেপে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ নূহ অবাধ্য এক বিপথগামী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই লোকেরা তার অনুসরণ করেনি, বরং তাদের অন্যায় কার্যাবলী চালিয়ে যেতে লাগল। এতে আল্লাহ তায়ালা বন্যার মধ্য দিয়ে প্রত্যাখ্যানকারীদের জবাবদিহি করার জন্য আহবান করলেন এবং নূহ ও ঈমানদারগণকে নৌকায় উঠিয়ে রেহাই দিলেন। নিউ টেস্টামেন্টের এই বিষয় সম্পর্কিত কিছু অধ্যায় নিম্নরূপ ঃ

কিন্তু নূহর দিনগুলো ছিল যেমন, তেমনি হবে মানবজাতির পুত্রের আগমন। কারণ বন্যার আগের দিনগুলোতে যেমন তারা খাচ্ছিল আর পান করছিল, বিয়ে করছিল ও বিয়ে দিচ্ছিল, সেই দিনটি পর্যন্ত যেদিন নূহ নৌকায় আরোহণ করেন, বন্যার আগমন পর্যন্ত তারা জানত না, আর তাদের সবাইকে সরিয়ে নিল তেমনি হবে মানবজাতির পুত্রের আগমন।

— মেথিউ ঃ ২৪, ৩৭-৩৯

ঈশ্বর ভক্তিহীন পৃথিবীতে বন্যা বইয়ে দিয়ে প্রাচীন এই পৃথিবীকে ছেড়ে দেয়নি বরং ন্যায়নীতি প্রচারক নূহ অষ্টম (ব্যক্তি)-কে বাঁচিয়ে দিল।

— ২য় পিটার ২ ঃ ৫

আর যেমন ছিল নূহর দিনগুলোতে, তেমনি হবে মানবপুত্রের দিনগুলোর বেলায়। তারা খাচ্ছিল, পান করছিল, বিয়ে করছিল, বিয়ে দিচ্ছিল সেদিন পর্যন্ত যেদিন নূহ নৌকায় চড়েন আর বন্যা এসে তাদের সকলকে ধ্বংস করে দিল।

— লিউক ঃ ১৭, ২৬-২৭

যারা কখনও অবাধ্য হয়েছিল, যখন নূহর দিনগুলোতে ঈশ্বরের দীর্ঘ ভোগান্তি অপেক্ষা করছিল, যখন নৌকা তৈরি হচ্ছিল, যাতে (নৌকায়) চড়ে আটটি মাত্র আত্মা পানি থেকে বেঁচে গেল।

— প্রথম পিটার ৩ ঃ ২০

তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এজন্য অজ্ঞ যে, ঈশ্বরের কথায় আকাশ হয়েছিল পুরনো আর পৃথিবী পানির বাইরে ও পানির অভ্যন্তরে অবস্থান করছিল; যদ্দ্বারা তখনকার পৃথিবী পানিতে প্লাবিত ও ধ্বংস হয়ে যায়।

— দ্বিতীয় পিটার ঃ ৩, ৫-৬

অন্যান্য সংস্কৃতিতে বন্যাটির বর্ণনা

সুমার ঃ এনলিল নামক এক দেবতা মানবজাতিকে ডেকে বলল যে অন্যান্য দেবতারা মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার সংকল্প করেছে, কিন্তু একমাত্র সেই নিজে তাদের বাঁচিয়ে দিতে ইচ্ছুক। এই গল্পের নায়ক শিপপুর নগরীর জন্য নিয়োজিত রাজা যিউসুদ্রা (Ziusudra)। দেবতা এনলিল, বন্যা থেকে বাঁচতে হলে কি করতে হবে, তা যিউসুদ্রাকে জানালেন। নৌকা বানানো প্রসঙ্গে বর্ণিত অংশটুকু হারিয়ে গেছে; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হল, যে অংশগুলোয় যিউসুদ্রা বেঁচে যায় বলে বর্ণিত আছে সেগুলোতে এক সময় (নৌকা বানানোর) অংশটুকুও ছিল। বন্যার ঘটনার ব্যাবিলনিয়ার বর্ণনার উপর নির্ভর করে একজন এই সিদ্ধান্তে আসতে পারে যে, ঘটনাটির পূর্ণ সুমেরিয়ান বর্ণনায় বন্যার হেতুটির আরও বেশি সমন্বিত বর্ণনা ও কিভাবে নৌকা তৈরি হয়েছিল এগুলো অবশ্যই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত ছিল।

ব্যাবিলনিয়া ঃ বন্যার বর্ণনায় সুমেরিয়ান নায়ক যিউসুদ্রা-এর ব্যাবিলনিয়ান প্রতিমূর্তি হল, উট ন্যাপিসটিম। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল গিলগমেশ। উপাখ্যানের বর্ণনায়, গিলগমেশ সিদ্ধান্ত নিল যে, সে অমরত্বের গোপন রহস্য পাওয়ার জন্য তার পূর্বপুরুষদের খুঁজে বের করবে। তাকে এমন একটি যাত্রার বিপদ ও প্রতিকূলতাসমূহের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছিল যে সম্ভবত তাকে যাত্রাপথে মাশু পর্বতমালার ও "মরণ পানির" উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। তখনকার সময় পর্যন্ত এমন যাত্রা কেবল সূর্য দেবতা শমাশ কর্তৃকই সম্পন্ন হয়েছিল। তারপরেও গিলগমেশ ভ্রমণের সকল বিপদ-আপদগুলো সাহসের সঙ্গে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে উট-ন্যাপিসটিমের কাছে পৌছুল।

উদ্ধৃত অংশের ঠিক যে জায়গাটুকুতে গিলগশেম ও উট-ন্যাপিসটিমের সাক্ষাতের বর্ণনা আছে সে জায়গাটুকু কাটা ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে; পরে যখন তা (বর্ণনা) স্পষ্টরূপে পাঠ্য হয় সেখানে উট-ন্যাপিসটিম গিলগমেশকে বলেছিল যে, "দেবতারা জীবন ও মৃত্যু রহস্যকে তাদের নিজেদের মাঝেই সংরক্ষিত রাখে (মানবজাতিকে তা জানতে দেয় না); এতে গিলগমেশ, উট-ন্যাপিসটিম কিভাবে অমরত্ব পেয়েছে তা তার কাছে জানতে চাইলে উট-নেপিসটিম তার প্রশ্নের উত্তরে বন্যার কাহিনীটি শোনালো। গিলগমেশ মহাকাব্যের বিখ্যাত ১২টি লিপিফলকে বন্যার বর্ণনা রয়েছে।

উট-নেপিসটিম এই বলে গল্প বলা শুরু করল যে, গল্পটিতে গিলগমেশ বলতে যাচ্ছে তা "এমন কিছু যা গোপন রহস্য, দেবতাদের রহস্য"। সে বলল, সে শুরুপ্পাক নগরীর লোক, যে নগরীটি আককাত দেশের নগরীগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম। তার বর্ণনায়, বেতের কুটিরের প্রাচীরের মধ্য দিয়ে দেবতা "ইআ" তাকে ডেকে বলল যে, দেবতারা সব প্রাণের বীজ বন্যার মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে; কিন্তু ব্যবিলনিয়াতে বন্যার বর্ণনায় বন্যার কারণটি ব্যাখ্যা করা হয়নি, ঠিক যেমন হয়নি সুমেরিয়ান বন্যার কাহিনীতে। উট-ন্যাপিসটিম বলতে লাগল যে "ইআ" তাকে একটি নৌকা বানিয়ে সেখানে "সব জীবের বীজ" এনে তুলতে বলল। সে তাকে নৌকার আকার ও আকৃতি কেমন হবে তা অবহিত করল; আর সেই অনুযায়ী নৌকার প্রস্থ, দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা একই মাপের হয়েছিল। ছয় দিন ছয় রাত ধরে ঝড় সবকিছু ওলট-পালট করে দিল, আর সপ্তম দিনে তা শান্ত হল। উট-ন্যাপিসটিম বাইরে তাকিয়ে দেখল যে "সবকিছু আঁঠালো মাটিতে পরিণত হয়েছে।" জাহাজ পর্বত নিসির-এ এসে অবস্থান নিল।

সুমেরিয়ান ও ব্যাবিলনিয়ান রেকর্ড অনুসারে, একটি ৯২৫ মিটার লম্বা জাহাজে চড়ে যিসুদ্রস অথবা খাসিসাত্রা তার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব এবং কিছু পশু ও পাখিসহ বন্যার কবল থেকে রেহাই পেয়েছিল। এটা বলা হয় যে, পানি আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সমুদ্র উপকূলগুলো প্লাবিত করে আর নদীগুলো তলদেশ থেকে উপচে পড়ে, জাহাজ তখন করিডিআন পর্বতে অবস্থান নিতে আসে।

এসিরিয়ান – ব্যবিলনিয়ান রেকর্ড অনুযায়ী উবার-তুতু অথবা খাসিসাত্রা তার পরিবার, কাজের লোক ও বন্য প্রাণীসহ ৬০০ কিউবিট দৈর্ঘ্য ও ৬০ কিউবিট প্রস্থ ও উচ্চতাসম্পন্ন একটি জাহাজে চড়ে বন্যার কবল থেকে মুক্তি পায়। ছয় দিন আর ছয় রাত পর্যন্ত স্থায়ী ছিল সেই বন্যা। যখন জাহাজ নিযার পর্বতে এসে ভিড়ে তখন মুক্ত করে দেয়া ঘুঘুটি ফিরে এসেছিল কিন্তু দাঁড় কাকটি আর ফেরেনি।

কোন কোন সুমেরিয়ান, এসিরিয়ান ও ব্যবিলনিয়ান রেকর্ডে ছয় দিন ছয় রাত স্থায়ী বন্যা থেকে পরিবার-পরিজনসহ "উট-ন্যাপিসটিম" বেঁচে যায়। এটা উক্ত আছে ঃ "সপ্তম দিবসে উট-ন্যাপিসটিম বাইরে তাকিয়ে দেখল চারদিক ছিল অত্যন্ত শান্ত, স্তব্ধ। মানুষ আরেকবার মাটিতে পরিণত হয়েছে।" নিযার পর্বতে যখন জাহাজ অবস্থান নিল তখন উট-ন্যাপিসটিম একটি কবুতর, একটি দাঁড় কাক ও একটি চড়ুই পাঠাল। দাঁড় কাক মৃতদেহগুলো ভক্ষণের জন্য রয়ে গেল। কিন্তু অন্য দুটি পাখি ফিরে আসল না।

ভারত ঃ ভারতের শতপদ্ম ব্রহ্মা ও মহাভারত কাব্যগ্রন্থে মনু নামের এক ব্যক্তি ঋষিজসহ বন্যা থেকে রক্ষা পায়। এই উপাখ্যান অনুসারে, মনু একটি মাছ ধরে কিন্তু পরে ছেড়ে দিয়ে বাঁচিয়ে দেয়. সেই মাছটি আকস্মিকভাবে বড় হয়ে যায় এবং মনুকে একটি জাহাজ বানিয়ে মাছের শিং-এর সঙ্গে জাহাজটি বেঁধে দিতে বলে।

এই মাছটিকে বিষ্ণু দেবতার প্রকাশ বলে ধরে নেয়া হয়। মাছটি বিশাল বড় বড় ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে জাহাজটি চালিয়ে নিয়ে যায় ও উত্তরে হিম্মাভাত পর্বতে নিয়ে আসে।

ওয়েলস ঃ ওয়েলস উপাখ্যান অনুসারে (ওয়েলস থেকে, ব্রিটেনের একটি সেলটিক অঞ্চল) ডুইনওয়েন ও ডুইফেচ জাহাজে চড়ে বিশাল এক বন্যা থেকে রক্ষা পায়। ঢেউয়ের হ্রদ নামে পরিচিত লিনলিওন ফেটে গিয়ে ভয়ংকর বন্যার সৃষ্টি করে। যখন বন্যার পানি হ্রাস পায় তখন ডুইনওয়েন ও ডুইফেচ ব্রিটেনে আবার নতুন করে মানব জাতির বিস্তার করে।

স্ক্যানডিনাভিয়া (Scandinavia) ঃ নরডিক এড্ডা উপাখ্যান এ সংবাদ সরবরাহ করে যে বেরগালমির ও তার স্ত্রী বড় নৌকায় চড়ে বন্যা থেকে বেঁচে যায়।

লিথুয়ানিয়া (Lithuania) ঃ লিথুয়ানিয়ান উপাখ্যানে এটা বলা হয় যে, কতিপয় মানুষ ও কয়েক জোড়া প্রাণী একটি সুউচ্চ পর্বতের উপর একটি খোলে আশ্রয় নিয়ে রক্ষা পায়। যখন বার দিন ও বার রাত স্থায়ী ঝড় ও বন্যা এত বেশি প্রচণ্ডতর হয়ে পর্বতের উপর পর্যন্ত পৌছল যে তা পাহাড়ের উপরের সব কিছু প্রায় গ্রাস করেই ফেলছিল যেন। সৃষ্টিকর্তা তাদের উপর একটি বড় বাদামের খোসা ফেলে দিলেন। এই বাদামের খোলে চড়ে পর্বতের উপরের লোকজন বেঁচে যায়।

চীন ঃ চাইনিজ সূত্রের বর্ণনায় এটা পাওয়া যায় যে, ইয়াও নামে এক ব্যক্তি অন্যান্য আরও সাতজন লোকসহ অথবা ফা লী তার স্ত্রী ও সন্তানগণসহ একটি নৌকায় চড়ে এই জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও ভূমিকম্প হতে রক্ষা পায়। উক্ত আছে যে, "সমস্ত পৃথিবী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। পানি ফেটে বের হয়ে আসল আর প্লাবিত করল সর্বত্র।" অবশেষে পানি হ্রাস পেল।

গ্রীক পুরাণে নূহ (আঃ)-এর বন্যা ঃ দেবতা জিউস সেই লোকজনকে বন্যার মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল, যারা কিনা দিনে দিনে অধিক থেকে অধিকতর অন্যায়ে লিপ্ত হচ্ছিল। একমাত্র ডিউকেলিয়ন ও তার স্ত্রী পরিহা বন্যা থেকে রক্ষা পায়। কেননা, ডিউকেলিয়নের পিতা প্রমিথিউস পূর্বেই তার পুত্রকে একটি নৌকা বানাতে উপদেশ দিয়েছিল। এই দম্পতি নৌকায় আরোহণের পর নবম দিনে পার্নাসোস পর্বতে পদার্পণ করে।

এ সব উপাখ্যানগুলো এক দৃঢ় ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনার নির্দেশ করে। ইতিহাসে লেখা আছে যে, প্রতিটি সম্প্রদায়ই সংবাদ পেয়েছিল; প্রতিটি ব্যক্তি স্বর্গীয় ওহী থেকে বার্তা পেয়েছিল; আর এভাবেই অসংখ্য সম্প্রদায় বন্যাজনিত দুর্যোগটি সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল।

দুর্ভাগ্যজনক যে, মানবজাতি আসমানী বাণীসমূহের সারবস্তু থেকে নিজেদের অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়েছে, ফলে বন্যার বর্ণনা অসংখ্য পরিবর্তনের শিকারে পরিণত হয়েছে এবং রূপান্তরিত হয়েছে উপাখ্যান ও লোককাহিনীতে।

নাজিলকৃত আসমানী গ্রন্থগুলোর মাঝে একমাত্র পবিত্র কোরআনই অবিকৃত গ্রন্থ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। এই কোরআনই একমাত্র উৎস, যা থেকে আমরা নূহ (আঃ) এবং এই নবীকে প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের প্রকৃত গল্পটি খুঁজে পেতে পারি।

পবিত্র কোরআন কেবল নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের সময়কার প্লাবনই নয়, বরং আরও অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ও সম্প্রদায়সমূহের সঠিক তথ্যাবলী আমাদের সরবরাহ করেছে। পরবর্তী পাতাগুলোয় আমরা সেসব সত্য কাহিনীগুলোই পর্যালোচনা করব।

অধ্যায় দুই

ইব্রাহিম (আঃ) ও তাঁর জীবন

"ইব্রাহিম না ইহুদী ছিলেন, না খ্রিস্টান ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন সরল পথাবলম্বী (অর্থাৎ) ইসলামধর্মী, তিনি কখনও মুশরেকদের দলভুক্ত ছিলেন না।

নিশ্চয় সকল মানুষের মধ্যে ইব্রাহিম-এর সহিত অত্যধিক সমবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন তাঁহারাই ছিলেন যাহারা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন আর ঐ নবী [মুহাম্মদ (সঃ)] এবং ঈমানদারগণ, আর আল্লাহ ঈমানদারগণের আশ্রয়দাতা।"

— সূরা আলে-ইমরান ঃ ৬৭ -৬৮

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা প্রায়ই ইব্রাহিম (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাঁকে মানবজাতির প্রতি উদাহরণস্বরূপ প্রদর্শন করে সম্মানিত করেছেন।

তিনি তাঁর মূর্তিপূজক সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহ তায়ালার বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন এবং তাদের সতর্ক করেন যেন তারা আল্লাহকে ভয় করে। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় তাঁর কথাতো শুনেইনি বরং উল্টা তাঁর বিরোধিতাই করেছিল। যখন তাদের নির্যাতনের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন ইব্রাহিম (আঃ), তাঁর স্ত্রী, লূত (আঃ) এবং তাঁদের কিছু অনুসারীসহ দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হন।

নবী ইব্রাহিম (আঃ) নূহ (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। পবিত্র কোরআনেও উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি নূহ (আঃ)-এর প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করেছিলেন ঃ

নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক জগৎবাসীর মধ্যে। আর আমি নিষ্ঠাবানদের এইরূপ পারিতোষিকই দিয়া থাকি। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন আমার বিশ্বাসী বান্দাগণের অন্যতম। অতঃপর আমি অন্যান্য লোকদের

নিমজ্জিত করিলাম। আর নূহের উত্তরসূরীদের মধ্যে ইব্রাহিমও ছিলেন।

— সূরা সাফফাত ঃ ৭৯-৮৩

ইব্রাহিম (আঃ)-এর সময়কালে, মেসোপটেমিয়ার সমতলভূমি, আর মধ্য ও দক্ষিণ আনাতোলিয়ায় বসবাসকারী বহু লোক আকাশ ও তারকারাজির উপাসনা করত। তাদের সবচেয়ে বড় দেবতা ছিল চন্দ্র দেবতা "সিন"। এই দেবতাকে একজন লম্বা দাড়িওয়ালা লোক অর্ধচন্দ্রাকৃতির একটি চাঁদ সম্বলিত একখানা পোশাক পরে আছে — এমন একটি রূপে প্রকাশ করা হত। তাছাড়াও এসব দেবতার প্রতিকৃতির বুটি খচিত পোশাক ও ভাস্কর্য তৈরি করত তারা। বহু বিস্তৃত এই বিশ্বাস প্রথা অদূর প্রাচ্যে এর যথার্থ ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিল এবং এভাবেই বহুকাল যাবত এর অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এই এলাকার অধিবাসী লোকজন প্রায় ৬০০ সন পর্যন্ত এসব দেবতার পূজা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। এই বিশ্বাসের ফলস্বরূপ মেসোপটেমিয়া হতে আনাতোলিয়ার অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে "যিগুরাত" নামে কিছু নির্মাণকার্য তৈরি করা হয় যা মানমন্দির ও মন্দির হিসেবে ব্যবহৃত হত। আর এখানে চন্দ্র দেবতা "সিনের" পূজা চলত।[১২]

পবিত্র কোরআনে এ ধরনের বিশ্বাস প্রথার কথা উল্লেখিত আছে, যা কিনা অধুনা প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে কেবল সেদিন আবিষ্কৃত হয়েছে। কোরআনে উল্লেখ আছে যে, ইব্রাহিম (আঃ) নিজে এসব দেবতার পূজা পরিহার করেন এবং একমাত্র সত্যিকারের প্রভু, আল্লাহ্ তায়ালার দিকে নিজেকে ফিরিয়ে আনেন। কোরআন শরীফে ইব্রাহিম (আঃ)-এর আচরণের কথা উল্লেখ রয়েছে ঃ

> আর (সেই সময় ও স্মরণীয়) যখন ইব্রাহিম আপন পিতা আযরকে বলিলেন, "তুমি কি প্রতিমাগুলোকে মা'বুদ সাব্যস্ত করিতেছ? নিশ্চয় আমি তোমাকে ও তোমার সকল সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখিতেছি।" আর এরূপে আমি ইব্রাহিমকে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি রহস্য প্রদর্শন করাইয়া দেই যেন তিনি আরেফ হইয়া যান এবং প্রত্যয়শীলদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যান।
>
> অনন্তর তাঁহার উপর যখন রাত্রির আঁধার আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল তখন তিনি একটি (উজ্জ্বল) তারকা দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি বলিলেন, "ইহা আমার প্রতিপালক", অতঃপর যখন ইহা অস্তমিত হইয়া গেল তখন তিনি বলিলেন, "আমি অস্তগামীদের ভালবাসি না।"
>
> তৎপর যখন প্রদীপ্ত চন্দ্র দেখিলেন তখন তিনি বলিলেন, "ইহা আমার প্রভু", অতঃপর ইহা যখন অস্তমিত হইল, তিনি বলিলেন, "আমার প্রভু যদি আমাকে হেদায়েত না করেন, তবে আমি নিশ্চয় বিপথগামীদের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া যাইব।"
>
> অতঃপর প্রদীপ্ত সূর্য যখন দেখিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "ইহা আমার প্রতিপালক। ইহা সর্বাপেক্ষা বড়", অনন্তর, ইহা যখন অস্তমিত হইল, তখন তিনি বলিলেন, "হে আমার গোত্রবাসী! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের অংশীবাদে অসন্তুষ্ট।"
>
> আমি একাগ্রতার সহিত আমার চেহারাকে সেই সত্তা অভিমুখী করিতেছি যিনি সমুদয় আসমান ও জমিন সৃষ্টি করিয়াছেন। আর আমি মোশরেকদের দলভুক্ত নহি।"

— সূরা আনআম ঃ ৭৪-৭৯

পবিত্র কোরআনে ইব্রাহিম (আঃ)-এর জন্মস্থান ও বাসস্থানের কথা সবিস্তারে বলা হয়নি। কিন্তু একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে যাতে করে এটা নির্দেশিত হয়েছে যে, ইব্রাহিম (আঃ) ও লূত (আঃ) কাছাকাছি এলাকায়ই বাস করতেন আর তাঁরা ছিলেন সমসাময়িক। ঘটনাটি হল যে, লূত সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূত (আঃ)-এর কাছে যাওয়ার পূর্বে, ইব্রাহিম (আঃ)-এর কাছে আগমন করেন এবং তাঁর (ইব্রাহিম আঃ) স্ত্রীকে সন্তান হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেন।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত ইব্রাহিম (আঃ) সম্পর্কে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ওল্ড টেস্টামেন্টে যার উল্লেখ নেই, তাহল "কাবাগৃহ নির্মাণ"। পবিত্র কোরআনে আমাদের বলা হয়েছে যে, ইব্রাহিম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) কর্তৃক কাবাগৃহ নির্মিত হয়েছে। আজ কাবার অতীত সম্পর্কে কেবল যে একটি জিনিস ঐতিহাসিকগণ থেকে জানা যায় তাহল, অতি প্রাচীনকাল থেকেই তা পবিত্র স্থান হিসেবে গৃহীত হয়ে আসছে। নবী করিম (সাঃ)-এর পূর্বে অজ্ঞতার যুগে কাবাগৃহে মূর্তি স্থাপন করা হয় যা-কিনা প্রকৃতপক্ষে ইব্রাহিম (আঃ)-এর প্রতি একদা নাজিলকৃত আসমানী ধর্মেরই অবক্ষয় ও বিকৃতির ফলস্বরূপ ঘটেছিল।
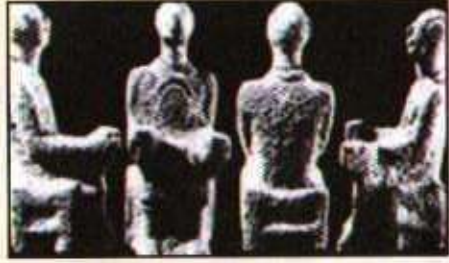
নবী ইব্রাহিমের সময়কালে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে বহু ঈশ্বরবাদী ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতাগুলোর মাঝে অন্যতম একটি ছিল — চন্দ্র দেবতা "সিন।" জনগণ এ সময় দেবতাদের মূর্তি বানিয়ে পূজা-অর্চনা করত। বামে, সিনের প্রতিমাগুলো দেখা যাচ্ছে। মূর্তিগুলোর বুকের উপর অর্ধচন্দ্রাকৃতি নকশা পরিষ্কারভাবে দেখা যায়
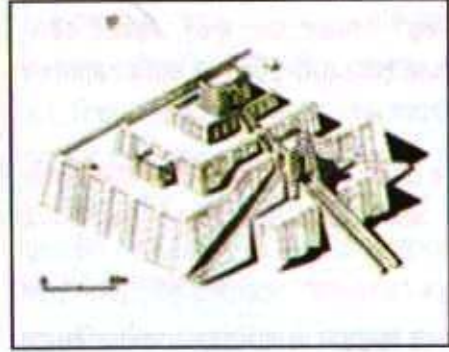
যিগুরাতগুলো মন্দির ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক মান মন্দির উভয়টি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এগুলো সে যুগের সবচেয়ে প্রাগ্রসর প্রযুক্তি দিয়ে নির্মিত হত। নক্ষত্ররাজি, চন্দ্র এবং সূর্য আরাধনার প্রাথমিক বস্তু ছিল, আর তাই, আকাশের ছিল সর্বোচ্চ গুরুত্ব। বামে আর নিচে মেসোপটমিয়ার গুরুত্বপূর্ণ যিগুরাতগুলো দেখা যাচ্ছে

ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনায় ইব্রাহিম (আঃ)

এমনকি যদিও ওল্ড টেস্টামেন্টের বেশিরভাগ বর্ণনাই নির্ভরযোগ্য নয়, তথাপি এটাই খুব সম্ভবত হযরত ইব্রাহিম (আঃ) সম্পর্কে সবচাইতে বিস্তারিত মৌলিক উৎস হিসেবে বিদ্যমান।

এতে বর্ণিত আছে যে, ইব্রাহিম (আঃ) মেসোপটেমিয়া সমতলের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত সে সময়কার একখানা উল্লেখযোগ্য নগরী "উরে", খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ১৯০০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর তাঁর প্রথম নাম "আব্রাহাম" ছিল না, ছিল "আব্রাম"। পরবর্তীতে ঈশ্বর তাঁর সেই নামটি পরিবর্তন করেন।

ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনানুসারে, একদা ঈশ্বর ইব্রাহিমকে তাঁর দেশ ও সম্প্রদায় ছেড়ে এক অজানা দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে ও সেখানে গিয়ে এক নতুন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করতে আদেশ করেন।

ঈশ্বরের আহবানে সাড়া দিয়ে, ৭৫ বছর বয়সে আব্রাম তাঁর স্ত্রী সারাই (যিনি পরবর্তীতে সারাহ নামে পরিচিত হবেন, আর এর অর্থ হল রাজকুমারী) আর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র লূতকে সঙ্গে করে পথে রওনা দিলেন। মনোনীত জায়গাটির উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে তাঁরা হারান নামক স্থানে কিছু সময় অবস্থান করেন এবং এরপর আবার যাত্রা শুরু করেন।

যখন তাঁরা ঈশ্বর কর্তৃক প্রতিশ্রুত কেনান রাজ্যে পৌঁছেন তখন তাঁদের বলা হয় যে, এই স্থানটি বিশেষভাবে তাঁদেরই জন্য মনোনীত জায়গা; আর এটা তাঁদেরই প্রতি মঞ্জুর করা হয়েছে। ইব্রাহিম যখন ৯৯ বছর বয়সে পদার্পণ করেন, তখন ঈশ্বরের সঙ্গে একটি অঙ্গীকার করেন; আর তাঁর নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় "আব্রাহাম"। ১৭৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং আজ ইসরাইলীদের দখলকৃত ওয়েস্ট ব্যাংকে হেব্রণ নগরীর (আল-খলিল) নিকটস্থ ম্যাচপেলাহ নামক গুহায় সমাহিত হন।

ইব্রাহিম (আঃ) কর্তৃক কিছু অর্থের বিনিময়ে খরিদকৃত এই স্থানটিই প্রতিশ্রুত অঞ্চলে তাঁর ও তাঁর পরিবারের সর্বপ্রথম সম্পত্তি ছিল।

ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনা অনুসারে ইব্রাহিম (আঃ)-এর জন্মস্থান

ইব্রাহিম (আঃ) কোথায় জন্মেছিলেন এটা সব সময়ই একটি বিতর্কের বিষয় হিসেবে রয়ে গিয়েছে। যখন ইহুদী-নাসারাগণ বলে যে, ইব্রাহিম (আঃ) দক্ষিণ

মেসোপটেমিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন, তখনই ইসলামী জগতে বিরাজমান ধারণা হল যে, তাঁর জন্মস্থান উরফা হারান (Urfa Harran)। কিছু নতুন তথ্যানুসারে, ইহুদী ও নাসারাদের বিবৃতিগুলোতে পুরোপুরি সত্য প্রতিফলিত হয়নি।

ইহুদী ও নাসারাগণ তাদের দাবির জন্য ওল্ড টেস্টামেন্টের উপর নির্ভর করে; কেননা এতে বলা আছে যে, ইব্রাহিম (আঃ) দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার উর নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর সেই নগরীতেই তিনি লালিত-পালিত হন। বলা হয় যে, তিনি পরে মিসরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন, পথিমধ্যে তুরস্কের হারান অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গিয়ে লম্বা সফর শেষে মিসরে পৌছেন।

যাই হোক, সম্প্রতি প্রাপ্ত ওল্ড টেস্টামেন্টের একটি পাণ্ডুলিপি এই তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে এক ভয়ঙ্কর সন্দেহের জন্ম দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত ওল্ড টেস্টামেন্টের সব কপিগুলোর মধ্যে সবচাইতে পুরনো বলে গৃহীত খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর এই গ্রীক পাণ্ডুলিপি খানায় "উর" নামটির কখনই উল্লেখ করা হয়নি। অধুনা ওল্ড টেস্টামেন্টের অনেক গবেষকই বলেছেন যে, "উর" নামটি ভুল কিংবা পরে সংযোজিত হয়েছে। এটা ইহাই সূচিত করে যে, ইব্রাহিম (আঃ) উর নগরীতে জন্মগ্রহণ করেননি এবং তাঁর জীবনে হয়ত কখনও মেসোপটেমিয়া অঞ্চলেই আসেননি।

তাছাড়া, কিছু স্থানের নাম এবং এদের সূচিত অঞ্চল সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। আমাদের সময়ে, মেসোপটেমিয়া সমতল বলতে ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রীস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী ইরাকী অঞ্চলের দক্ষিণ তীরকে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের সময়ের দুই সহস্র বছর পূর্বে, মেসোপটেমিয়া অঞ্চল হিসেবে সূচিত এলাকাটি আরও উত্তরে, এমনকি যা হারান পর্যন্ত পৌছেছিল; এবং তা বর্তমান তুর্কী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাই, এমনকি আমরা যদি ওল্ড টেস্টামেন্টের উক্ত "মেসোপটেমিয়া সমতল" — কেই সঠিক বলে ধরে নেই, তবে এটা চিন্তা করা বিভ্রান্তকর হবে যে, ২ হাজার বছর পূর্বেকার মেসোপটেমিয়া আর আজকের মেসোপটেমিয়া ঠিক সেই জায়গা।

এমনকি যদিও, উর নগরীতে ইব্রাহিম (আঃ)-এর জন্ম হয়েছিল, বিষয়টি নিয়ে গুরুতর সন্দেহ ও মতানৈক্য রয়েছে, কিন্তু তবুও একটি বিষয়ে সাধারণ ঐকমত্য রয়েছে যে, হারান ও এর আশপাশের অঞ্চলগুলো হল সেই স্থান যে স্থানে ইব্রাহিম (আঃ) বাস করতেন।

অধিকন্তু, ওল্ড টেস্টামেন্টের উপর চালানো ছোট একটি গবেষণা কিছু তথ্য সরবরাহ করে যা কিনা ইব্রাহিম (আঃ)-এর জন্মস্থান হারানে ছিল এই অভিমতটুকুই সমর্থন করে। উদাহরণস্বরূপ, ওল্ড টেস্টামেন্টে হারান অঞ্চলকে "আরাম অঞ্চল" (— জেনেসিস ১১ : ৩১ ও ২৮ : ১০) নামে অভিহিত করা হয়েছে। এটা বলা হয়েছে যে ইব্রাহিম (আঃ)-এর বংশ থেকে আগত লোকজন হল "আরামীর পুত্র" (ডিউটেরোনোমি, ২৬ : ৫)

ইব্রাহিম (আঃ)-এর পরিচয় লেখা হয়েছে "আরামী" হিসেবে এটা ইব্রাহিম (আঃ) এই অঞ্চলেই যে জীবনযাপন করেছিলেন তারই প্রমাণ।

মূল ইসলামিক নথিপত্রে, ইব্রাহিম (আঃ)-এর জন্মস্থান "হারান" "উরফাতে" হওয়ার শক্ত প্রমাণ রয়েছে। "নবীদের নগর" নামে পরিচিত এই "উরফাতে" ইব্রাহিম (আঃ)-এর বহু কাহিনী ও উপাখ্যান রয়েছে।

কেন ওল্ড টেস্টামেন্ট পরিবর্তিত হয়েছিল

ওল্ড টেস্টামেন্ট ও পবিত্র কোরআন আব্রাহাম ও ইব্রাহিম নামের দু'জন ভিন্ন নবীর বর্ণনা দিয়েছে বলেই প্রায় মনে হয়ে থাকে। পবিত্র কোরআনে আছে যে ইব্রাহিম (আঃ) মূর্তিপূজক এক সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হন। তাঁর জাতি নভোমণ্ডল, নক্ষত্ররাজি, চন্দ্র ও বিভিন্ন মূর্তির উপাসনা করত। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত হন, তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসসমূহ থেকে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস চালান, আর অনিবার্যভাবেই তাঁর পিতাসহ পুরো সম্প্রদায়ের শত্রুভাবকে প্রজ্জলিত করেন।

প্রকৃতপক্ষে, ওল্ড টেস্টামেন্টে এসবের কিছুই উল্লেখ নেই। ইব্রাহিম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ, তাঁর সম্প্রদায়ের মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলা — এগুলো ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লেখিত হয়নি। ওল্ড টেস্টামেন্টে ইব্রাহিম (আঃ)-কে ইহুদীদের পূর্বসূরী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে, ওল্ড টেস্টামেন্টের এই অভিমত ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রধানগণ কর্তৃক নীত হয়, যারা কিনা 'সম্প্রদায়' ধারণাটিকে সামনে নিয়ে আসার পথ খোঁজেন। ইহুদীরা বিশ্বাস করে যে, তারা হল সেই জাতি, যারা চিরন্তনভাবে ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত এবং তাদের স্থানই সবার উপরে। তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ও ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ঐশীগ্রন্থে পরিবর্তন আনে। আর তাতে তাদের এই বিশ্বাস অনুসারেই সংযোজন ও বিলোপ সাধন করে। আর তাই "ওল্ড টেস্টামেন্টে" ইব্রাহিম (আঃ)-কে কেবল "ইহুদীদেরই পূর্ব-পুরুষ" বলে চিত্রিত করা হয়েছে।

ওল্ড টেষ্টামেন্টে বিশ্বাসী খ্রিষ্টানগণ ইব্রাহিম (আঃ)-কে ইহুদীদেরই পূর্বপুরুষ বলে চিন্তা করে, কিন্তু কেবল একটি পার্থক্য তাতে বিদ্যমান; খ্রিষ্টানদের মতে ইব্রাহিম (আঃ) ইহুদী নন, একজন খ্রিষ্টান। যে খ্রিষ্টানগণ ইহুদীদের মত এত বেশি "সম্প্রদায়" ধারণাটি কানে তোলে না, তারাই এই অবস্থানটি গ্রহণ করে আর এটাই দুই ধর্মের মধ্যকার অনৈক্য ও সংগ্রামের কারণসমূহের একটি। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এই বিতর্কগুলোর নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাবলীর বর্ণনা করেন ঃ

> "হে কিতাবীগণ! তোমরা ইব্রাহিম সম্বন্ধে কেন বিতর্ক কর? অথচ অবতীর্ণ করা হইয়াছিল না তৌরাত ও ইঞ্জিল (কিতাবদ্বয়); কিন্তু তাঁহার (যুগের অনেক) পরে তবুও কি বুঝিতেছ না।
>
> হ্যাঁ, তোমরা এরূপ যে, এমন বিষয়ে তোমরা বিতর্ক করিয়াছিলে, যে সম্বন্ধে তোমাদের সম্যক অবগতি ছিল, কিন্তু এমন বিষয়ে কেন তর্ক করিতেছ যে সম্বন্ধে তোমাদের মোটেই জ্ঞান নাই, আর আল্লাহ তায়ালা জানেন এবং তোমরা জান না।"
>
> ইব্রাহিম না ইহুদী ছিলেন, না খ্রিষ্টান ছিলেন, বাস্তবপক্ষে তিনি ছিলেন সরল পথাবলম্বী (অর্থাৎ) ইসলাম ধর্মী, তিনি কখনও মুশরেকদের দলভুক্ত ছিলেন না।
>
> নিশ্চয় সকল মানুষের মধ্যে ইব্রাহিমের সহিত অধিক সমবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উহারাই ছিলেন যাহারা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন আর এই নবী এবং এই ঈমানদারগণ, আর আল্লাহ ঈমানদারদের আশ্রয়দাতা।"
>
> — সূরা আলে-ইমরান ঃ ৬৫-৬৮

ওল্ড টেষ্টামেন্টে ইব্রাহিম (আঃ) সম্পর্কে যা লিখিত আছে, কোরআনে তা হতে অত্যন্ত ভিন্নভাবে চিত্রিত করা হয়েছে এই নবীর কথা।

পবিত্র কোরআনে উক্ত আছে যে ইব্রাহিম (আঃ) এমন এক ব্যক্তি যিনি তাঁর জাতিকে সতর্ক করেছিলেন যেন তারা আল্লাহকে ভয় করে; আর যিনি শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি তাঁর যৌবনকাল হতেই তাঁর মূর্তিপূজক জাতিকে হুঁশিয়ার করতে শুরু করেন যেন তারা তাদের এ রীতি (শিরক) বর্জন করে। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে হত্যার প্রয়াসও চালায়। নবী ইব্রাহিম (আঃ) তাঁর জাতির নীতি বিগর্হিত কাজ থেকে পালিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন।

অধ্যায় তিন

লূত সম্প্রদায় এবং লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়া সেই নগরীটি

> "লূত সম্প্রদায় পয়গম্বরদের মিথ্যা প্রতিপাদন করিয়াছে। আমি তাহাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করিলাম, লূত সংশ্লিষ্টদের ব্যতীত, তাহাদিগকে রজনীর শেষভাগে উদ্ধার করিয়া লই, আমার পক্ষ হইতে অনুগ্রহপূর্বক যে শোকর করে তাহাকে আমি এইরূপ প্রতিদান দিয়া থাকি।
>
> লূত তাহাদিগকে ভয় দর্শাইয়াছিলেন আমার ধর-পাকড় সম্পর্কে। তাহারা সেই ভয় দর্শান সম্বন্ধে ঝগড়া সৃষ্টি করিল।"
>
> — সূরা ক্বামার ঃ ৩৩-৩৬

লূত (আঃ) নবী ইব্রাহিম (আঃ)-এর সঙ্গে একই সময়ে বর্তমান ছিলেন। ইব্রাহিম (আঃ)-এর কোন এক প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের প্রতি লূত (আঃ) নবী হিসেবে প্রেরিত হন। কোরআনের বর্ণনানুসারে এই জনগোষ্ঠী পায়ুকাম (Sodomy) নামে এক বিকৃত রুচির অনুশীলন করত যা কিনা তখনও পর্যন্ত তখনকার পৃথিবীতে ছিল অজানা। লূত (আঃ) যখন তাদের এই বিকৃত রুচি পরিহার করতে বললেন, তাদের কাছে আল্লাহর সতর্কবাণী নিয়ে আসলেন, তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল। তাঁকে নবী বলে মেনে নিতে অস্বীকার করল, তারা এবং তাদের বিকৃত রুচির অনুশীলন চালিয়েই যেতে লাগল। পরিণামে এ জনগোষ্ঠী এক ভয়ংকর দুর্যোগের মধ্য দিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ওল্ড টেস্টামেন্টে লূত সম্প্রদায় যে নগরীতে বসবাস করে আসছিল তাকে সডম (Sodom) নামে অভিহিত করা হয়েছে। লোহিত সাগরের উত্তরে বসবাসকারী এ সম্প্রদায় পবিত্র কোরআনে যেভাবে উল্লেখিত আছে, ঠিক সেভাবেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বলে জানা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে এটা প্রকাশিত হয়েছে যে, এ নগরীটি Dead Sea-এর সেই অঞ্চলটিতে অবস্থিত ছিল যা-কিনা ইসরাইল-জর্ডান সীমান্ত বরাবর প্রসারিত।

এই দুর্যোগের ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণ করে দেখার পূর্বে চলুন আমরা দেখি কেন লূত সম্প্রদায় এমন উপায়ে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল। পবিত্র কোরআন আমাদের বলছে কিভাবে লূত (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে হুঁশিয়ার করেন আর জবাবে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা কি বলেছিল ঃ

> লূত সম্প্রদায়ও প্রত্যাখ্যান করিয়াছে নবীদিগকে। তাহাদিগকে যখনই তাহাদেরই ভাই লূত (আঃ) বলিলেন, "তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় কর না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। আর আমিও ইহাতে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহিতেছি না, আমার পুরস্কার তো বিশ্ব প্রতিপালকের জিম্মায় আছে। কি, সারা জগতবাসীর মধ্য হইতে তোমরা পুরুষদের সহিত অপকর্ম করিতেছ? অথচ তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভু যেই স্ত্রীগণ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদিগকে তোমরা বর্জন করিয়া থাক? বরং তোমরা সীমালংঘনকারী লোক।"
>
> তাহারা বলিল, "তুমি যদি হে লূত! (এরূপ উক্তি হইতে ক্ষান্ত না হও, তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হইবে।"
>
> লূত বলিলেন, "আমি তোমাদের এই কর্মকে অত্যন্ত ঘৃণা করি।"
>
> — সূরা শু'আরা ঃ ১৬০-১৬৮

লূত সম্প্রদায়, তাদেরকে ন্যায়পথে পরিচালিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানানোর উত্তরে লূত (আঃ)-কে ভীতি প্রদর্শন করল। তাঁর জাতি তাঁকে তীব্র ঘৃণা করতে লাগল কেননা তিনি তাদের প্রকৃত ন্যায়পথ প্রদর্শন করেছিলেন। তারা তাঁকে তাঁর অনুসারীগণসহ নির্বাসিত করতে চাইল।

অন্যান্য আয়াতসমূহে ঘটনাটি নিম্নরূপ উক্ত হয়েছে

> আর আমি লূতকে পাঠাইলাম, তিনি যখন তাঁহার সম্প্রদায়কে বলিলেন, "তোমরা কি এইরূপ অশ্লীল কাজ করিতেছ? যাহা তোমাদের পূর্বে জগতবাসীদের মধ্যে কেহ করে নাই। (অর্থাৎ) তোমরা পুরুষের সঙ্গে কামনা-বাসনা চরিতার্থ কর নারীদের বর্জন করিয়া। তোমরা বরং সীমাই (মানবতা) লংঘন করিয়া গিয়াছ।"
>
> আর তাঁহার সম্প্রদায় কোন জবাবই দিতে পারিল না ইহা ব্যতীত যে, তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল যে, "তোমরা ইহাদেরকে আপন আবাসভূমি হইতে বাহির করিয়া দাও, ইহারা বড় পবিত্র বনিতেছে।"
>
> — সূরা আরাফ ঃ ৮০-৮২

লূত (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে এক স্পষ্ট সত্যের দিকে আহবান করলেন আর তাদের অত্যন্ত পরিষ্কার ও পরিপূর্ণভাবে হুঁশিয়ার করে দিলেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় কোন ধরনের সাবধান বাণীর প্রতিই কর্ণপাত করল না বরং অব্যাহতভাবে লূত (আঃ)-কে অস্বীকার আর তিনি তাদের যে শাস্তির কথা বলেছেন তা প্রত্যাখ্যান করে যেতে লাগল।

> আর আমি লূতকে নবী বানাইয়া পাঠাইলাম, তিনি যখন তাঁহার সম্প্রদায়কে বলিলেন, "তোমরা এমন অশ্লীল কর্ম করিতেছ যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্ববাসীদের কেহই করে নাই।"
>
> তোমরা কি পুরুষদের সঙ্গে উপগত হও? (সেই অশ্লীল কাজ হইল ইহাই)। এবং তোমরা রাহাজানিও কর আর (আশ্চর্যের বিষয় হইল এই) তোমরা নিজেদের ভরপুর মজলিশেই এই নির্লজ্জ কাজ কর, অতঃপর তাঁহার সম্প্রদায়ের (শেষ) উত্তর ছিল কেবল এই — "তুমি আমাদের প্রতি আল্লাহর আযাব লইয়া আস তুমি যদি সত্যবাদী হও (যে আমাদের এই কাজ শাস্তির কারণ)।"

লূত (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের জবাব পেয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন ঃ

> লূত প্রার্থনা করিলেন, "হে আমার প্রভু! আমাকে এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের উপর বিজয়ী করিয়া দিন।"
>
> — সূরা আনকাবুত ঃ ৩০

তাহারা মানিল না এবং লূত দোয়া করিলেন "হে প্রভু! আমাকে এবং আমার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদেরকে ইহাদের কর্ম (দশা) হইতে রক্ষা করুন।"

— সূরা শু'আরা ঃ ১৬৯

লূত (আঃ)-এর প্রার্থনার পর, আল্লাহ তায়ালা দু'জন ফেরেশতাকে পুরুষের আকৃতি দিয়ে পাঠালেন। ফেরেশতাদ্বয় লূত (আঃ)-এর কাছে আগমনের পূর্বে হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁরা ইব্রাহিম (আঃ)-কে এই সুসংবাদ দিলেন যে, তাঁর স্ত্রী এক শিশু সন্তানের জন্ম দিবেন। তারপর তাঁরা তাঁদের আগমনের কারণ ব্যাখ্যা করে বললেন যে, উদ্ধত লূত সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যাবে।

হযরত ইব্রাহিম বলিতে লাগিলেন, "আচ্ছা তবে, (বল দেখি), হে ফেরেশতাগণ! তোমরা কোন বড় অভিযানের সম্মুখীন?"

তাঁহারা বলিলেন, "আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের (লূত জাতির) প্রতি প্রেরিত, যেন তাহাদের প্রতি আমরা প্রস্তর ও কংকর নিক্ষেপ করি। যাহা আপনার প্রভুর নিকট সীমালংঘনকারীদের জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে।"

— সূরা যারিয়াত ঃ ৩১-৩৪

কিন্তু লূত-এর পরিবার-পরিজন ব্যতীত তাঁহাদের সকলকে আমরা উদ্ধার করিব, কেবল তাঁহার (লূতের) পত্নী ব্যতীত; কারণ তাহার সম্বন্ধে আমরা ধার্য করিয়া রাখিয়াছি যে, সে অবশ্যই এই অপরাধপরায়ণ সম্প্রদায়ে থাকিয়াই যাইবে।"

— সূরা হিজর ঃ ৫৯-৬০

দূত হিসেবে প্রেরিত ফেরেশতাদ্বয় ইব্রাহিম (আঃ)-এর সঙ্গ ছেড়ে লূত (আঃ)-এর কাছে আগমন করলেন। পূর্বে ফেরেশতাগণের সঙ্গে কখনও সাক্ষাত না হওয়ায় তিনি (লূত আঃ) প্রথমে বিচলিত হলেন, পরে তাঁদের সঙ্গে কথা বলে শান্ত হন।

আর যখন আমার সেই ফেরেশতাগণ লূত-এর নিকট আসিলেন, তখন লূত তাঁহাদের কারণে চিন্তান্বিত হইলেন এবং (সেই একই কারণে) তাঁহাদের (আগমন) হেতু সঙ্কোচ বোধ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "ইহা একটি নিদারুণ দিবস।"

— সূরা হুদ ঃ ৭৭

(লূত বলিতে লাগিলেন), "আপনারা তো (অপরিচিত) লোক (মনে হয়)।" তাঁহারা বলিলেন, "না অধিকন্তু, আমরা সেই বস্তু লইয়া আসিয়াছি, যাহা সম্বন্ধে ইহারা সন্দেহ করিতেছিল।"

আমরা আপনার নিকট বাস্তব ঘটিতব্য বিষয় লইয়া আসিয়াছি এবং আমরা সম্পূর্ণ সত্যবাদী। সুতরাং আপনি রজনীর কোন অংশে আপনার পরিবার-পরিজনকে লইয়া (এতদঞ্চল হইতে) সরিয়া পড়ুন এবং আপনি সকলের পিছনে থাকুন এবং আপনাদের কেহই যেন পিছন দিকে ফিরিয়া না তাকায় এবং যেইখানে আপনাদের আদেশ দেওয়া হইয়াছে সেদিকেই চলিয়া যাইবেন।

আর আমি লূত-এর নিকট এই সিদ্ধান্ত পাঠাইয়া দিয়াছিলাম যে, প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে উহারা সমূলে উৎখাত হইয়া যাইবে।

— সূরা হিজর ঃ ৬২-৬৬

ইতিমধ্যে লূত সম্প্রদায়ের লোকেরা নবীর নিকট অতিথিদের আগমনের সংবাদ জেনে গেল। তারা এই নবাগত মেহমানদের নিকট বিকৃত প্রস্তাব নিয়ে হাজির হতে কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করল না, কেননা পূর্বেও অন্যদের কাছে তারা এমনিভাবেই উপস্থিত হয়েছিল। গৃহের চারপাশ ঘিরে ফেলল তারা। অতিথিদের ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে লূত (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজনকে আহবান করে বললেন ঃ

লূত বলিলেন, "তাঁহারা আমার মেহমান, অতএব তোমরা আমাকে অপমানিত করিও না এবং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে লজ্জিত করিও না।"

— সূরা হিজর ঃ ৬৮-৬৯

তাহারা বলিতে লাগিল, "আমরা কি আপনাকে সমগ্র পৃথিবীর লোকদের (আশ্রয় দেওয়া) সম্বন্ধে নিষেধ করি নাই?"

— সূরা হিজর ঃ ৭০

লূত (আঃ), নিজে ও তাঁর মেহমানগণ অন্যায় আচরণের শিকার হতে যাচ্ছেন ভেবে বললেন ঃ

"কি উত্তম হইত যদি তোমাদের উপর আমার কোন ক্ষমতা চলিত কিংবা আমি কোন মজবুত স্তম্ভের আশ্রয় গ্রহণ করিতাম।"

— সূরা হুদ ঃ ৮০

তাঁর অতিথিগণ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তাঁরা আল্লাহর দূত এবং বললেন;

ফেরেশতাগণ বলিলেন, "হে লূত! আমরা হইলাম আপনার প্রভু প্রেরিত (ফেরেশতা)। তাহারা তো কখনও আপনার নিকট পৌঁছিতে পারিবে না, অতএব আপনি রাতের কোন ভাগে আপনার পরিবার-পরিজনদের লইয়া (এখান হইতে) চলিয়া যান, আর আপনাদের কেহ যেন পিছন দিকে ফিরিয়াও না তাকায়; হ্যাঁ, কিন্তু আপনার স্ত্রীও যাইবে না, তাহার উপরও বিপদ সমাগত হইবে, যাহা অন্যদের প্রতি আসিবে। তাহাদের (আযাবের) প্রতিশ্রুত সময় হইল।

— সূরা হুদ ঃ ৮১

নগরীর লোকদের বিকৃত আচরণ যখন চরম সীমায় পৌঁছিল তখনই আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণের মাধ্যমে লূত (আঃ)-কে রক্ষা করলেন। সকালবেলায় তাঁর সম্প্রদায় সেই দুর্যোগেই ধ্বংস হয়ে যায়, যার কথা লূত (আঃ) আগেই তাদের অবহিত করেছিলেন।

পরে তাহারা লূতের নিকট হইতে তাঁহার অতিথিদেরকে কু-উদ্দেশ্যে ছিনাইয়া লইতে চাহিল; সুতরাং আমি তাহাদের চোখসমূহ বিলীন করিয়া দিলাম, "যে লও, আমার শাস্তি ও ভয় দর্শানোর আস্বাদন ভোগ কর।" আর ভোরে তাহাদের উপর বিরামহীন শাস্তি আসিয়া পৌঁছিল।

— সূরা ক্বামার ঃ ৩৮

যে আয়াতগুলো এ সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষের বিবরণ দিয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

"অতঃপর সূর্য উদিত হইতেই এক প্রচন্ড শব্দ আসিয়া তাহাদেরকে চাপিয়া ধরিল। তৎপর আমি সেই জনপদের; ঊর্ধ্বস্ত ভাগকে (উল্টাইয়া) অধঃস্ত করিয়া দিলাম এবং সেই লোকদের উপর আমি কঙ্কর ও প্রস্তর বর্ষণ করিলাম। নিশ্চয় এই ঘটনায় অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে। আর এই জনপদগুলি একটি চলাচল পথের ধারে অবস্থিত।"

— সূরা হিজর ঃ ৭৩

"অনন্তর (আযাবের জন্য) আমার আদেশ যখন সমাগত হইল তখন সেই জনপদের উপরিভাগকে (উল্টাইয়া) নিচে করিয়া দিলাম এবং উহার উপর ঝামা পাথর বর্ষণ আরম্ভ করিলাম, যাহা অবিরত পড়িতেছিল, যাহা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে বিশেষ চিহ্নও ছিল। আর সেই জনপদ এই যালিমদের হইতে তেমন কোন দূরে নহে।"

— সূরা হুদ ঃ ৮২-৮৩

"অতঃপর আমি অন্যান্য সকলকে নিপাত করিলাম। আর আমি তাহাদের উপর এক বিশেষ (শিলা) বৃষ্টি বর্ষণ করিলাম। বস্তুত, কি নিকৃষ্ট বৃষ্টি ছিল, যাহা সেই ভয় প্রদর্শিতদের উপর বর্ষিত হইয়াছিল। ইহাতেও উপদেশ রহিয়াছে, কিন্তু (তবুও) তাহাদের অনেকেই ঈমান আনিতেছে না। আর আপনার প্রভু নিশ্চয় মহাপরাক্রমশালী পরম দয়ালু।"

— সূরা শু'আরা ঃ ১৭২-১৭৫

যখন লূত সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেল, তখন লূত (আঃ) এবং বিশ্বাসীগণ বেঁচে গেলেন, যাদের সংখ্যা খুব বেশি হলে সর্বমোট একটি পরিবারের লোকজনের সমান হবে। লূত (আঃ)-এর স্ত্রীও ঈমান আনেনি তাই সে-ও ধ্বংস হয়ে যায়।

আর আমি লূত-কে পাঠাইলাম, তিনি যখন তাঁহার সম্প্রদায়কে বলিলেন, "তোমরা কি এরূপ অশ্লীল কাজ করিতেছ? যাহা তোমাদের পূর্বে জগতবাসীদের মধ্যে কেহ করে নাই।

(অর্থাৎ) তোমরা পুরুষের সহিত কাম-বাসনা চরিতার্থ কর নারীদের বর্জন করিয়া। তোমরা বরং (মানবতার) সীমালংঘন করিয়া গিয়াছ।"

আর তাঁহার সম্প্রদায় কোন উত্তরই দিতে পারিল না ইহা ব্যতীত যে, "তোমরা তাহাদেরকে আপন আবাসভূমি হইতে বাহির করিয়া দাও, তাহারা বড় পবিত্র বনিতেছে।"

অতএব আমি লূত-কে এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে বাঁচাইয়া লইলাম, তাঁহার স্ত্রীকে ব্যতীত, সে তাহাদের মধ্যেই রহিয়া গেল, যাহারা আজাবের মধ্যে রহিয়াছিল। আর আমি তাহাদের উপর এক নবরূপের বৃষ্টি বর্ষণ করিলাম (অর্থাৎ পাথর বর্ষণ করিয়াছিলাম)। অতএব দেখুনতো এই পাপীদের পরিণাম কিরূপ হইল।

— সূরা আ'রাফ ঃ ৮০-৮৪

এভাবেই লূত (আঃ), তাঁর স্ত্রী বাদে, তাঁর পরিবার-পরিজন ও ঈমানদারগণসহ রেহাই পেয়েছিলেন। ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে যে, তিনি ইব্রাহিম (আঃ)-এর সঙ্গে দেশ ত্যাগ করেন। আর বিকৃত স্বভাবের সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাদের বসতবাড়ি ধূলায় মিশে যায়।

লূতের হ্রদে "স্পষ্টত প্রতীয়মান নিদর্শনাবলী বিদ্যমান"

সূরা হূদের ৮২ আয়াত, লূত সম্প্রদায়ের উপর যে ধরনের দুর্যোগ আপতিত হয়েছিল, তা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে।

> "অনন্তর আজাবের জন্য আমার আদেশ যখন সমাগত হইল তখন সেই জনপদের উপরিভাগকে (উল্টাইয়া) নিচে করিয়া দিলাম এবং উহার উপর ঝামা পাথর বর্ষণ আরম্ভ করিলাম, যাহা অবিরত পড়িতেছিল।"

"জনপদের উপরিভাগকে (উল্টাইয়া) নিচে করিয়া দিলাম" এই উক্তিটি এটাই সূচিত করছে যে, প্রচন্ড এক ভূমিকম্পের ফলে অঞ্চলটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। সেই অনুসারে, লূতের হ্রদ, যেখানে ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়, তা এমন একটি দুর্যোগের স্পষ্টত প্রতীয়মান নিদর্শন বহন করছে।

নিম্নে আমরা জার্মান প্রত্নতত্ত্ববিদ ওয়েরনার কেলার এর বক্তব্য তুলে ধরছি ঃ

শক্তিশালী ফাটলের ভিত্তি যা ঠিক এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে, সেটি নিয়ে সিদ্দিম উপত্যকা, সডম ও গমররাহ সহ একই সঙ্গে একদিন অতল গহবরে তলিয়ে যায়। এগুলোর ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয় এক জোরালো ভূমিকম্পের মাধ্যমে, যার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল বিস্ফোরণ, বজ্রপাত, প্রাকৃতিক গ্যাসের উদগীরণ এবং বিশাল ও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড।[১৩]

বাস্তবিক পক্ষে, লূতের হ্রদ যা অন্যভাবে "ডেডসী" বা "মরু সাগর" নামে পরিচিত, তা একটি সক্রিয় ভূমিকম্প এলাকার ঠিক উপরে অবস্থিত, যার মানে এটি হল একটি ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা।

ডেডসী বা মরুসাগর-এর তল বা ভিত্তি একটি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত টেককটোনিক প্লেটের পতনসহ বিদ্যমান। এই উপত্যকাটি উত্তর তাবেরি-এ হ্রদ আর দক্ষিণে আরাবাহ (Arabah) উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানে একটি প্রসারণ বা টানের উপর অবস্থিত।[১৪]
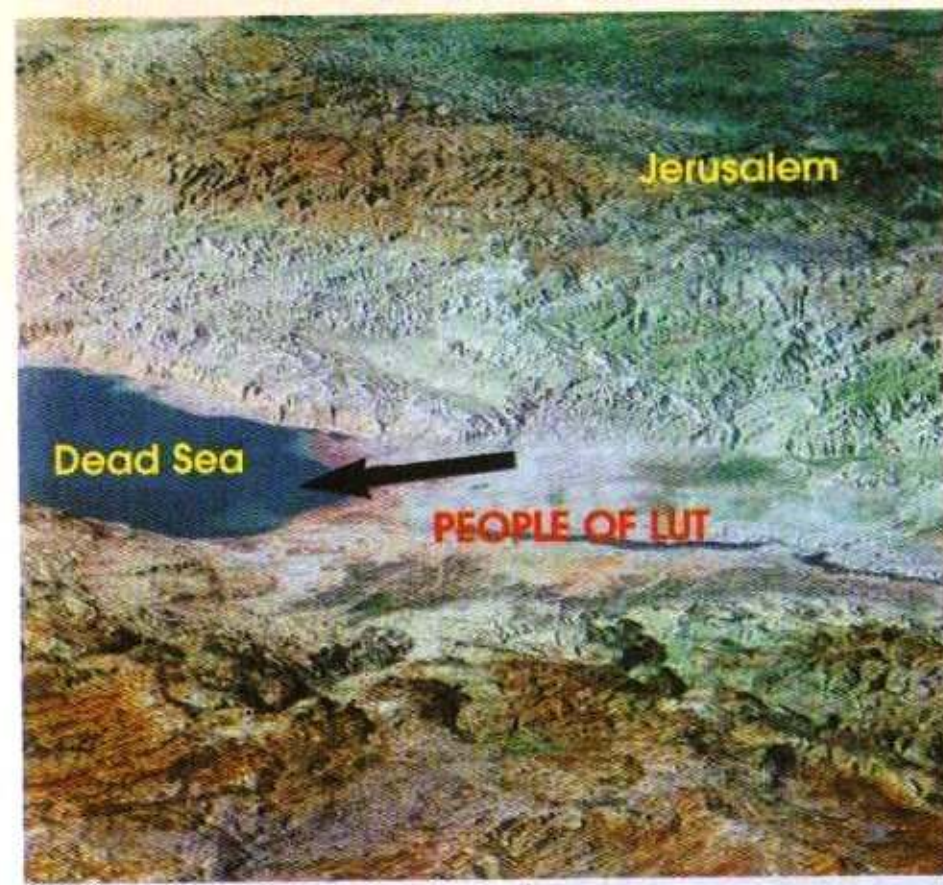
আয়াতের শেষের দিকে ঘটনাটি এমনভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, "উহার উপর ঝামা পাথর বর্ষণ আরম্ভ করিলাম যাহা অবিরত (স্তরের উপর স্তরের ন্যায়) পড়িতেছিল।" খুব সম্ভবত এটা একটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বা উদগীরণকে বুঝাচ্ছে যা-কিনা লূত হ্রদের তীরে সংঘটিত হয়েছিল। আর যেই কারণেই পোড়া পাথর ও শিলা বর্ষিত হচ্ছিল। (একই ঘটনা সূরা শুআরা-এর ১৭৩ আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

> "আর আমি তাহাদের উপর এক বিশেষ (শিলা) বৃষ্টি বর্ষণ করিলাম, বস্তুত কি নিকৃষ্ট ছিল যাহা সেই ভয় প্রদর্শিতদের উপর বর্ষিত হইয়াছিল। ইহাতেও উপদেশ রহিয়াছে কিন্তু তবুও তাহারা ঈমান আনিতেছে না।"

এ বিষয়টি সম্পর্কে ওয়েরনার কিলার লিখেছেন

ভূমিধ্বস আগ্নেয়গিরির প্রবলতাকে বিমুক্ত করে যা ফাটলের পুরো দৈর্ঘ্য বরাবর অত্যন্ত সুপ্তাবস্থায় ছিল। বাশানের কাছে জর্ডানের উপরকার উপত্যকায় লুপ্ত আগ্নেয়গিরির সুউচ্চ জ্বালামুখগুলো এখনও বিদ্যমান। চুনাপাথরের পৃষ্ঠের উপরিভাগে লাভার বিশাল বিস্তৃতি ও কালো পাথরের গভীর স্তরের তলানি পড়ে আছে।[১৫]

একদা এখানে যে এক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল তারই অন্যতম সাক্ষ্য বহন করছে এই লাভা ও চুনাপাথরের স্তরগুলো। "আমি উহার উপর ঝামা পাথর বর্ষণ আরম্ভ করিলাম যাহা অবিরত পড়িতেছিল।" পবিত্র কোরআনে চিত্রিত এই দুর্যোগটির এরূপ অভিব্যক্তি খুব সম্ভবত আগ্নেয়গিরির উদগীরণকেই নির্দেশ করছে, আর আল্লাহ তায়ালাই উত্তম জানেন।

"অনন্তর (আজাবের জন্য) আমার আদেশ যখন সমাগত হইল তখন সেই জনপদের উপরিভাগকে (উল্টাইয়া) নিচে করিয়া দিলাম।" –একই আয়াতে বর্ণিত এই ঘটনাটুকু অবশ্যই সেই ভূমিকম্পের কথা উল্লেখ করেছে যারই ফলে আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ ঘটেছিল, যা ভূ-পৃষ্ঠে এক ধ্বংসাত্মক প্রভাব রেখে যায়, আর এই ভূমিকম্প রেখে যায় ফাটল ও ধ্বংসাবশেষসমূহ। আর একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই প্রকৃত সত্যটুকু জানেন।

কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে নেয়া লূত হ্রদের ছবি

লূত হ্রদ যে **"স্পষ্টত প্রতীয়মান চিহ্নাবলী"** বহন করছে তা সত্যিই কৌতূহলোদ্দীপক। সাধারণত পবিত্র কোরআনে যে ঘটনাগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলো মধ্যপ্রাচ্যে, আরব উপদ্বীপ ও মিসরে সংঘটিত হয়েছে। এসব অঞ্চলগুলোর ঠিক মধ্যভাগেই অবস্থিত লূতের হ্রদ। লূত হ্রদ আর এর আশে পাশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি ভূতাত্ত্বিকভাবে মনোযোগ আকর্ষণের যোগ্যতা রাখে। ভূমধ্যসাগর পৃষ্ঠের প্রায় ৪০০ মিটার গভীরে বা নিচে অবস্থিত এই হ্রদটি। যেহেতু হ্রদের গভীরতম এলাকাই হল ৪০০ মিটার, সেহেতু হ্রদের তলা ভূমধ্যসাগর পৃষ্ঠ থেকে ৮০০ মিটার নিম্নে রয়েছে। এটাই পৃথিবীর সর্বনিম্নতম এলাকা। অন্যান্য যেসব এলাকা সমুদ্র পৃষ্ঠের নিম্নে অবস্থিত সেগুলোর গভীরতা বড়জোর ১০০ মিটার। লূত হ্রদটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এর পানিতে লবণের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি, ঘনত্ব প্রায় ৩০%। এ কারণেই মাছ কিংবা মস ইত্যাদি কোন জীবই এখানে টিকে থাকতে পারে না। পশ্চিমা সাহিত্যে তাই লূত হ্রদকে **"ডেড-সী"** বলে অভিহিত করা হয়।

লূত হ্রদ বা ভিন্ন নামে ডেড-সী

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত লূত সম্প্রদায়ের ঘটনাটি আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ১৮০০ সনে সংঘটিত হয়। জার্মান গবেষক ওয়েরনার কেলার তার প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভূতাত্ত্বিক গবেষণার উপর ভিত্তি করে লিখেন যে, সডম ও গমররাহ নগরী প্রকৃতপক্ষে সিদ্দিম উপত্যকায় অবস্থিত ছিল, লূতের হ্রদের দূরতম ও নিম্নতম প্রান্তে এই অঞ্চলটি ছিল।

আর এক সময় ঐ অঞ্চলগুলোতে বেশ বড় ও বিস্তৃত জনবসতি বিদ্যমান ছিল।

লূত হ্রদের অত্যন্ত কৌতূহলকর অদ্ভুত কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যটুকু এক ধরনের সাক্ষী হিসেবে বিদ্যমান যা-কিনা, পবিত্র কোরআনে বর্ণিত দুর্যোগময় ঘটনাটি কিভাবে ঘটেছিল, তা প্রদর্শন করে ঃ

> **"ডেড-সী বা মরুসাগর বা মৃত সাগরের পূর্ব উপকূলে আল-লিসান উপদ্বীপটি দূরে পানির অভ্যন্তরে জিহ্বার আকৃতির ন্যায় প্রলম্বিত হয়েছে। আরবীতে আল-লিসান শব্দটির মানে হল, "জিহ্বা"।** স্থলভাগ থেকে দেখা যায় না এমন এই ভূমিটি এখানে পানিপৃষ্ঠের নিচে একটি অতিকায় কোণের ন্যায় পতিত হয়ে সমুদ্রকে দুইভাগে ভাগ করেছে।

বামে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও তার ফলে ভূমিধ্বসের ছবি। ভূমিধ্বসের ফলেই গোটা সম্প্রদায় নির্মূল হয়ে যায়
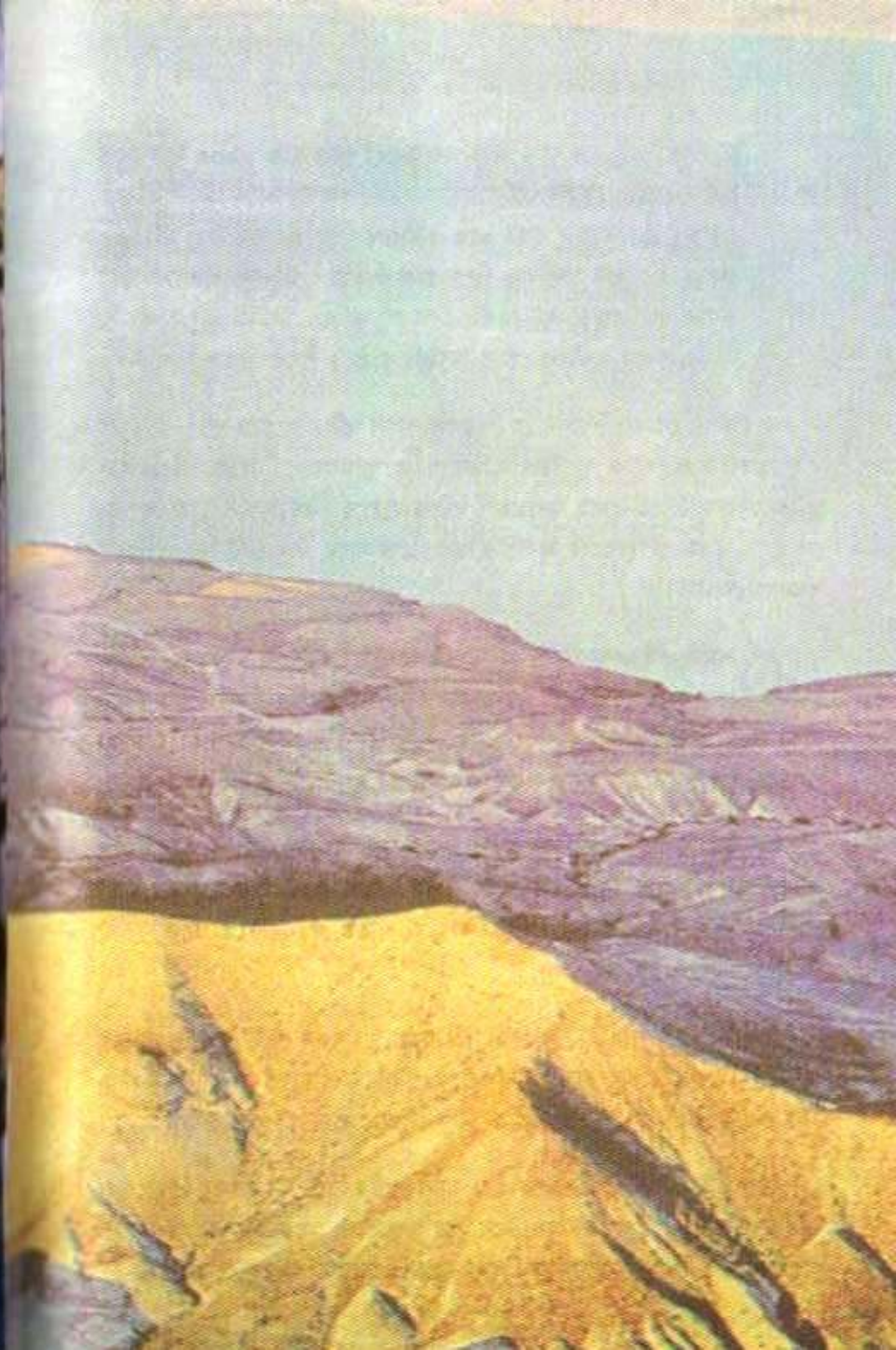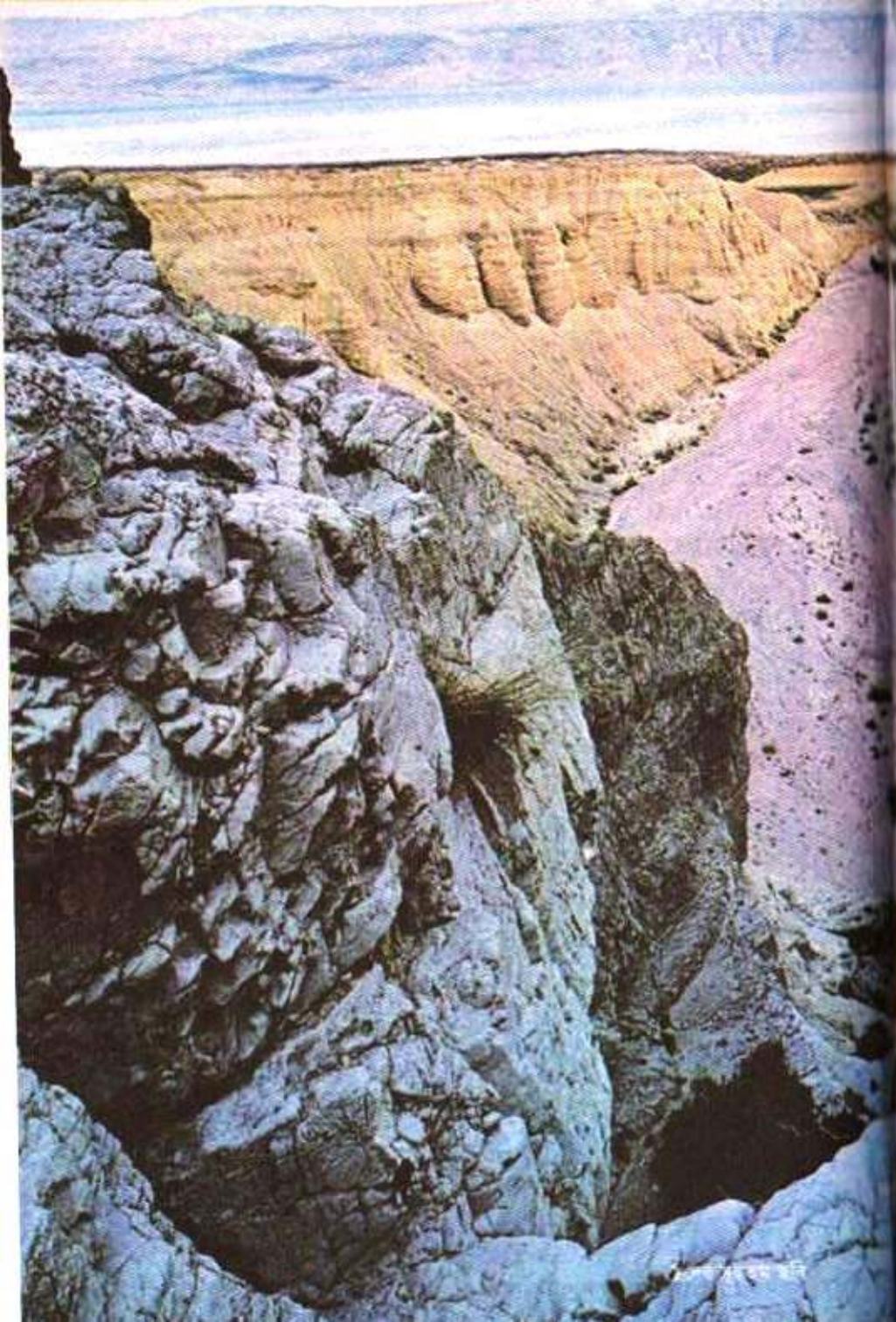
উপদ্বীপটির ডানে ভূমি আকস্মিকভাবেই ঢালু হয়ে ১২০০ ফুট নিচে নেমে গেছে। উপদ্বীপটির বামে পানি লক্ষণীয়ভাবে অগভীর রয়ে গেছে। গত কয়েক বছর ধরে পরিমাপ করে এর গভীরতা মাত্র ৫০ থেকে ৬০ ফুট এর মত স্থির করা হয়েছে। মরু বা মৃত সাগরের অসাধারণ অদ্ভুত এই অগভীর অংশটুকু হল সিদ্দিম উপত্যকা যা আল-লিসান উপদ্বীপ থেকে সর্বদক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[১৬]

ওয়েৱনার কেলার লিখেন যে, পরবর্তীকালে গঠিত হয়েছে বলে আবিষ্কৃত এই অগভীর অংশটুকু পূর্বোক্ত ভূমিকম্প ও ভূমিকম্পের ফলে যে বিশাল ভূমিধ্বসের সৃষ্টি হয় তারই ফলস্বরূপ গঠিত হয়েছে। এটাই হল সেই এলাকা সে স্থানে সডম ও গমররাহ অবস্থিত ছিল, তার মানে, এখানেই লূত সম্প্রদায় বসবাস করত।

এক সময় এই এলাকাটুকু হেঁটে পার হওয়া সম্ভব ছিল। অবশ্য, এখন, সিদ্দিম উপত্যকাটি ডেডসী বা মরুসাগরের নিচের অংশের সমতল ভাগ দিয়ে ঢাকা পড়েছে। সী বা মরুসাগরের নিচের অংশের সমতল ভাগ দিয়ে ঢাকা পড়েছে, সে স্থানে এক সময় সডম ও গমররাহ নগরী দাঁড়িয়েছিল।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দির শুরুর দিকে ঘটে যাওয়া ভয়ংকর বিপর্যয়ের দরুন ভূমির নিম্নাংশের পতন ঘটে, এরই ফলে উত্তর দিক থেকে আসা লবণাক্ত পানি প্রবাহিত হয় সাম্প্রতিককালে গঠিত গহবরটিতে আর গর্তটি লবণাক্ত পানিতে পূর্ণ হয়ে যায়।

লূত হ্রদের দৃশ্যাবলী, চিহ্নাবলী দৃষ্টিগ্রাহ্য ...। যখন কেউ একজন দাড়ের নৌকা নিয়ে হ্রদটি পার হয়ে সর্বদক্ষিণ অংশটুকুতে যায়, তখন যদি সূর্য ঠিক দিক থেকে কিরণ দেয়, তবে সে যা কিছু দেখতে পায় তা অত্যন্ত চমৎকার।

বেলাভূমি থেকে কিছুটা দূরে এবং পানি পৃষ্ঠের নিচে বনাঞ্চলের সীমারেখা পরিষ্কারভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, যে রেখাগুলোকে ডেডসী-এর পানিতে অদ্ভুতভাবে বেশি পরিমাণে থাকা লবণ এখনও সংরক্ষণ করে রেখেছে।

লূত হ্রদের আকাশ থেকে তোলা ছবি

ঝিকিমিকি সবুজ পানিতে যে গাছের গুঁড়ি ও কাণ্ডগুলো দেখা যায় সেগুলো অতি প্রাচীন। যে সিদ্দিম উপত্যকায় এক সময় এই বৃক্ষগুলো পর্ণরাজি ও শাখা-প্রশাখায় আচ্ছাদিত এবং ফুলে ফুলে প্রস্ফুটিত অবস্থায় ছিল, এই উপত্যকাটিই সেই সময় অঞ্চলটির অন্যতম সুন্দর এক এলাকা ছিল।

ভূতত্ত্ববিদদের গবেষণায় লূত সম্প্রদায়ের উপর আপতিত দুর্যোগের কারিগরি দিকটি উন্মোচিত হয়েছে। এগুলো থেকে এটাই প্রকাশিত হয়েছে যে, শেরি'আত নদীর তলভাগের ১৯০ কিলোমিটার এলাকা বরাবর পৃথিবীপৃষ্ঠে একটি লম্বা ফাটল রয়েছে যার ফলস্বরূপ। লূত সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্নকারী এই ভূমিকম্পটি ঘটেছিল। শেরি'আত লূত সম্প্রদায়কে নদী সর্বমোট ১৮০ মিটার জায়গার পতন ঘটায়। এই ব্যাপারটি এবং লূত হ্রদের সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪০০ মিটার নিম্নে হওয়া — এ দুটি উপাদান মিলে এখানে যে বিশাল এক ভৌগোলিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তারই বড় ধরনের সাক্ষ্য বহন করছে।

নগরীর ধ্বংসাবশেষের কিছু অংশ যা হ্রদে পতিত হয়েছিল তা হ্রদের তীরে পাওয়া গিয়েছে। এই ধ্বংসাবশেষগুলো প্রমাণ করছে যে, লূত সম্প্রদায়ের এক উন্নত জীবনযাপন পদ্ধতি ও ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল

বহু চিত্রকর লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবলীতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তারই একটি উদাহরণ উপরে দেয়া গেল

শেরি'য়াত নদী ও লূত হ্রদের অদ্ভুত কাঠামো ভূপৃষ্ঠের এই অঞ্চল থেকে অগ্রসরমান ফাটল বা চিড়-এর একটি ক্ষুদ্র অংশ গঠন করেছে মাত্র। এই ফাটলের অবস্থা ও দৈর্ঘ্য কেবলমাত্র সম্প্রতি উদঘাটিত হয়েছে।

স্তরভঙ্গটি (Fault) তাউরুস পর্বতের প্রান্ত থেকে শুরু হয়ে লূত হ্রদের দক্ষিণ উপকূল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে, এবং আরব্য মরুভূমির উপর দিয়ে আকাবা উপসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে লোহিত সাগর বরাবর অতিক্রান্ত হয়ে আফ্রিকায় গিয়ে শেষ হয়েছে। এরই দৈর্ঘ্য বরাবর শক্তিশালী আগ্নেয়গিরির সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়।

ইসরাইলের গ্যালিলী পর্বতমালায়, জর্ডানের উঁচু সমতলভূমিতে আকাবা উপসাগরে ও আশেপাশের অন্যান্য এলাকায় কাল পাথর ও লাভার অস্তিত্ব বিদ্যমান।

এসব ধ্বংসাবশেষ এবং ভৌগোলিক নিদর্শনাবলী এটাই প্রমাণ করছে যে লূত হ্রদে এক ভয়ংকর ভূতাত্ত্বিক বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছিল। ওয়েরনার কেলার লিখেছেন ঃ

> ঠিক এ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত শক্তিশালী ফাটলের তলাসহ সিদ্দিম উপত্যকা সডম ও গমররাহকে নিয়ে একদিন অতল গহবরে নিমজ্জিত হয়ে যায়। বিশাল এক ভূমিকম্পের মাধ্যমে এই ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়, যার সঙ্গে আরও যুক্ত হয়েছিল বিস্ফোরণ, বজ্রপাত, প্রাকৃতিক গ্যাসের নির্গমন এবং বিশাল সাধারণ অগ্নিকাণ্ডসমূহ। ভূমিধ্বস আগ্নেয়গিরির শক্তিকে মুক্ত করে যা ফাটলের পুরো দৈর্ঘ্য বরাবর অত্যন্ত গভীরে সুপ্তাবস্থায় বিদ্যমান ছিল। বাশানের কাছে জর্ডানের উপরকার উপত্যকায় লুপ্ত আগ্নেয়গিরির সুউচ্চ জ্বালামুখগুলো এখনও বিদ্যমান রয়েছে। চুনাপাথরের পৃষ্ঠে লাভার বিশাল বিস্তৃতি ও কালো পাথরের গভীর স্তরের তলানি পড়ে আছে।[১৭]

১৯৫৭ সনের ডিসেম্বরে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক এই মন্তব্যটি করে:

> সডম পর্বত, একটি অনুর্বর পতিত ভূমি, হঠাৎ করেই যেন ডেড-সী বা মরুসাগরের তলা থেকে উপরে উত্থিত হয়েছে। কেউ কখনও সডম ও গমররাহ নামক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া নগরীগুলোকে খুঁজে পায়নি কিন্তু বিদ্বানগণ বিশ্বাস করেন যে এগুলো উঁচু খাড়া পর্বতের সিদ্দিম উপত্যকায় একদা দাঁড়িয়েছিল। সম্ভবত এক ভূমিকম্পের পরপরই ডেড-সী-এর বন্যার পানি এদের গ্রাস করেছিল।[১৮]

পম্পে শহরেরও একই পরিণতি ঘটেছিল

পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি আমাদের অবহিত করছে যে আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন হয় না।

> "আর সেই কাফেরগণ অতি দৃঢ় শপথ করিয়াছিল যে, তাহাদের নিকট যদি কোন ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করেন, তবে তাহারা অন্যান্য প্রত্যেক সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর হেদায়েত গ্রহণকারী হইবে। অনন্তর তাহাদের নিকট যখন একজন পয়গম্বর আসিলেন, তখন তাহাদের বৈরীভাবই বৃদ্ধি পাইল; পৃথিবীতে তাহাদের অহংকারের কারণে এবং তাহাদের কূট ষড়যন্ত্রই (বৃদ্ধি পাইল), কূট ষড়যন্ত্রের কুফল (মূলত) সেই কূট ষড়যন্ত্রকারীদের উপরই পতিত হয়। তবে কি তাহারা সেই বিধানেরই প্রতীক্ষায় আছে, যাহা পূর্ববর্তী লোকদের সহিত চলিয়া আসিতেছে; অনন্তর আপনি আল্লাহর সেই বিধানের কখনও কোন পরিবর্তন পাইবেন না এবং আপনি আল্লাহর বিধানের কখনও ব্যতিক্রমও পাইবেন না।"
>
> — সূরা ফাতির ঃ ৪২-৪৩

হ্যাঁ, প্রকৃতই "আল্লাহর বিধানের কোন পরিবর্তন পাওয়া যাবে না।" যে কেউ তাঁর বিধানের বিপক্ষে দাঁড়াবে ও তাঁর বিরোধিতা করবে সে সেই একই আসমানী বিধানের শিকার হবে। রোমান সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের প্রতীক, পম্পে নগরও যৌন বিকৃতিতে নিমগ্ন ছিল একদা। আর এর পরিণতি ঘটেছিল ঠিক লূত সম্প্রদায়ের মত একইভাবে।

ভিসুভিয়াস অগ্নিগিরির উদগীরণের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যায় পম্পে। ভিসুভিয়াস অগ্নিগিরি, ইতালীর, প্রধানত ন্যাপলস নগরীর প্রতীক।

গত দুই সহস্র বছর যাবত নীরব ও শান্ত হয়ে থাকা এই ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির নামকরণ করা হয়েছে "সতর্কীকরণের পর্বত" বলে। কোন কারণ ছাড়া এমনিতেই ভিসুভিয়াসের এমন নাম দেয়া হয়নি। 'সডম' ও 'গমররাহ' নগরীদ্বয়ের উপরে যে মহাদুর্যোগ আপতিত হয়েছিল ঠিক সেই একই ধরনের দুর্যোগ 'পম্পে' নগরীর ধ্বংস ডেকে আনে।

পম্পে শহরের
খননকার্যে প্রাপ্ত
প্রস্তরীভূত লাশ
দেখা যাচ্ছে
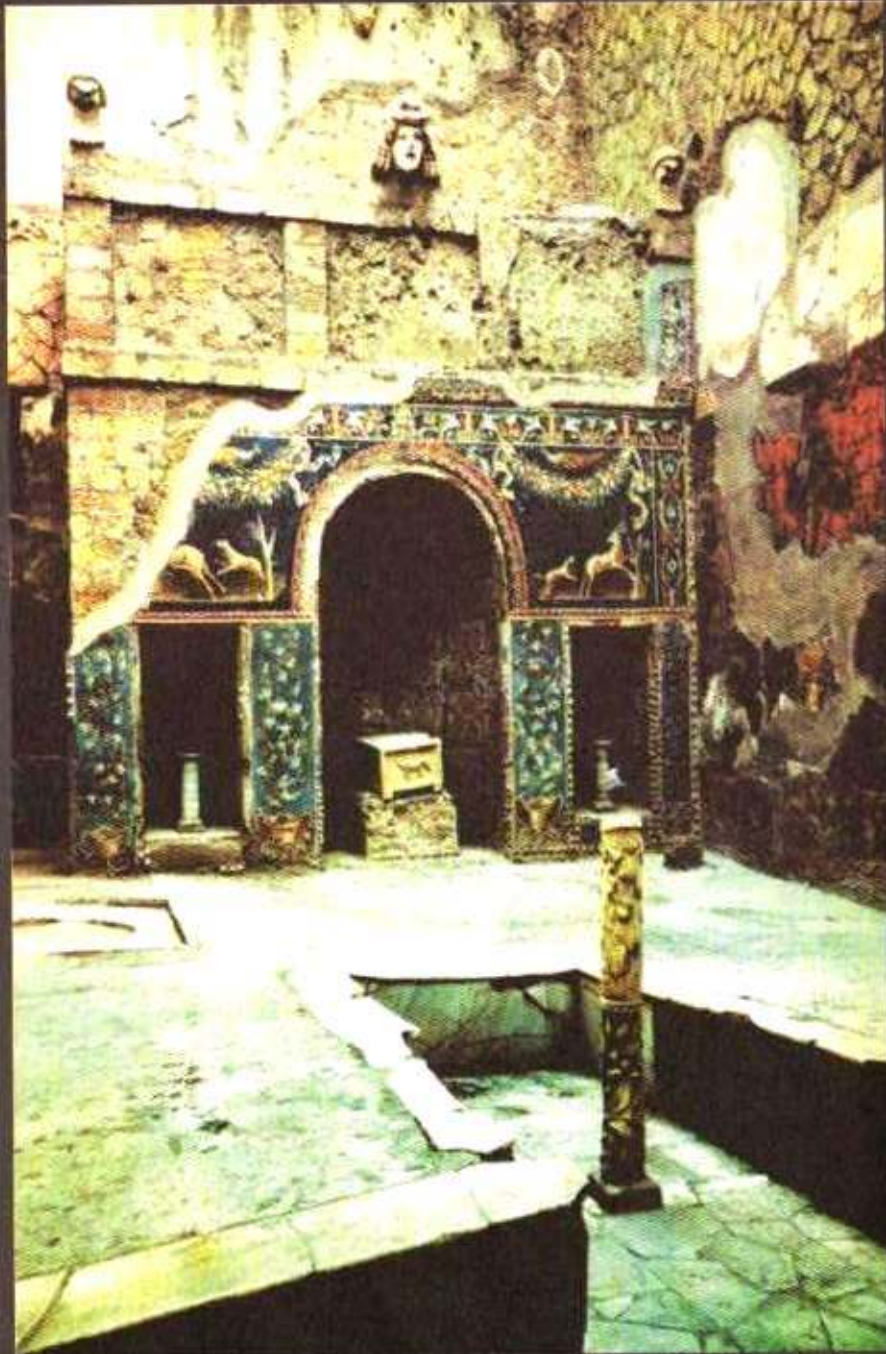
উপরের চিত্রটি দুর্যোগের পূর্বে পম্পে নগরের বিলাসিতা ও উন্নতির প্রতীক হয়ে আছে
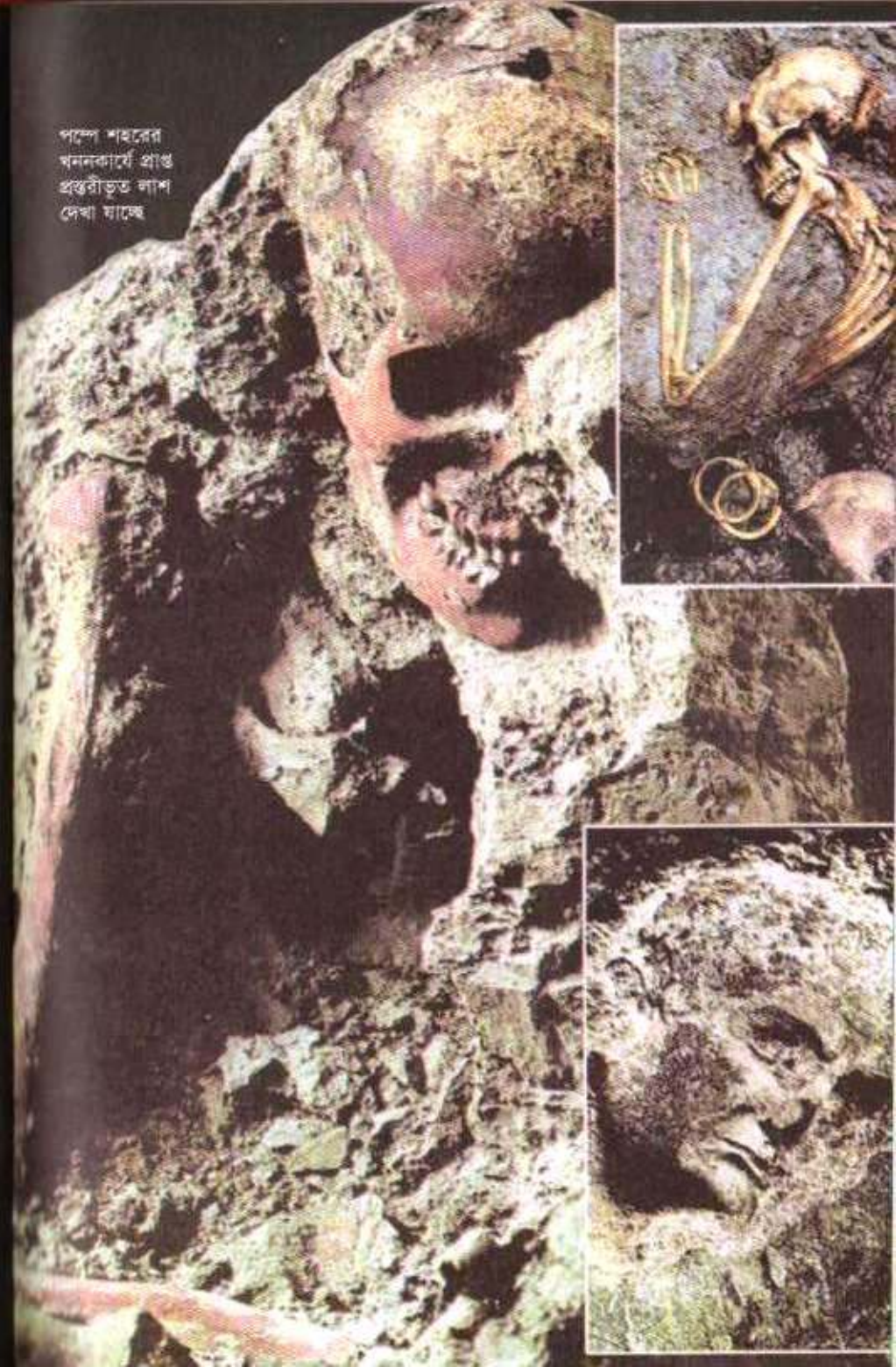
ভিসুভিয়াসের ডানে ন্যাপলস ও বামে হল পম্পে নগরীর অবস্থান। দুই সহস্র বছর পূর্বে যে আগ্নেয়গিরির উদগীরণের ঘটনা ঘটেছিল তারই ফলে নির্গত লাভা ও ছাই নগরীটির অধিবাসীদের পাকড়াও করেছিল। দুর্যোগটি এত আকস্মিকভাবেই নেমে আসে যে শহরটিতে নিত্যদিনের কার্যাবলীর ঠিক মাঝামাঝি সময়ে সবকিছুই আটকে গিয়েছিল এবং দুই হাজার বছর পূর্বে তারা ঠিক সেই মুহূর্তে যে যে অবস্থায় ছিল আজও তারা তেমনি সে সেভাবেই রয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটি এমন যে মনে হয় যেন সময় (অতিক্রান্ত না হয়ে) নিথর হয়ে গিয়েছিল।

এমন ধরনেরই একটি দুর্যোগের মাধ্যমে পৃথিবীর বুক থেকে পম্পে শহরের বিলুপ্তি কোন উদ্দেশ্য ছাড়া নিছকই সংঘটিত হয়নি। ঐতিহাসিক নথিপত্রসমূহ থেকে প্রমাণ মেলে যে, পম্পে নগরীটি সে সময় ক্ষতিকর আমোদ-প্রমোদ ও যৌনবিকৃতির একটি কেন্দ্র ছিল। নগরীটিতে পতিতাবৃত্তির পরিমাণ এমনি লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে যায় যে, বেশ্যালয়ের সংখ্যা পর্যন্ত জানা ছিল না। বেশ্যালয়ের দ্বারে দ্বারে পুরুষাঙ্গের প্রতিকৃতি ঝুলিয়ে রাখা হত। মিথরেইখ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা এই ঐতিহ্য অনুসারে যৌনাঙ্গ ও যৌনক্রিয়া লুকিয়ে রাখা উচিত নয়; বরং তা প্রকাশ্যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু ভিসুভিয়াসের লাভা পুরো নগরীটিকে মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দিয়েছে। ঘটনাটির সবচাইতে কৌতূহলের দিক হল এই যে, ভিসুভিয়াসের উদগীরণের এমন ভয়াবহতা ও প্রচণ্ড নির্মমতা সত্ত্বেও তা থেকে কেউ পালাতে পারেনি। এতে প্রায় এটাই মনে হয় যে, ঘটনাটি যেন তারা খেয়াল করতে পারেনি, বরং তারা যেন এতে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভোজনরত একটি পরিবার ঠিক সে মুহূর্তে সেভাবেই প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। বহু প্রস্তরীভূত মানবদেহ পাওয়া গেছে যৌনক্রিয়ারত অবস্থায়। সবচেয়ে কৌতূহলের ব্যাপার হল যে, সেখানে সমলিংগের যুগলসমূহ আর তরুণ ছেলেমেয়েদের যুগলও খেয়াল করা যায়। মাটি খুঁড়ে কিছু প্রস্তরীভূত মানবদেহ পাওয়া গেছে যাদের মুখমণ্ডল একেবারেই অবিকৃত অবস্থায় ছিল। এদের মুখমন্ডলে হতবিহবল হয়ে যাওয়ার ভাব বিদ্যমান রয়েছে।

এখানে দুর্যোগটির সেই অভাবনীয় দিকটি নিহিত রয়েছে। কিভাবে কিছুই না দেখে ও না শুনে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর ফাঁদে ধরা পড়ার জন্য অপেক্ষমান ছিল?

ঘটনার এই দিকটি এটাই প্রদর্শন করছে যে পম্পে শহরের অন্তর্ধান কোরআনে উল্লেখিত ধ্বংসাত্মক ঘটনাবলীরই অনুরূপ। কেননা এসব ঘটনাসমূহের বর্ণনা করতে গিয়ে কোরআনে যে বিষয়টি বিশেষভাবে নির্দেশ করে তা হল "আকস্মিক পূর্ণধ্বংস"। উদাহরণস্বরূপ, সূরা ইয়াসিনের নগরীর অধিবাসীদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তারা সবাই মুহূর্তের মধ্যে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করে। সূরাটির ২৯ আয়াতে এই পরিস্থিতিটি উক্ত হয়েছে নিম্নরূপে ঃ

> "এই শাস্তি ছিল একটি বিকট ধ্বনি, ফলে তাহারা সকলেই তৎক্ষণাৎ নিথর হইয়া পড়িয়া রহিল।"

সূরা ক্বামারের ৩১ আয়াতে সামূদ জাতির ধ্বংসযজ্ঞের বর্ণনা করতে গিয়ে পুনরায় "তাৎক্ষণিক পূর্ণধ্বংস" এই ব্যাপারটির উপর জোর দেয়া হয়েছে:

> "আমি তাহাদের উপর কেবল একটি গর্জনই আপতিত করিলাম, ফলে তাহারা এইরূপ হইয়া গেল যেমন, খোঁয়াড় প্রস্তুতকারীর চূর্ণবিচূর্ণ খড়-শলাকাস্বরূপ।"

পম্পে শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে উন্মোচিত শিলীভূত মানবদেহ

এখানে পম্পেই শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে উন্মোচিত আরও কিছু শিলীভূত মানবদেহ

পম্পে শহরে প্রাপ্ত শিলীভূত মানবদেহের আরও একটি নজির

উপরের আয়াতসমূহে বর্ণিত ঘটনাবলীর মত ঠিক একইভাবে অত্যন্ত অকস্মাৎ পম্পে শহরের অধিবাসীদের ইহলীলা সাঙ্গ হয়েছিল।

এতসব সত্ত্বেও, যেখানে একদা পম্পে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে বিষয়াদির তেমন বেশি কোন পরিবর্তন হয়নি। ন্যাপলসের জেলাগুলোতে বিরাজমান অসংযম ও ভোগলালসা যেন পম্পে জেলাসমূহের লোকজনের অসৎ চরিত্রের চাইতে কোন অংশেই কম নয়।

কাপরি দ্বীপ হল মূল এলাকা, যেখানে সমকামী ও নগ্নতাবাদিরা বসবাস করে। পর্যটনের বিজ্ঞাপনসমূহে কাপরি দ্বীপকে "সমকামীদের স্বর্গ" বলে উপস্থাপিত করা হয়। শুধুমাত্র কাপরি কিংবা ইতালীতেই নয়, বরং প্রায় গোটা বিশ্বেই একই ধরনের নৈতিক অবক্ষয় বিরাজ করছে, আর মানবগোষ্ঠী যেন অতীত সম্প্রদায়গুলোর ভয়ংকর অভিজ্ঞতাসমূহ থেকে শিক্ষা না নেয়ার কথাই দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করে যাচ্ছে।

অধ্যায় চার

আ'দ জাতি এবং "বালির আটলান্টিস" উবার

"আর যাহারা ছিল আ'দ, অনন্তর তাহাদিগকে এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়, যাহা আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর সাত রাত ও আট দিন অনবরত চাপাইয়া রাখিয়াছিলেন, অনন্তর আপনি (যদি তথায় থাকিতেন তবে) সেই সম্প্রদায়কে উহাতে এমনভাবে ভূপাতিত দেখিতেন, যেন তাহারা উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের কান্ড। অতঃপর তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কি আপনি অবশিষ্ট দেখিতেছেন?"

— সূরা হাক্কাহ ঃ ৬-৮

আর অপর আরেকটি ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়, যাদের উল্লেখ রয়েছে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সূরায়, তারা হল আ'দ সম্প্রদায়। কোরআনে নূহ (আঃ) সম্প্রদায়ের ঠিক পরপরই আ'দ জাতির উল্লেখ রয়েছে। আ'দ জাতির প্রতি প্রেরিত নবী, হুদ (আঃ) ও অন্যান্য নবীগণের ন্যায় ঠিক একইভাবে তাঁর সম্প্রদায়কে আহবান জানিয়েছিলেন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে, তাঁর সঙ্গে কোন শরীক সাব্যস্ত না করতে এবং তাঁকে (হুদ আঃ) সে সময়কার নবী হিসেবে মেনে নিতে। কিন্তু জনগণ হুদ (আঃ)-এর আহবানের উত্তরে বিদ্বেষপূর্ণ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল। তারা নবীকে হঠকারিতা, অসত্য এবং পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির পরিবর্তনের প্রয়াস চালানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করল।

হুদ (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের মাঝে যা ঘটছিল তার বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখিত রয়েছে সূরা হুদে ঃ

আর আমি আ'দ সম্প্রদায়ের প্রতি তাহাদের (স্ববংশীয় অথবা স্বদেশীয়) ভ্রাতা হুদ-কে (নবী বানাইয়া) পাঠাইলাম। তিনি (আপন বংশধরগণকে) বলিলেন, "হে আমার কওম! তোমরা (কেবল)

আল্লাহর এবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নাই, তোমরা কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী। হে আমার কওম! আমি তোমাদের নিকট (এই তবলীগের উপর) কোন বিনিময় চাহিতেছি না, আমার বিনিময়তো কেবল তাঁহারই (আল্লাহরই) জিম্মায় যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তবুও কি তোমরা উপলব্ধি কর না?

আর হে আমার কওম! তোমরা আপন পাপের ক্ষমা প্রার্থনা কর। আপন প্রভু সকাশে, তৎপর তাঁহার প্রতি নিবিষ্ট থাক, তিনি প্রচুর পরিমাণে বারিপাত করিবেন, এবং তোমাদেরকে আরও শক্তি প্রদানে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দিবেন (অতএব ঈমান আন) আর পাপে লিপ্ত থাকিয়া মুখ ফিরাইও না।"

তাহারা উত্তর দিল, "হে হূদ! আপনি তো আমাদের সম্মুখে কোন প্রমাণ পেশ করিলেন না; আর আমরাত (কেবল) আপনার কথার উপর আমাদের উপাস্যদেরকে বর্জনকারী নই, আর আমরা কোন প্রকারেই আপনাতে বিশ্বাসী নই। আমাদের কথা হইল — এই আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেহ আপনাকে দুর্বিপাকে পতিত করিয়া দিয়াছে (যাহা দ্বারা আপনি এই সব পাগলামী করিতেছেন)।"

হূদ বলিলেন, "আমি আল্লাহকে সাক্ষী করিতেছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক যে, আমি তোমাদের সেই সকল বস্তুতে সম্পূর্ণ অসন্তুষ্ট যেগুলিকে তোমরা শরীক সাব্যস্ত করিতেছ, আল্লাহকে ছাড়িয়া; অতএব তোমরা সকলে একত্রিত হইয়া আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশও দিও না। আমি আল্লাহর উপরই ভরসা করিয়া লইয়াছি, যিনি আমারও মালিক, তোমাদেরও মালিক, ভূপৃষ্ঠে যত বিচরণকারী রহিয়াছে তাহাদের সকলের জুটি তিনি ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। নিশ্চয় আমার প্রভু সরল পথের উপর বিদ্যমান।

অতঃপর তোমরা যদি ফিরিয়া থাক, তবে (আমার কি আসে যায়) আমি সেই সংবাদ লইয়া প্রেরিত হইয়াছি তাহা তোমাদেরকে পৌছাইয়া দিয়াছি। আর আমার প্রভু অন্য লোকদের তোমাদের স্থলে

ভূপৃষ্ঠে আবাদ করিয়া দিবেন এবং তোমরা তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পরিবে না; নিশ্চয় আমার প্রভু প্রত্যেক বস্তুর নেগাহবান।"

আর যখন আমার (আজাবের) আদেশ সমাগত হইল, হূদ-কে এবং তাঁহার সঙ্গী যাহারা ঈমানদার ছিলেন তাহাদেরকে আমার অনুগ্রহে বাঁচাইয়া লইলাম এবং তাঁহাদেরকে এক মহা কঠিন শাস্তি হইতে বাঁচাইয়া লইলাম।

আর উহারা এমনই ছিল আ'দ বংশধর, যাহারা আপন প্রভুর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করিয়াছিল, এবং তাহাদের রাসূলের কথা মানে নাই এবং তাহারা প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী লোকদের সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল;

ফলে এই পৃথিবীতেও তাহাদের সঙ্গে রহিল অভিশাপ এবং কেয়ামতের দিনও। খবরদার! আ'দ সম্প্রদায় আপন প্রভুর সহিত কুফরী করিয়াছে; শুনিয়া রাখ (উভয় জগতে) আ'দ সম্প্রদায় যাহারা হূদের কওম ছিল, তাহারা রহমত হইতে বহু দূরে পড়িয়া গেল।"

— সূরা হূদ ঃ ৫০-৬০

সূরা শু'আরা হল অন্য আরেক খানা সূরা, যেখানে আ'দ জাতির উল্লেখ রয়েছে। এই সূরায় আ'দ জাতির কিছু বৈশিষ্ট্যাবলীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সে অনুসারে আ'দ সম্প্রদায় ছিল এমন এক সম্প্রদায়,

"যারা প্রতিটি উঁচু স্থানে স্মৃতি নির্মাণ করেছিল" আর এর সদস্যরা "বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করিতেছিল তথায় চিরকাল থাকবে এই আশায়।"

তদুপরি তারা অনিষ্টকর কাজে লিপ্ত ছিল আর করে যাচ্ছিল নৃশংস নির্মম আচরণ। হূদ (আঃ) যখন তাঁর সম্প্রদায়কে সতর্ক করলেন, তখন তারা তাঁর কথাবার্তাকে "প্রাচীনকালের প্রথাগত কৌশল বা নীতি" বলে মন্তব্য করছিল। তারা খুবই নিশ্চিন্ত ছিল এ ভেবে যে "তাদের কোন কিছুই হবে না।"

আ'দ সম্প্রদায় রাসূলদের প্রত্যাখ্যান করিয়াছে; যখন তাহাদিগকে তাহাদের ভাই হূদ বলিলেন, "তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় কর না?

আমি তোমাদের প্রতি এক বিশ্বস্ত রাসূল, অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য অবলম্বন কর। আর আমি তোমাদের

নিকট কোন প্রতিদান চাহিতেছি না, আমার প্রতিদানতো বিশ্ব প্রতিপালকের জিম্মায় রহিয়াছে।

তোমরা কি প্রত্যেক উচ্চস্থানে একটি স্মৃতি নির্মাণ করিতেছ? যাহা কেবল অনর্থক বানাইতেছ।

আর তোমরা বড় বড় প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করিতেছ, যেন তোমরা চিরকাল থাকিবে।

আর তোমরা যখন কাহারও উপর আক্রমণ চালাও তখন স্বৈরাচারী হইয়া আক্রমণ চালাও।

অতএব তোমরা আল্লাহতে ভয় কর ও আমার আনুগত্য অবলম্বন কর।

এবং তাঁহাকে ভয় কর, যিনি তোমাদিগকে ঐ সমস্ত বস্তু দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, যাহা তোমরা অবগত আছ — তিনি তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা এবং সন্তান-সন্ততি দ্বারা, আর উদ্যান ও প্রস্রবণ দ্বারা।

আমি তোমাদের উপর এক কঠিন দিবসের আজাবের আশংকা করিতেছি।"

তাহারা বলিল, "আমাদের নিকটত উভয়ই সমান, চাই তুমি উপদেশ প্রদান কর অথবা তুমি উপদেষ্টা নাও হও; ইহাতো কেবল প্রাচীন লোকদের একটি সাধারণ রীতিনীতি, আর আমাদের কখনও শাস্তি হইবে না।"

"বস্তুত তাহারা হূদ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল; তখন আমি তাহাদিগকে (প্রবল বায়ুপ্রবাহের দ্বারা) নিপাত করিয়া দিলাম। নিশ্চয়ই ইহাতেও উপদেশ রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বহু লোকই ঈমান আনে নাই।

আর নিঃসন্দেহে আপনার প্রভু মহাপরাক্রমশীল, পরম দয়ালু।"

— সূরা শু'আরা ঃ ১২৩-১৪০

একদা যে সম্প্রদায়ের লোকেরা হূদ (আঃ)-এর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করত আর আল্লাহ তায়ালার বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিল, তারা এবার

বাস্তবিকই ধ্বংসমুখে পতিত হল। এক ভয়ংকর বালুঝড় (ধূলিঝড়) এমনভাবে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল যে, দেখে মনে হবে কোন কালেই পৃথিবীতে যেন তারা বসবাস করেনি।

ইরাম নগরীতে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যসমূহ

১৯৯০ সনের গোড়ার দিকে পৃথিবী খ্যাত সংবাদপত্রসমূহ ফলাও করে এ খবর প্রচার করে যে, "হারিয়ে যাওয়া লোক কাহিনী খ্যাত আরব নগরীটি খুঁজে পাওয়া গেছে", "লোক কাহিনীর আরব্য নগরীর সন্ধান মিলেছে", বালির আটলান্টিস, "উবার" ইত্যাদি নানাভাবে। আসলে যে ব্যাপারটি এই প্রত্নতাত্ত্বিক সন্ধানকে কৌতূহলজনক করে তুলেছিল তাহল যে, আগে থেকেই পবিত্র কোরআনেও এই নগরীটির উল্লেখ রয়েছে। বহু লোক যারা পূর্বে ভাবত যে, পবিত্র কোরআনে বর্ণিত এই আ'দ জাতির কথা একটি উপাখ্যান মাত্র কিংবা মনে করত যে, আ'দ জাতির অবস্থানের সন্ধান কোনদিনই মিলবে না; এই আবিষ্কারের ফলে সে সকল লোকেরা তাদের মহাবিস্ময়কে আর লুকিয়ে রাখতে পারেনি। যে নগরী খানা এক সময় বেদুইনদের মুখে মুখে গল্প হিসেবে ঘুরে বেড়াত সেটিরই আবিষ্কার এক বড় ধরনের কৌতূহল আর উৎসাহ জাগিয়ে তুলল সবার মাঝে।

যিনি পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত এই নগরীটির সন্ধান পান, তিনি একজন সৌখিন প্রত্নতত্ত্ববিদ, নিকোলাস ক্ল্যাপ।[১৯]

একজন আরব অনুরাগী আর বিজয়ী ডকুমেন্টারী ছবির নির্মাতা হওয়ার ফলে ক্ল্যাপ যখন আরব্য ইতিহাসের উপর গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন তখন তার হাতে আসে একটি অত্যন্ত চমৎকার বই। ইংরেজ গবেষক ব্যারটাম থমাস কর্তৃক ১৯৩২ সনে লিখিত এই বইখানার নাম ছিল অ্যারাবিয়া ফেলিক্স (Arabia Felix).

আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ অংশের রোমান নাম ছিল অ্যারাবিয়া ফেলিক্স (Arabia Felix) বর্তমানে সে অংশটিতে ইয়েমেন আর ওমানের অনেকটা অংশ পড়েছে।
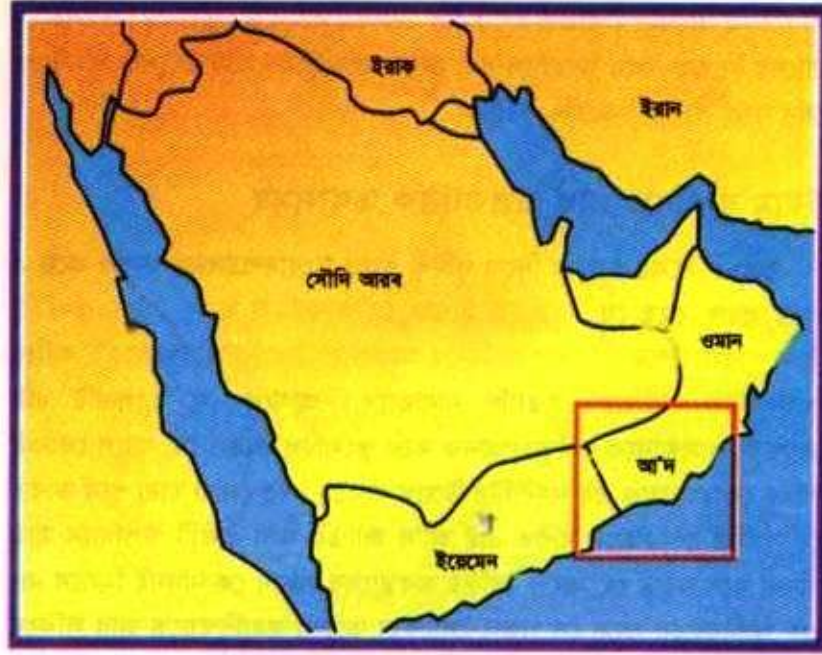
ওমানের উপকূলের কাছাকাছি কোথাও প্রাপ্ত উবার নগরী, যেখানে আ'দ সম্প্রদায় বসবাস করত

গ্রীকগণ এই অঞ্চলটিকে বলতেন "Eudaimon Arabia" আর আরব পণ্ডিতগণ ডাকতেন এটিকে "আল-ইয়ামান আস-সায়িদা" বলে।[২০] এসব গুলোর নামেরই অর্থ হল, "সৌভাগ্যপূর্ণ আরব" কেননা অতীতে এই অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণ তাদের সময়কার সবচাইতে সৌভাগ্যবান জাতি হিসেবে পরিচিত ছিল। তা, এমন নামকরণের পিছনে কি কারণই বা ছিল?

তাদের এই সৌভাগ্য কিছুটা ছিল তাদের কৌশলগত অবস্থানের কারণে যারা কিনা ভারত এবং আরব উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চলের মধ্যে মসলার ব্যবসায় দালাল হিসেবে কাজ করত। তাছাড়া, সেই অঞ্চলের অধিবাসীগণ অতি বিরল এক গাছ হতে সুগন্ধযুক্ত রজন, 'কুন্দু' উৎপন্ন ও বন্টন করত। প্রাচীন সম্প্রদায়গুলোর অত্যন্ত প্রিয় এই গাছ বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ধূপ হিসেবে ব্যবহৃত হত। সেই সময়কালে গাছখানা ন্যূনতম পক্ষে স্বর্ণের ন্যায় মূল্যবান বলে বিবেচিত হত।

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী অত্যন্ত উন্নত এক সভ্যতার সৃষ্টিকর্ম ও ভাস্কর্যসমূহ উবার নগরীতে দাঁড়িয়েছিল। আজ, কেবল উপরের এই ধ্বংসাবশেষসমূহ অবশিষ্ট রয়েছে

উবারে চালানো খননকার্য

ইংরেজ গবেষক থমাস এই "সৌভাগ্যবান" গোত্রগুলো সম্বন্ধে সবিস্তারে বর্ণনা করেন। আর দাবি করেন যে, তিনি এই গোত্রগুলোরই কোন একটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন এক নগরীর চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন।[২১] এই নগরীটি বেদুইনদের কাছে "উবার" নামে পরিচিত। এই অঞ্চলটিতে থমাসের কোন এক সফরকালে মরুভূমির অধিবাসী বেদুইনরা তাকে কতকগুলো বেশ জীর্ণ দুর্গম পথ দেখিয়ে বলে যে এগুলো প্রাচীন নগরী উবারের দিকে চলে গেছে। থমাস এই বিষয়টিতে গভীর উৎসাহ প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর গবেষণা শেষ করতে সক্ষম হওয়ার আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইংরেজ গবেষক থমাসের লেখনীগুলো পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে ক্ল্যাপ বইটিতে বর্ণিত হারিয়ে যাওয়া নগরীটির অস্তিত্ব রয়েছে বলে বিশ্বাস করেন। তাই সময় নষ্ট না করে তিনি তার গবেষণা শুরু করে দেন।

উবার নগরীর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে ক্ল্যাপ দুই ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যান। প্রথমত, বেদুইনরা যে দুর্গম পথগুলোর অস্তিত্ব রয়েছে বলেছিল,

সেগুলোর চিহ্ন তিনি খুঁজে পান। তিনি NASA-কে ঐ এলাকার উপগ্রহ ছবি নেয়ার আবেদন জানান। দীর্ঘ সংগ্রামের পর তিনি কর্তৃপক্ষকে অঞ্চলটির ছবি নেয়ার ব্যাপারে রাজী করাতে সফলকাম হন।[২২]

ক্ল্যাপ ক্যালিফোর্নিয়ায় হাটিংকটন লাইব্রেরীতে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি এবং মানচিত্রসমূহের উপর অধ্যয়ন আর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তার উদ্দেশ্য — অঞ্চলটির একটি মানচিত্র খুঁজে বের করা। স্বল্প অনুসন্ধানের পর তিনি একটি মানচিত্র খুঁজে বের করেন। ২০০ সনে গ্রীক-মিসরীয় ভূতত্ত্ববিদ পলেমীর (Polemy) আঁকা একটি মানচিত্র খুঁজে পান তিনি। মানচিত্রটিতে ঐ অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন নগরীর অবস্থান এবং সেই নগরী পর্যন্ত চলে গেছে এমন কিছু রাস্তা প্রদর্শন করা হয়েছিল।

ইতিমধ্যে তিনি সংবাদ পেলেন যে NASA কর্তৃক ছবিগুলো নেয়া হয়েছে। ছবিগুলোতে কিছু কাফেলার চিহ্নরেখা দর্শনযোগ্য হয় যেগুলো কিনা খালি চোখে দেখা অত্যন্ত দুরূহ। কেবল উপরে আকাশ থেকেই পুরোপুরি দেখা যেতে পারে।

ক্ল্যাপ তার কাছে যে ম্যাপখানা ছিল তার সঙ্গে ছবিগুলোকে মিলিয়ে দেখেন যে, তিনি যা অনুসন্ধান করছিলেন সে ব্যাপারে অবশেষে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পেরেছেন ঃ প্রাচীন মানচিত্রের পথচিহ্নগুলো স্যাটেলাইট থেকে নেয়া ছবিগুলোর পথচিহ্নের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এবং এটা বুঝা গেছে যে এই পথচিহ্নগুলোর সর্বশেষ গন্তব্যস্থল ছিল একটি বিস্তৃত জায়গা, যা-নাকি এক সময় একটি নগরী হিসেবে বিদ্যমান ছিল।

বেদুইনদের মুখে মুখে বর্ণিত কাহিনীর বিষয়বস্তু হিসেবে ছিল যে রূপকথার নগরী খানি, তা অবশেষে উদঘাটিত হল।

কিছুদিন পর খননকার্য শুরু হল এবং বালির নিচে চাপা পড়া সেই পুরনো নগরীর ধ্বংসাবশেষসমূহ উন্মোচিত হতে শুরু করল।

আর এমনিভাবেই হারানো সেই নগরীটির বর্ণনা দেয়া হল, "বালির আটলান্টিস, উবার" হিসেবে।

তো এমন কি ছিল যা কিনা প্রমাণ করে যে এটাই সেই নগরী — যেখানে পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত সেই আ'দ জাতি বসবাস করত?
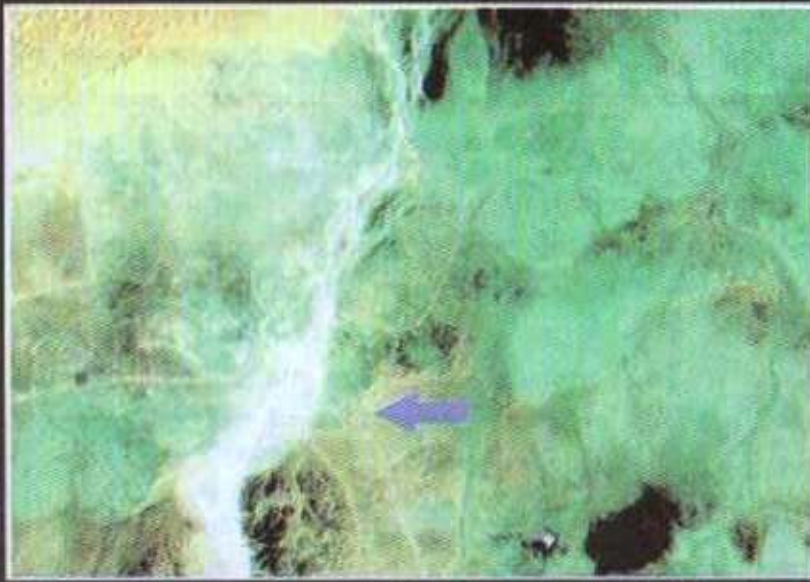
স্পেস শাটল থেকে নেয়া ফটোগ্রাফগুলো থেকে আদ জাতির নগরীর অবস্থান খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। ফটোগ্রাফের যেখানে কাফেলার পথচিহ্নগুলো মিলিত হয়েছে সেখানে দাগাঙ্কিত করা হয়েছে আর এটা উবারের দিক নির্দেশ করছে
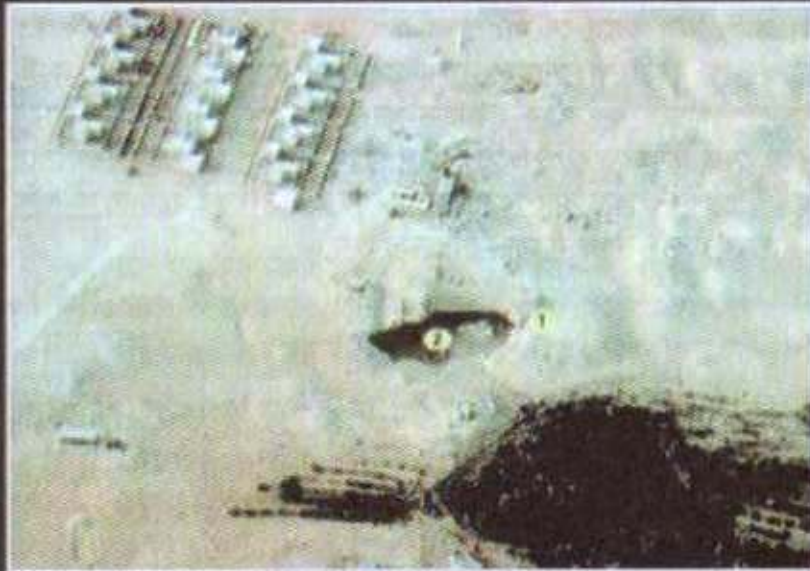
খননকার্য শুরুর আগে শুধুমাত্র স্পেস থেকেই উবার নগরী দেখা সম্ভব হতো কিন্তু খননকার্যের মাধ্যমে বালির ১২ মিটার গভীরে একটি নগরী উন্মোচিত হলো

ঠিক যে মুহূর্ত থেকে মাটি খোঁড়ার ফলে ধ্বংসাবশেষসমূহ খুঁজে পাওয়া শুরু হল, তখন থেকেই এটা বোঝা যাচ্ছিল যে এই নগরীটিই কোরআনে বর্ণিত আ'দ জাতির নগরী এবং ইরামের স্তম্ভসমূহের নগরী। কেননা মাটি খুঁড়ে বের করে আনা বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে ছিল সেই টাওয়ার বা সুউচ্চ বিল্ডিংসমূহ যা কিনা বিশেষভাবে পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত আছে। খননকার্য পরিচালনায় যে গবেষক দলটি ছিল তারই একজন সদস্য, ডঃ যারিনস বলেন যে, যেহেতু টাওয়ারগুলোকে উবারের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য বলে দাবি করে আসা হচ্ছিল, আর ইরামকে যেহেতু টাওয়ার ও স্তম্ভের জায়গা হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে– এটাই হল তখন পর্যন্ত সবচাইতে জোরাল প্রমাণ যে, তাদের মাটি খুঁড়ে বের করে আনা এই জায়গাটিই হল কোরআনে উল্লেখিত আ'দ জাতির নগরী, ইরাম।

পবিত্র কোরআনে ইরাম নগরীর উল্লেখ রয়েছে নিম্নরূপ ঃ

> **"আপনি কি অবগত নহেন যে, আপনার প্রভু কওমে আ'দ অর্থাৎ এরম সম্প্রদায়ের সঙ্গে কি কাণ্ড করিয়াছেন?**
>
> **যাহাদের দেহ গঠন স্তম্ভের ন্যায় (সুদীর্ঘ) ছিল, (শক্তির দিক দিয়া গোটা বিশ্বের) নগরসমূহে যাহাদের সমতুল্য অন্য কোন লোক সৃষ্টি করা হয় নাই।"**
>
> **— সূরা ফাজর ঃ ৬-৮**

আ'দ সম্প্রদায়

এই পর্যন্ত আমরা যা দেখেছি তাতে বোঝা যায় উবার নগরীটিই সম্ভবত পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত সেই ইরাম নগরী হতে পারে।

কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী, নগরীটির অধিবাসীগণ হূদ (আঃ)-এর কথায় কর্ণপাত করেনি, যিনি কি-না তাদের কাছে আসমানী বার্তা নিয়ে এসেছিলেন এবং সতর্ক করেছিলেন। একারণে তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

ইরাম নগরীর প্রতিষ্ঠাতা আ'দ জাতির পরিচিতি নিয়েও অনেকটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ঐতিহাসিক রেকর্ডসমূহে উল্লেখ নেই এমন সম্প্রদায়ের কথা, যারা এত প্রগ্রসর সংস্কৃতি কিংবা সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা ছিল। এমন এক সম্প্রদায়ের নাম ঐতিহাসিক রেকর্ডসমূহে খুঁজে পাওয়া যায় না — এটা ভাবতেই বেশ অদ্ভুত মনে হয়।

অপরদিকে, এতেও আশ্চর্য হওয়া উচিত নয় যে পুরনো সভ্যতাসমূহের রেকর্ড কিংবা ঐতিহাসিক দলিলপত্রগুলোয় এদের উপস্থিতি নেই এর কারণ হল — সব দল দক্ষিণ আরবের এমন একটি অঞ্চলে বসবাস করত যা-কিনা মেসোপটেমিয়া অঞ্চল কিংবা মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের অধিবাসী সম্প্রদায়গুলো থেকে ছিল অনেক দূরে এবং যাদের সঙ্গে তাদের কেবল অত্যন্ত সীমিত এক সম্পর্ক ছিল। প্রায় অজানা এক রাষ্ট্রের জন্য ঐতিহাসিক রেকর্ডসমূহে স্থান না পাওয়ার ব্যাপারটি ছিল খুবই সাধারণ একটি ঘটনা। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের লোকজনের মাঝে আ'দ সম্প্রদায়ের কাহিনী শোনাও আবার সম্ভবপর ছিল।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কারণে লিখিত রেকর্ডগুলোয় আ'দ জাতির উল্লেখ নেই, তাহল যে, সে সময়ে ঐ অঞ্চলে লিখে যোগাযোগের ব্যবস্থা সচরাচর ছিল না।

তাই এটাই ভাবা সম্ভবপর যে, আ'দ জাতি একটি সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করেছিল ঠিকই কিন্তু তাদের উল্লেখ পাওয়া যায় না ঐসব অন্যান্য সভ্যতাসমূহের ঐতিহাসিক রেকর্ডগুলোতে, যেখানে সেই সভ্যতাগুলো নিজেদের দলিলপত্রসমূহের রেকর্ড রেখে যাচ্ছিল। যদি এই সংস্কৃতি আরও কিছু বেশি সময় টিকে থাকতে পারত, তাহলে হয়ত আমাদের কালে এসব লোকজন সম্বন্ধে আরও বেশি কিছু জানা যেত।

আ'দ জাতির কোন লিখিত রেকর্ড নেই, কিন্তু তাদের "বংশধরদের" সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী জেনে সেই তথ্যের আলোকে আ'দ সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া সম্ভব।

আ'দ সম্প্রদায়ের উত্তরসূরী ঃ হদ্রামাইটস

আ'দ জাতি কিংবা তাদের উত্তরসূরী সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সম্ভাব্য সেই সভ্যতার নিদর্শনাবলীর সন্ধান করতে গিয়ে সর্বপ্রথম যে স্থানে দৃষ্টিপাত করতে হয় তাহল দক্ষিণ ইয়েমেন যেখানে **"বালির আটলান্টিস, উবার"**-এর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে আর যাকে কি-না **"সৌভাগ্যবান আরব"** নামে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। আমাদের কালের পূর্বে দক্ষিণ ইয়েমেনের চারটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল, গ্রীকগণ যাদের নাম দিয়েছিল, **"সৌভাগ্যবান আরব"**। এই

সম্প্রদায়গুলো হল যথাক্রমে ঃ **হদ্রামাইটস, সাবাইয়ান, মিনাইয়ান, আর ক্বাতাবাইয়ান সম্প্রদায়** — এই চারটি সম্প্রদায় পরস্পর কাছাকাছি অবস্থিত ভূখণ্ডে কিছু কাল রাজত্ব করেছিল।

সমসাময়িক বহু বিজ্ঞানী বলেন যে, আ'দ জাতি পরিবর্তনের ধারায় প্রবেশ করে এবং পরে ইতিহাসের মঞ্চে পুনরায় আবির্ভূত হয়। ওহিও ইউনিভার্সিটির একজন গবেষক মিকাইল এইচ. রহমান বিশ্বাস করেন যে, দক্ষিণ ইয়েমেনে বসবাস করছিল যে চারটি সম্প্রদায়, তাদেরই একটি সম্প্রদায় হদ্রামাইটসদের পূর্বপুরুষ ছিল আ'দ জাতি। **"সৌভাগ্যবান আরব"** নামে কথিত সম্প্রদায়গুলোর মাঝে সবচাইতে কম জানা যায় যে জাতি সম্পর্কে সেটি হল, প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ সনে আবির্ভূত, হদ্রামাইটস সম্প্রদায়। দীর্ঘ সময় ধরে এই সম্প্রদায় দক্ষিণ ইয়েমেনের রাজত্ব করে ও এক দীর্ঘ সময়ের অবক্ষয় শেষে ২৪০ সনে তা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

তারা যে আ'দ জাতির বংশধর হতে পারে তা তাদের হদ্রামি নামটি থেকেই আন্দাজ করা যায়। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দির গ্রীক লেখক প্লিনী এই গোত্রকে অদ্রামিতাই নামে উল্লেখ করেন — যা এই হদ্রামিকে বুঝায়।[২৩] গ্রীক নামের সমাপ্তি হয় বিশেষ্য প্রত্যয়যোগে, তাই বিশেষ্যটি **"অদ্রাম"** হওয়াতে তাৎক্ষণিকভাবে যা মনে হয় তাহল যে এই নামটি পবিত্র কোরআনে উক্ত **"আদ-ই-ইরাম"** নামেরই সম্ভাব্য বিকৃত রূপ।

গ্রীক ভূ-বিজ্ঞানী টলেমী (১৫০-১০০ সন) প্রমাণ করেছেন যে, আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ ভাগ হল সেই অঞ্চল যেথায় **"অদ্রামিতাই"** নামে কথিত সেই সম্প্রদায় বসবাস করত। অধুনা পর্যন্ত এই অঞ্চলটি **"হদ্রামাউত"** নামে পরিচিত হয়ে আসছে। হদ্রামি রাজ্যের রাজধানী নগরী, **"শাবওয়াহ"** হদ্রামাউত (Hadramaut) উপত্যকার পশ্চিম ভাগে অবস্থিত ছিল। বহু প্রাচীন লোককাহিনী অনুসারে, আ'দ জাতির প্রতি প্রেরিত পয়গম্বর হূদ (আঃ)-এর কবরখানি এই হদ্রামাউত নগরে বিদ্যমান।

অন্য আরেকটি বিষয় যা কিনা **"হদ্রামাইটস সম্প্রদায় যে আ'দ জাতিরই বংশধর"** — এ ভাবনাকে নিশ্চিত করে, তাহল হদ্রামাইটসদের অগাধ সম্পদ। গ্রীকগণ হদ্রামাইটসদের সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে যে **"বিশ্বের অন্যতম সম্পদশালী জাতি . . . . . ."**। ঐতিহাসিক রেকর্ডপত্র থেকে জানা যায় যে,

হদ্রামাইটসগণ তাদের যুগের অন্যতম মূল্যবান উদ্ভিদ কুন্দুর কৃষিকার্যে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল। তারা এই উদ্ভিদটি ব্যবহারের নব নব ক্ষেত্র খুঁজে বের করে এবং এর ব্যবহার বিস্তৃত করে। এই উদ্ভিদের উৎপাদন আমাদের কালের চেয়ে হদ্রামাইটসদের কালে অনেক অনেক বেশি ছিল।

হদ্রামাইটসদের রাজধানী নগরী হিসেবে পরিচিত হয়ে আসা শাবওয়াহ নগরীতে খননকার্য চালিয়ে বহু চমৎকার জিনিস পাওয়া গিয়েছে।

খননকার্য শুরু হয় ১৯৭৫ সনে। তখন গভীর বালিয়াড়ির কারণে প্রত্নতত্ত্ববিদদের পক্ষে নগরীর ধ্বংসাবশেষ পর্যন্ত পৌঁছানো অত্যন্ত কঠিন ছিল। খননকার্যের শেষ ভাগে যে তথ্য বা নিদর্শনাবলী পাওয়া যায় তা অত্যন্ত বিস্ময়কর। কেননা আবিষ্কৃত প্রাচীন এই নগরীটি তখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত নগরীগুলোর মাঝে বিস্ময়করভাবে চমৎকার ছিল। দেয়াল ঘেরা যে শহরটি উন্মোচিত হয়, তা ইয়েমেনের অন্যান্য শহর অপেক্ষা বড় ছিল এবং এর প্রাসাদগুলো সত্যিকার অর্থেই অত্যন্ত সুন্দর নির্মাণকার্য হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল।

নিঃসন্দেহে এটা ধারণা করা অত্যন্ত যৌক্তিক ছিল যে হদ্রামাইটস জাতি তাদের পূর্বপুরুষ আ'দ জাতির কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে নির্মাণ কৌশল বিষয়ক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল।

হূদ (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে গিয়ে বলেন ঃ

> "তোমরা কি প্রত্যেক উচ্চস্থানে একটি স্মৃতি নির্মাণ করিতেছ ? যাহা কেবল অনর্থক বানাইতেছ। আর তোমরা বড় বড় প্রাসাদসমূহ বানাইতেছ যেন তোমরা চিরকাল থাকিবে।"

শাবওয়াহ থেকে প্রাপ্ত ইমারতগুলোর অপর আরেকটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য হল এদের সুনির্মিত "স্তম্ভ"। শাবওয়াহ নগরে ইমরাতের স্তম্ভসমূহ ছিল গোলাকার ও সেগুলো ছিল বৃত্তাকার ছাদের আকারে বিন্যস্ত যা দেখে এগুলোকে বেশ অনন্যসাধারণ বলেই মনে হত। ঠিক সে সময় পর্যন্ত ইয়েমেনের অন্যান্য সব জায়গায় যে স্তম্ভগুলো পাওয়া যায় তা ছিল চতুর্ভূজাকৃতির এক শিলা স্তম্ভ। শাবওয়াহ নগরীর জনগণ অবশ্যই তাদের পূর্বপুরুষদের স্থাপত্যশৈলী উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিল। নবম শতাব্দীতে ফোটিয়াস নামক একজন গ্রীক বাইজেনটাইন গীর্জা প্রধান দক্ষিণ আরববাসী ও তাদের বাণিজ্যিক কার্যকলাপের উপর বিশাল গবেষণা কার্য চালান। কারণ

আমাদের যুগে বিদ্যমান নেই এমন কতকগুলো পুরনো গ্রীক পাণ্ডুলিপি আর বিশেষভাবে আগাথারাসাইডস-এর কিছু বই Concerning the Erythraen (Red) Sea, ইত্যাদি পড়ার সুযোগ ও সামর্থ্য তার হয়েছিল। ফোটিয়াস তার একটি রচনায় বলেছেন, "উক্ত আছে যে, তারা (দক্ষিণ আরবগণ) স্বর্ণ মোড়ানো কিংবা রূপার তৈরি বহু সংখ্যক স্তম্ভ নির্মাণ করেছিল, এই স্তম্ভগুলোর মধ্যবর্তী জায়গাসমূহ দেখতে অনন্যসাধারণ।"[২৪]

যদিও ফোটিয়াসের উপরের উক্তিটি সরাসরিভাবে হদ্রামাইটসদের উল্লেখ করে বলেনি, তবু এটা অঞ্চলটির অধিবাসীদের প্রাচুর্য এবং অসাধারণ ও দক্ষ নির্মাণ ক্ষমতা সম্পর্কে একটি ধারণা দিয়ে থাকে।

গ্রীক ক্লাসিক্যাল লেখক প্লিনী ও স্ট্রাবো এ নগরীগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, "সুন্দর মন্দির ও প্রাসাদে সুসজ্জিত নগরী . . . .।"

যখন আমরা এই নগরীর মালিকদের আ'দ জাতির বংশধর বলে ভাবি, তখনই এটা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে কেন পবিত্র কোরআন আ'দ জাতির আবাসভূমিকে "সুউচ্চ স্তম্ভের ইরাম নগরী" হিসেবে সুরা ফজরে উল্লেখ করেছে।

আ'দ জাতির ঝর্ণা ও বাগবাগিচাসমূহ

আজকাল কেউ দক্ষিণ আরব ভ্রমণে গিয়ে যে প্রাকৃতিক দৃশ্যখানা সবচাইতে বেশি অবলোকন করে থাকেন তাহল বিশাল বিস্তৃত মরুপ্রান্তর।

নগরীসমূহ ও পরবর্তী সময়ে বনায়নকৃত অঞ্চলসমূহ ছাড়া বাদ বাকী আর যে বেশির ভাগ এলাকা রয়েছে সেগুলোর সবই বালি আর বালিতে ঢাকা। শত শত কিংবা হাজার হাজার বছর যাবত এই মরুভূমিগুলো বিদ্যমান রয়েছে।

কিন্তু পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতসমূহের একটিতে আ'দ জাতির বর্ণনায় একটি চমৎকার তথ্য প্রদান করা হয়েছে। হূদ (আঃ) নিজের সম্প্রদায়কে হুঁশিয়ার করতে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহ যে কানন ও ঝর্ণাসমূহ দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন, সেসব দানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন;

"অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য অবলম্বন কর এবং তাঁহাকে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে ঐসব বস্তু দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, যাহা তোমরা অবগত আছ। তিনি তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা এবং সন্তান-সন্ততি দ্বারা এবং উদ্যান ও প্রস্রবণ দ্বারা। আমি তোমাদের উপর এক কঠিন দিবসের আজাবের আশংকা করিতেছি।"

— সূরা শু'আরা ঃ ১৩১-১৩৫

কিন্তু পূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, উবার নগরী, যাকে ইরাম নগরী বলে সনাক্ত করা হয়েছে এবং অন্যান্য যেসব অঞ্চল আ'দ জাতির সম্ভাব্য নিবাস হয়ে থাকবে এগুলোর সবই আজ মরুভূমিতে ছেয়ে গেছে। সুতরাং কেনই বা হুদ (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে হুঁশিয়ার করতে গিয়ে এমন অভিব্যক্তির বর্ণনা দিয়েছেন?

এ প্রশ্নের উত্তর লুকায়িত রয়েছে ইতিহাসের জলবায়ু পরিবর্তনের মাঝে। ঐতিহাসিক দলিলপত্রসমূহ প্রকাশ করে যে, এই যেসব অঞ্চল আজ মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে, এগুলোই এক সময় ছিল অত্যন্ত উর্বর ও শ্যামল স্থলভূমি। কোরআনের বর্ণনা অনুসারে, কয়েক হাজার বছরেরও কম সময় আগে এ অঞ্চলের বিরাট একটি অংশে ছিল সবুজ-শ্যামল এলাকা ও প্রস্রবণসমূহ; আর অঞ্চলটির লোকেরা এসব অনুগ্রহগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করত। অরণ্যসমূহ এ অঞ্চলের রুক্ষ জলবায়ুকে মৃদুভাবাপন্ন করে তুলেছিল এবং অঞ্চলটিকে আরও বসবাসযোগ্য বানিয়ে রেখেছিল। মরুভূমিও ছিল, তবে আজকের মত এত বিশাল জায়গা জুড়ে ছিল না।

দক্ষিণ আরবের যে অঞ্চলগুলোয় আ'দ জাতির বসবাস ছিল সে জায়গাগুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্রাবলী পাওয়া গিয়েছে যেগুলো কি-না এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করতে পারে। এই যোগসূত্রগুলো থেকে জানা যায় যে সেই অঞ্চলের অধিবাসীরা একটি উন্নত ধরনের সেচ পদ্ধতির ব্যবহার করত। সম্ভবত যে একটিমাত্র উদ্দেশ্যে এই সেচ পদ্ধতির ব্যবহার ছিল তাহল, "কৃষিকাজ"। এই যে অঞ্চলগুলো আজ মনুষ্যবাসের অযোগ্য, এক সময় সেই জায়গাগুলোই মানুষ আবাদ করে গিয়েছে।

কৃত্রিম উপগ্রহ দ্বারা নেয়া ছবিগুলো রামলাতের আশে-পাশে সেচকার্যে ব্যবহৃত খাল ও বাঁধের যে বিস্তৃত পদ্ধতি ছিল তা উন্মোচিত করেছে। সাবাতাইয়ান নামক এ পদ্ধতিটি সংশ্লিষ্ট নগরগুলোতে ২০০,০০০ লোকের প্রয়োজন মেটাত বলে অনুমান করা হয়ে থাকে।[২৫] যেমন, গবেষণা কার্যে অংশগ্রহণকারী একজন গবেষক মিঃ ডো বলেছেন, মা'রিবের আশে-পাশের এলাকা এত উর্বর ছিল যে, একজনের ধারণা হতে পারে যে, মা'রিব ও হদ্রামাউতের মধ্যবর্তী গোটা অঞ্চলই এক সময় ছিল আবাদভূমি।"[২৬]

ক্ল্যাসিক্যাল গ্রীক লেখক, প্লিনী বর্ণনা দিয়েছেন যে, এই অঞ্চলটি ছিল অত্যন্ত উর্বরা, কুয়াশায় ঢাকা অরণ্যেপূর্ণ পর্বতমালা ছিল, ছিল নদীনালা ও অবিভক্ত অরণ্য পথসমূহ। হদ্রামাইটসদের রাজধানী নগরী, শাবওয়াহের, কাছাকাছি কিছু প্রাচীন মন্দির হতে প্রাপ্ত অভিলিখনগুলোতে লিখা ছিল যে, পশু শিকার করা হত এ অঞ্চলে এবং কিছু বলীও দেয়া হত। এসব জিনিস এটাই প্রমাণ করছে যে একদা এ অঞ্চল আংশিক মরু এলাকাসহ উর্বরা ভূমিতে পূর্ণ ছিল।

পাকিস্তানের স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটে সম্প্রতি পরিচালিত কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে, কত বেগে একটি অঞ্চল অনভিপ্রেতভাবে মরুভূমিতে রূপান্তরিত হতে পারে। সেখানকার একটি অঞ্চল, যা-কিনা মধ্যযুগে অত্যন্ত উর্বর ছিল বলে জানা যায়, তা ৬ মিটার উঁচু বালিয়াড়িপূর্ণ ধূলিময় মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই মরু এলাকা প্রতিদিন গড়ে ছয় ইঞ্চি করে প্রসারিত হচ্ছে। এই বেগে বালুকণা এমনকি সর্বোচ্চ বিল্ডিংগুলোকেও গ্রাস করে ফেলতে পারে আর এমনভাবে ঢেকে দিতে পারে যেন কোনকালেই এগুলো বিদ্যমান ছিল না বলে মনে হবে। ১৯৫০ সনে ইয়েমেনের তিমাতে যে খননকার্য চালান হয় সে গর্তগুলো আজ প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ভরাট হয়ে গেছে।

এক সময় মিসরের পিরামিডগুলোও সম্পূর্ণরূপে বালির নিচে চাপা পড়েছিল, যা কেবল দীর্ঘ সময়ব্যাপী খননকার্য চালানোর পরই গোচরীভূত হয়।

সংক্ষেপে, এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, আজ যে অঞ্চলগুলো মরুভূমি হিসেবে পরিচিত সেগুলোই হয়ত অতীতে ভিন্ন এক চিত্র নিয়ে বিদ্যমান ছিল।

কিভাবে আ'দ জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল

পবিত্র কোরআনে উক্ত আছে যে আ'দ জাতি এক "উন্মত্ত বায়ু" দিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আয়াতগুলোতে উল্লেখিত আছে যে, সাত রাত ও আট দিন ধরে বিদ্যমান থাকা এই ক্ষিপ্ত বায়ু আ'দ জাতিকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল।

> "আ'দ সম্প্রদায়ও অবিশ্বাস করিয়াছে, ফলে কেমন হইল আমার শাস্তি ও ভয় দর্শান (উহার বিবরণ শোন)। আমি তাহাদের উপর একটি ঝঞ্ঝা বায়ু প্রেরণ করি একটি আবহমান অশুভ দিনে, সেই বায়ু মানুষকে এমনভাবে উৎপাটন করিয়া নিক্ষিপ্ত করিতেছিল যেন ছিন্নমূল খেজুর গাছের কাণ্ড।"
>
> — সূরা ক্বামার ঃ ১৮-২০

> আর যাহারা ছিল আ'দ, অনন্তর তাহাদিগকে একটি প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়, যাহা আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর সাত রাত ও আট দিন অনবরত চাপাইয়া রাখিয়াছিলেন, অনন্তর, আপনি (যদি তথায় থাকিতেন তবে) সেই সম্প্রদায়কে উহাতে এমনভাবে ভূপাতিত দেখিতেন, যেন তাহারা উৎপাদিত খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড।"
>
> — সূরা হাক্কাহ ঃ ৬-৭
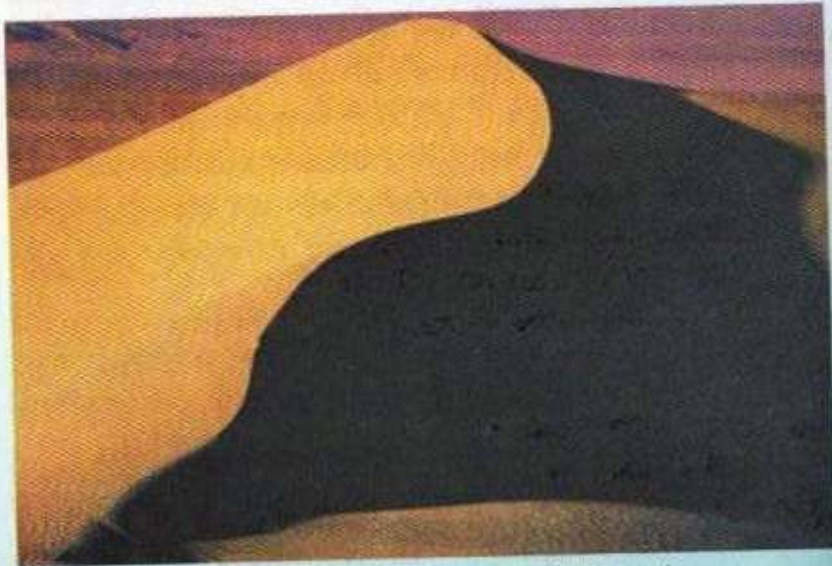
যে অঞ্চলে পূর্বে আ'দ সম্প্রদায় বসবাস করতো সেই অঞ্চল আজ বালিয়াড়িতে পূর্ণ

যদিও আ'দ জাতিকে পূর্বেই হুঁশিয়ার করা হয়েছিল তবুও তারা সেই সতর্কবাণীতে কোনরূপ মনোযোগই দেয়নি, বরং তাদের নবীকে ক্রমাগতই প্রত্যাখ্যান করে যাচ্ছিল। তারা এমনি এক প্রকার মতি বিভ্রমের মধ্যে ছিল যে, যখন তারা দেখছিল যে ধ্বংসলীলা তাদের নিকটবর্তী হচ্ছে তখনও পর্যন্ত এমনকি তারা বুঝতেও পারেনি যে কি ঘটতে যাচ্ছে বরং তারা প্রত্যাখ্যানই করে যাচ্ছিল।

> অনন্তর তাহারা যখন সেই মেঘমালাটিকে নিজেদের বস্তি অভিমুখে আসিতে দেখিল, তখন বলিতে লাগিল, "এইতো মেঘমালা যাহা আমাদের উপর বর্ষণ করিবে" না কখনও না; বরং ইহা সেই বস্তু যাহার জন্য তোমরা ত্বরা করিতেছিলে-একটি টর্ণেডো যাহার মধ্যে যাতনাময় শাস্তি রহিয়াছে।
>
> — সূরা আল-আহক্বাফ ঃ ২৪

আয়াতটিতে এটাই উল্লেখ করা হয়েছে যে, লোকেরা তাদের উপর দুর্যোগ বহনকারী মেঘমালাকে ঠিকই দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু তা যে কি ছিল সেটি বুঝে উঠতে পারেনি, বরং ভেবেছিল যে এটা বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘমালা। দুর্যোগটি যখন তাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন তা কেমন ছিল—সেটা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ, কেননা মরুভূমির বালুকণাকে কষাঘাত করতে করতে অগ্রসরমান সাইক্লোনকে দূর থেকে অনেক সময় বৃষ্টি বহনকারী মেঘমালা বলে মনে হয়। মিঃ ডো (Doe) এই মরু ঝড়গুলোর বর্ণনা করেন এভাবে (মনে হয় তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে নেয়া) ঃ (বালি অথবা ধূলিঝড়ের) প্রথম লক্ষণটি হল, ক্রমে নিকটবর্তী হওয়া ধূলিপূর্ণ একটি বাতাসের দেয়াল যা কিনা শক্তিশালী ক্রমবর্ধমান বেগের বায়ুপ্রবাহ দ্বারা উত্থিত হয়ে উচ্চতায় কয়েক হাজার ফিট হতে পারে এবং এই ধূলিপূর্ণ দেয়ালটি বেশ জোরালো বাতাসে আন্দোলিত হতে পারে।[২৭]

আ'দ সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষ বলে ভাবা হয় যে, "বালির আটলান্টিস, উবার"-কে সেই উবারকে কয়েক মিটার পুরো একটি বালিস্তরের নীচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

এটা মনে হয় যে, পবিত্র কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী, **"সাত রাত ও আট দিন"** ব্যাপী বিদ্যমান উন্মত্ত বায়ু নগরীটির উপর টনকে টন বালু নিয়ে এসে জড়ো করেছে আর মাটির নিচে লোকদের জীবন্ত সমাহিত করেছে। উবারে চালানো খননকার্য এই সম্ভাবনাটিরই নির্দেশ করছে। ফ্রান্সের একটি ম্যাগাজিন **"কা এম' ইনটারেসী"** নিম্নে একই কথা বলছে; **"ঝড়ের ফলে উবার নগরী ১২ মিটার পুরু বালিস্তরের নিচে চাপা পড়ে।"**[২৮]

আ'দ জাতি যে একটি বালুঝড়ে সমাহিত হয় তার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য বহন করে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত **"আহক্বাফ"** শব্দটি। কোরআনে আ'দ জাতির অবস্থানটিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলে ধরার জন্যই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা আল-আহক্বাফের ২১ আয়াতে যে বর্ণনাটি ব্যবহৃত হয়েছে তাহল নিম্নরূপ ঃ

> **আর আপনি আ'দ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের বর্ণনা করুন, যখন তিনি আপন জাতিকে, যাহারা এমন স্থানে থাকিত যেখানে সুদীর্ঘ বক্রুর বালুকা রাশির স্তূপ ছিল, এই মর্মে ভয় দেখাইলেন যে, "তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহারও ইবাদত করিও না" আর তাঁহার পূর্বে ও পরে বহু ভয় প্রদর্শনকারী (পয়গম্বর) অতীত হইয়াছেন। "আমি তোমাদের উপর এক ভয়ংকর দিনের শাস্তির আশংকা করিতেছি।"**

উবারের খননকার্যে নগরীটির ধ্বংসাবশেষ কয়েক মিটার পুরু বালির স্তরের নিচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এটা খুব ভালভাবে জানা যায় যে, এই অঞ্চলে বালুঝড়ের মহাবিপর্যয় খুব অল্প সময়ের মাঝেই বিশাল পরিমাণ বালুর স্তূপ জড়ো করতে পারে। এটা একেবারেই হঠাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটতে পারে

আরবীতে **"আহক্বাফ"** শব্দটির অর্থ হল, **"বালির বালিয়াড়িসমূহ"**, আর এটা **"হিক্বফ"** শব্দের বহুবচন, যার অর্থ **"বালির বালিয়াড়ি"**। এটাতে প্রমাণিত হয় যে আ'দ জাতি বালিয়াড়িতে পূর্ণ একটি অঞ্চলেই বসবাস করত, যা-কিনা তাদের (আ'দ জাতির) বালুঝড়ে সমাহিত হওয়ার ঘটনাটির সম্ভাব্যতার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ সরবরাহ করছে। এর কোন একটি ব্যাখ্যা অনুসারে **"আহক্বাফ"** শব্দটি **"বালির পাহাড়"** অর্থটি হারিয়ে ফেলে এবং দক্ষিণ ইয়েমেনের যেখানে আ'দ জাতি বাস করত সেই অঞ্চলটির নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তাতে এই শব্দটির মূল যে **"বালুর বালিয়াড়ি"** সে সত্যটুকু বদলিয়ে দেয় না, বরং ঠিক এটাই প্রমাণ করে যে, সেই অঞ্চলে প্রচুর বালিয়াড়ি বিদ্যমান থাকায় এলাকাটির বৈশিষ্ট্যরূপেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

বালু ঝড়ের ফলে যে ধ্বংসলীলা নেমে আসে তা **"মানুষকে এমনভাবে উপড়ে ফেলে দেয় যেন তারা ছিল (মাটি থেকে) উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের মূল।"** এই ধ্বংসাত্মক কাণ্ডটি অবশ্যই অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে থাকবে যারা কিনা তখনও পর্যন্ত নিজেদের জন্য উর্বর জমি আবাদ করে, বাঁধ ও সেচ খাল নির্মাণ করে জীবনযাপন করছিল।

সেখানে বসবাসরত সম্প্রদায়ের সব উর্বরা আবাদী জমি, বাঁধ ও সেচ খালগুলোই বালিতে আচ্ছাদিত হয়ে যায় এবং সেই বালির নিচে সেই নগরী ও পুরো সম্প্রদায় জীবন্ত সমাহিত হয়। সেই সম্প্রদায়টি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর কালক্রমে মরুভূমিও বিস্তৃত হয়েছে এবং এমনভাবে অঞ্চলটিকে ঢেকে দিয়েছে যে সেখানে বসতির কোন চিহ্নই রাখেনি।

ফলে এটা বলা যেতে পারে যে, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ এটাই নির্দেশ করছে যে আ'দ জাতি ও ইরাম নগরী বিদ্যমান ছিল; আর এরা কোরআনে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তী গবেষণাসমূহে বালির নিচ থেকে এসব লোকের ধ্বংসাবশেষসমূহ উদ্ধার করা হয়েছে।

মাটির নিচে সমাহিত এসব ধ্বংসাবশেষের দিকে দৃষ্টি আরোপ করে একজনের যা করা উচিত তাহল, এগুলো থেকে তেমনিভাবে হুঁশিয়ারি বাণী গ্রহণ করা ঠিক যেমনি গুরুত্বসহকারে পবিত্র কোরআনে তা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আ'দ জাতি তাদের ঔদ্ধত্যের কারণে পথভ্রষ্ট হয়েছিল এবং বলেছিল যে ঃ

> "আমাদের চেয়ে শক্তিতে কে শ্রেষ্ঠ?" আয়াতের বাকী অংশে বলা হয়েছে, "তারা কি দেখে না যে সেই আল্লাহ যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই শক্তিতে তাদের উপর শ্রেষ্ঠ ?"
>
> — সূরা ফুসিলাত ঃ ১৫

একজন মানুষের করণীয় কার্য হল, সদা-সর্বদা এই অপরিবর্তনীয় ঘটনাবলী মনে রাখা এবং এটা বোঝা যে, সর্বদা সবচেয়ে মহান ও মহা সম্মানিত হলেন সেই আল্লাহ এবং কেবল তাঁরই উপাসনা করে একজন সফলকাম হতে পারে।

অধ্যায় পাঁচ

সামূদ জাতি

> "সামূদ সম্প্রদায় পয়গম্বরদের প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাহারা বলিয়াছিল, "আমরা কি এমন ব্যক্তিকে মানিব যিনি আমাদেরই মত একজন মানুষ, তখন এই অবস্থায় আমরা মহা ভুলে এবং উন্মাদে পরিণত হইব।
>
> আমাদের মধ্য হইতে কি তাঁহারই প্রতি আসমানী বাণী অবতীর্ণ হইয়াছে? (এইরূপ কখনও নহে) বরং সে জঘন্য মিথ্যাবাদী ও দাম্ভিক।"
>
> শীঘ্রই তাহারা (মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে) অবহিত হইবে, মিথ্যাবাদী দাম্ভিক কে ছিল।
>
> — সূরা ক্বামার ঃ ২৩-২৬

পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে যে, ঠিক আ'দ জাতির মতই সামূদ সম্প্রদায় আল্লাহ তায়ালার সতর্কবাণীসমূহ প্রত্যাখ্যান করে আর এরই ফলে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। আজ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের বদৌলতে অতীতের বহু অজানা জিনিস উন্মোচিত বা উদঘাটিত হচ্ছে, যেমন ঃ সামূদ জাতির বাসস্থানের অবস্থান, তাদের নির্মিত বাড়িঘর এবং তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি ইত্যাদি। কোরআনে উল্লেখিত সামূদ জাতি এক ঐতিহাসিক সত্য যা - কিনা বর্তমানের অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যাবলীর মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

সামূদ জাতি সম্পর্কিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদের্শনাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করার আগে পবিত্র কোরআনের ঘটনাসমূহ এবং তাদের নবীর সঙ্গে তাদের সংগ্রামের ঘটনাবলী একে একে পরীক্ষা করে দেখাটাই বেশি কার্যকর হবে।

যেহেতু কোরআন সর্বকালের সকল মানুষের জন্য একটি গ্রন্থস্বরূপ, যা সব সময়ই বলে আসছে যে, সামূদ জাতির প্রতি আগত সতর্কবাণীর প্রতি সে সম্প্রদায়টির প্রত্যাখ্যানের ঘটনাটি নিজেই সকল যুগের সকল মানুষের প্রতি একটি সতর্কসংকেত স্বরূপ।

সালেহ (আঃ)-এর বার্তা প্রচার

কোরআনে উল্লেখ আছে যে, সামূদ জাতিকে সতর্ক করতেই এসেছিলেন সালেহ (আঃ)। তিনি সামূদ সমাজের একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সম্প্রদায় তাঁর কাছে এমনটি আশাও করেনি যে, তিনি সত্যধর্ম ঘোষণা করবেন। তাই তিনি যখন তাদেরকে তাদের বিপথগামিতা পরিহার করতে আহবান করলেন তখন তারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল। তাঁকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ও অভিযুক্ত করে তারা তাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল।

> আর সামূদ (জাতির) প্রতি তাহাদের ভাই সালেহকে (নবী বানাইয়া) পাঠাইলাম তিনি (আপন ক্বওম-কে) বলিলেন, "হে আমার ক্বওম! তোমরা (কেবল) আল্লাহর এবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি তোমাদেরকে জমিন (অর্থাৎ মৃত্তিকা) হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তথায় তোমাদের আবাদ করিয়াছেন; সুতরাং তোমরা তাঁহার নিকট আপন পাপ মার্জনা করাও, অতঃপর তাঁহার প্রতি নিবিষ্ট হইয়া থাক। অবশ্য আমার প্রভু সন্নিকটে, আহবানে সাড়া প্রদানকারী।"
>
> তাহারা বলিতে লাগিল, "হে সালেহ! তুমি তো ইতিপূর্বে আমাদের আশা-ভরসার স্থল ছিলে, তবে কি তুমি আমাদেরকে সেই সমস্ত বস্তুর এবাদত করিতে বাধা দিতেছ যাহাদের এবাদত করিয়া আসিয়াছে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা? আর যে ধর্মের প্রতি তুমি আমাদিগকে আহবান করিতেছ, আমরা তৎসম্বন্ধে গভীর সন্দেহে আছি, যাহা আমাদেরকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলিয়া রাখিয়াছে।"
>
> — সূরা হুদ ঃ ৬১-৬২

তাঁর সম্প্রদায়ের ছোট একটি অংশ তাঁর আহবানে সাড়া দিল, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই তিনি যা বলছিলেন তা গ্রহণ করেনি। বিশেষভাবে সম্প্রদায়ের নেতারা সালেহ (আঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করল এবং তাঁর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব গ্রহণ করল। যারা নবী সালেহ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল তাদেরকে নেতারা বাধা প্রদানের আর নির্যাতনের প্রচেষ্টা চালাতে লাগল। সালেহ (আঃ) তাদেরকে আল্লাহর ইবাদত করতে বলেছেন বলে নবীর প্রতি

তারা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গেল। এই ক্রোধোন্মত্ততা বিশেষভাবে কেবল সামূদ জাতির একার ছিল না; বরং তাদের পূর্ববর্তী নূহ সম্প্রদায় ও আ'দ জাতি যে ভুলসমূহ করেছিল, সামূদ জাতি সে ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করছিল মাত্র। এ কারণে কোরআন নিম্নে এভাবে এ তিনটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছে ঃ

> তোমাদের নিকট কি সেই সকল লোকের সংবাদ পৌঁছে নাই যাহারা তোমাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে? অর্থাৎ নূহ সম্প্রদায় এবং আ'দ জাতি ও সামূদ জাতি এবং তাহাদের পর যাহারা ছিল; যাহাদেরকে আল্লাহ ব্যতীত কেহই জানে না; তাহাদের নিকট তাহাদের রাসূলগণ নিদর্শনাবলী সহকারে আসিয়াছিলেন, অনন্তর সেই সকল সম্প্রদায় রাসূলগণের মুখে হাতচাপা দিল এবং বলিতে লাগিল, "যেই আদেশ দিয়া তোমাদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছে আমরা উহাতে অবিশ্বাসী, আর তোমরা আমাদেরকে যে বিষয়ের দিকে ডাকিতেছ আমরা তৎসম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহে দোদুল্যমান আছি।"
>
> — সূরা ইবরাহীম ঃ ৯

সালেহ (আঃ) লোকদের সতর্ক করা সত্ত্বেও তারা শুধু সন্দেহের বশে তাঁকে পরাভূত করে যাচ্ছিল। কিন্তু তারপরও একটি দল ছিল যারা সালেহ (আঃ)-এর নবীত্বে বিশ্বাসী ছিল এবং তারাই হল সেই দল যারা, মহাবিপর্যয় যখন আসল, তখন সালেহ (আঃ)-এর সঙ্গে বিপর্যয় থেকে রেহাই পেয়েছিল। সালেহ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল যে দলটি তাদের প্রতি সমাজের নেতারা নির্যাতন করার চেষ্টা করতে লাগল;

> তাঁহার সম্প্রদায়ের যাহারা দাম্ভিক সর্দার ছিল তাহারা সেই সমস্ত দরিদ্র লোকদেরকে, যাহারা তাহাদের মধ্য হইতে ঈমান আনিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কি এই বিশ্বাস রাখ যে সালেহ আপন প্রভুর পক্ষ হইতে প্রেরিত হইয়াছেন?" তাঁহারা বলিলেন, "নিশ্চয় আমরা ও তৎপ্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখি, যাহা দিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করা হইয়াছে," ঐ দাম্ভিক লোকেরা বলিতে লাগিল, "তোমরা যাহাতে বিশ্বাস করিয়াছ আমরা উহাতে অস্বীকার করি।"
>
> — সূরা আ'রাফ ঃ ৭৫-৭৬

তারপরও সামূদ জাতি আল্লাহ তায়ালা ও সালেহ (আঃ)-এর নবুয়তে অবিশ্বাস ও সন্দেহ করেই যাচ্ছিল। অধিকন্তু, একটি দলতো প্রকাশ্যেই সালেহ (আঃ)-কে অস্বীকার করে বসল। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের একটি দল সালেহ (আঃ)-কে হত্যার পরিকল্পনা করল।

> তাহারা বলিতে লাগিল, "আমরাতো তোমাকে এবং তোমাদের সঙ্গীদেরকে অশুভ লক্ষণ মনে করি।" সালেহ বলিলেন, "তোমাদের অমঙ্গল (হেতু) আল্লাহই জানেন, বস্তুত তোমরাই হইলে সেই সম্প্রদায়, যাহারা (এই কুফরীর ফলে) আযাবে পতিত হইবে।"
>
> সেই জনপদে (সরদার হিসাবে) নয়জন লোক ছিল যাহারা ভূপৃষ্ঠে অশান্তি বিস্তার করিতেছিল এবং (আদৌ) শান্তি স্থাপন করিতেছিল না। তাহারা বলিল, "তোমরা সকলে আল্লাহর নামে শপথ কর যে, আমরা রাত্রিকালে সালেহ এবং তাঁহার সঙ্গীদিগকে হত্যা করিব, অতঃপর আমরা তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণকে বলিব, আমরা তাঁহার সংশ্লিষ্টদের (এবং স্বয়ং তাঁহার) হত্যায় উপস্থিত (ও) ছিলাম না এবং আমরা সম্পূর্ণ সত্যবাদী।" আর তাহারা এক গোপন চক্রান্ত করিল এবং আমি (ও) এক গোপন ব্যবস্থা করিলাম, অথচ তাহারা টেরও পাইল না।"
>
> — সূরা নমল ঃ ৪৭ -৫০

সালেহ (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহর আদেশাবলী মেনে নিবে কি-না, তা যাচাই করে দেখার জন্য পরীক্ষাস্বরূপ একটি উটকে এনে দেখালেন। তাঁরা নবীকে মানবে কি মানবে না, তা পরখ করার জন্য তিনি তাঁর লোকজনদেরকে আহবান করলেন তারা যেন এই উটের সঙ্গে পানি ভাগাভাগি করে নেয় এবং উটটির কোনরূপ ক্ষতিসাধন যেন না করে। কিন্তু তাঁর লোকেরা প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উটটিকে হত্যা করে ফেলল।। সূরা আশ-শুআরাতে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ;

> "সামূদ সম্প্রদায়ও নবীদের প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। তাহাদিগকে যখন তাহাদের ভ্রাতা সালেহ বলিলেন, "তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় কর না? আমি তোমাদের নিকট একজন বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগামী হও।

> আর ইহাতে আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহিতেছি না, আমার পুরস্কার তো বিশ্ব প্রতিপালকের জিম্মায় রহিয়াছে।
>
> তোমাদিগকে কি এই সমুদয় বস্তুতে নিরাপদে থাকিতে দেওয়া হইবে, যাহা এখানে আছে? অর্থাৎ উদ্যানসমূহে, প্রস্রবণসমূহে এবং শস্য ক্ষেত্রসমূহে এবং আঁটা গুচ্ছবিশিষ্ট খেজুর বৃক্ষসমূহে?
>
> আর তোমরা কি (এই বেখবরীতে) পাহাড়সমূহ কাটিয়া সগর্বে গৃহ নির্মাণ করিতেছ? অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। আর সেই সীমালংঘনকারীদের কথা মানিও না যাহারা ভূপৃষ্ঠে অশান্তির সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করে না।"
>
> তাহারা বলিল, "তোমাকে তো কেহ ভীষণ যাদু করিয়াছে। তুমি তো আমাদের ন্যায় একজন (সাধারণ) মানুষ।
>
> অতএব কোন নিদর্শন উপস্থিত কর, যদি তুমি (নবুওয়াতে) সত্যবাদী হও।"
>
> সালেহ বলিলেন, "এই একটি উটনী, ইহার জন্য আছে পানি পানের (এক স্বতন্ত্র) পালা, আর তোমাদের জন্য আছে এক পালা নির্ধারিত দিনে।
>
> এবং উহাকে অসদুপায়ে কখনও স্পর্শ করিও না, অন্যথায় এক ভীষণ দিনের শাস্তি আসিয়া তোমাদিগকে ধৃত করিবে।" অনন্তর তাহারা উহাকে বধ করিয়া দিল, ফলে তাহারা (নিজেদের কাণ্ডের উপর) অনুতপ্ত হইল।
>
> — সূরা শুআরা ঃ ১৪১-১৫৭

সালেহ (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের সঙ্গে যে সংগ্রামে লিপ্ত হন তার কথা নিম্নে সূরা ক্বামারে বিবৃত হয়েছে ঃ

> সামূদ সম্প্রদায় ও পয়গম্বরদের প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।
>
> তাহারা বলিয়াছিল, "আমরা কি এমন ব্যক্তিকে মানিব যিনি আমাদেরই মত একজন মানুষ তখন এই অবস্থায়তো আমরা মহাভুলে এবং উন্মাদে পর্যবসিত হইব।
>
> আমাদের মধ্য হইতে কি তাহারই প্রতি আসমানী বাণী অবতীর্ণ হইয়াছে?"

(এইরূপ কখনও নহে) বরং সে জঘন্য মিথ্যাবাদী ও দাম্ভিক)

শীঘ্র তাহারা অবহিত হইবে — মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক কে ছিল।

আমি উটনী পাঠাইতেছি তাহাদের পরীক্ষার জন্য, অতএব তাহাদিগকে পর্যবেক্ষণ করিতে থাকুন এবং ধৈর্যধারণ করুন,

আর তাহাদিগকে উহা বলুন যে, তাহাদের মধ্যে পানি পালা ভাগ করা হইয়াছে, প্রত্যেকে পালাক্রমে উপস্থিত হইবে। অতঃপর তাহারা নিজেদের সাথীকে ডাকিয়া লইল, অনন্তর সে (উটনীর উপর) আক্রমণ চালায় এবং (উহাকে) হত্যা করে।

— সূরা ক্বামার ঃ ২৩-২৯

প্রকৃত ঘটনা এই যে, তারা ঠিক সেই মুহূর্তে শাস্তি প্রাপ্ত হয়নি, এতে তাদের ঔদ্ধত্য আরও বেড়ে গেল। তারা সালেহ (আঃ)-কে আক্রমণ করল, সমালোচনা করল এবং তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করল।

মোটকথা, অতঃপর, তাহারা সেই উটনীকে মারিয়া ফেলিল এবং আপন প্রভুর আদেশের বিরোধিতা করিল এবং (আরও) বলিতে লাগিল, আপনি আমাদেরকে যাহার ধমক দিতে থাকেন তাহা আনয়ন করুন, আপনি যদি পয়গম্বর হন।"

— সূরা আ'রাফ ঃ ৭৭

আল্লাহ তায়ালা অবিশ্বাসীদের পরিকল্পনা ও বিশেষ কৌশলসমূহ দুর্বল করে দিলেন এবং যে সকল লোকেরা সালেহ (আঃ)-এর ক্ষতিসাধন করতে চেয়েছিল তাদের কবল থেকে নবীকে মুক্ত করে নিলেন। এই ঘটনাটির পর, সালেহ (আঃ) বিভিন্ন উপায়ে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজনের নিকট আল্লাহর বাণী ঘোষণা করছিলেন, কিন্তু তারপরেও কেউ অন্তর থেকে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করল না — এসব দেখে সালেহ (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের বললেন যে, তিনদিনের মধ্যে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

কিন্তু তাহারা উহাকে বধ করিল, তখন সালেহ বলিলেন, (ঠিক আছে) "তোমরা আপন গৃহে আর তিনদিন বসবাস করিয়া লও, ইহা এমন একটি অঙ্গীকার যাহা কিঞ্চিৎও মিথ্যা নহে।"

— সূরা হুদ ঃ ৬৫

সত্যি সত্যিই তিনদিন পর সালেহ (আঃ)-এর সতর্কবাণী সত্যে পরিণত হল আর সামূদ জাতি ধ্বংস হয়ে গেল।
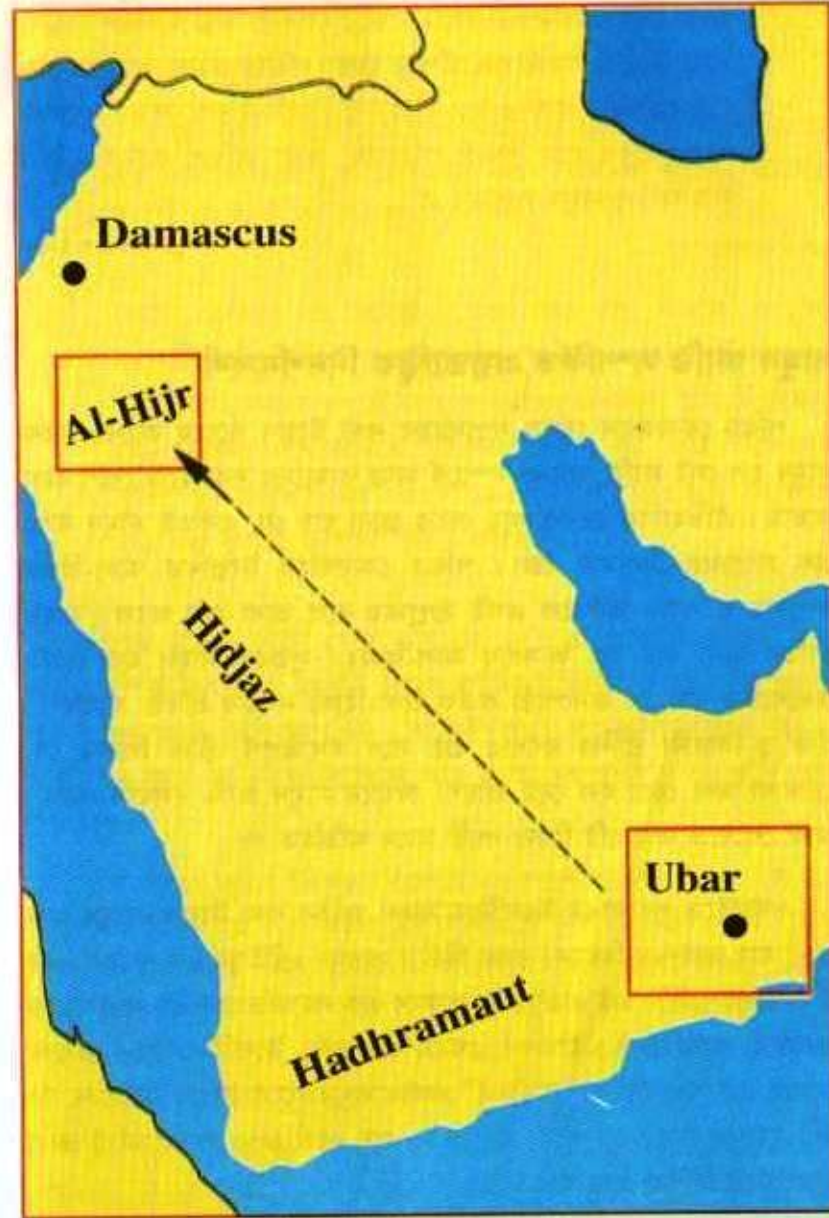
পবিত্র কোরআন থেকে এটা বোঝা যায় যে, সামূদ জাতি আ'দ জাতির বংশধর ছিল। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো থেকে দেখা যায় যে, আরব উপদ্বীপের উত্তরে বসবাসরত সামূদ জাতির আদিবাস ছিল দক্ষিণ আরবে, যেখানে আ'দ জাতির নিবাস ছিল সেখানেই

"আর সেই যালিমদের একটি বিকট নিনাদ আসিয়া আক্রমণ করিল, ফলে তাহারা আপনগৃহে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল, যেন তাহারা সেই গৃহসমূহে কখনও বাস করে নাই। জানিয়া রাখ, সামূদ সম্প্রদায় আপন প্রভুর সঙ্গে কুফরী করিয়াছে, স্মরণ রাখিও, রহমত হইতে দূরে পড়িল সামূদ সম্প্রদায়।"

— সূরা হুদ ঃ ৬৭-৬৮

সামূদ জাতি সম্পর্কিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলী

পবিত্র কোরআনে যেসব সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ রয়েছে তাদের মাঝে সামূদ হল সেই জাতি, যাদের সম্পর্কে আজ আমাদের সবচাইতে বেশি জ্ঞান রয়েছে। ঐতিহাসিক রেকর্ডসমূহ থেকে জানা যায় যে, প্রকৃতই সামূদ নামে এক সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত আল-হিজর সম্প্রদায় ও সামূদ জাতিকে একই সম্প্রদায় বলে ভাবা হয়ে থাকে। সামূদ জাতির অন্য নাম হল আসহাব আল-হিজর। সুতরাং সামূদ হল একটি জনগোষ্ঠীর নাম, যে জনগোষ্ঠী কর্তৃক আল-হিজর নগরীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। গ্রীক ভূ-বিজ্ঞানী প্লীনির বর্ণনাও এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, প্লীনি লিখেন যে, ডোমাথা আর হেগ্রো হল সেই জায়গা যেখানে সামূদ জাতি বসবাস করত। আজ শেষোক্ত জায়গাটি হিজর নগরী নামে অভিহিত।[২৯]

সবচাইতে পুরনো যে উৎসটিতে সামূদ জাতির কথা উল্লেখ রয়েছে বলে জানা যায় তাহল ব্যাবিলনের রাজা দ্বিতীয় সারগণ (খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম শতকে) এর **"বিজয় বর্ষপঞ্জী"**। এই রাজা উত্তর আরবে এক সমরাভিযানে এই সম্প্রদায়কে পরাজিত করেছিলেন। গ্রীকগণ, যেমন এরিসটো, টলেমি ও প্লিনী তাদের লেখায় এই সম্প্রদায়কে **"সামূদেই"** অর্থাৎ সামুদ নামে উল্লেখ করেছেন।[৩০] নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর পূর্বে, প্রায় ৪০০ সন হতে ৬০০ সনের মধ্যে তারা পুরোপুরিই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

পবিত্র কোরআনে সর্বদাই আ'দ ও সামূদ জাতির কথা পাশাপাশি উল্লেখিত হয়েছে। অধিকন্তু আয়াতগুলোতে সামূদ জাতিকে আ'দ জাতির ধ্বংস হয়ে

যাওয়ার ঘটনা থেকে হুঁশিয়ার হয়ে যাওয়ার উপদেশ জানানো হয়েছে। এতে প্রমাণ হয় যে, সামূদ জাতির কাছে আ'দ জাতির বিস্তারিত তথ্য ছিল।

"আর আমি সামূদ সম্প্রদায়ের প্রতি তাহাদের ভ্রাতা সালেহকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল ঃ "হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নাই।"

— সূরা আরাফ ঃ ৭৩

"আর তোমরা এই অবস্থাও স্মরণ কর যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে আ'দ সম্প্রদায়ের পর (ভূপৃষ্ঠে) আবাদ করিয়াছেন। আর তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে বসবাস করার (অধিকার) স্থান দিয়াছেন, যেন তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা নির্মাণ কর, আর পর্বতসমূহ খুঁদিয়া খুঁদিয়া গৃহ নির্মাণ কর। অতএব, আল্লাহর নেয়ামতসমূহ স্মরণ কর এবং ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ বিস্তার করিও না।"

— সূরা আ'রাফ ঃ ৭৪

উপরের আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আ'দ এবং সামূদ জাতির মধ্যে একটি সম্পর্ক ছিল আর এমনকি সামূদ জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতির একটি অংশই ছিল আ'দ জাতি সম্পর্কিত। সালেহ (আঃ), সামূদ সম্প্রদায়কে বলেন, তারা যেন আ'দ জাতির ঘটনা স্মরণ করে ও তাদের পরিণতি দেখে সাবধান হয়ে যায়।

আ'দ জাতির কাছে উদাহরণ হিসেবে নূহ সম্প্রদায়কে তুলে ধরা হত, যে সম্প্রদায়টি কি-না আ'দ জাতির পূর্বেই পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। ঠিক যেমন সামূদ জাতির কাছে আ'দ জাতির একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল, তেমনি আ'দ জাতির কাছে নূহ সম্প্রদায়ের একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল। এই সম্প্রদায়গুলোর পরস্পর একে অপরের সম্বন্ধে অবগত ছিল, আর তারা খুব সম্ভবত একই বংশধারা থেকে এসেছিল।

যাহোক, আ'দ ও সামুদ এই দুই জাতির আবাসস্থল কিন্তু ভৌগোলিকভাবে পরস্পর থেকে বেশ দূরে অবস্থিত ছিল। এর ফলে, এই দুই সম্প্রদায়ের মাঝে যে একটি সম্পর্ক ছিল — তা মনে হয় না; তবে কেনই বা কোরআনের আয়াতে সামূদ জাতিকে আ'দ জাতির কথা স্মরণ করে সতর্ক হওয়ার কথা বলা হয়েছে ?

তবে আয়াতটিতে কেনইবা সামূদ জাতিকে উদ্দেশ্য করে এমনটি বলা হয়েছে যে, তারা যেন আ'দ জাতির কথা স্মরণ করে সতর্ক হয়?

ছোট একটি অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তরটি নিজেই বের হয়ে আসবে। আ'দ ও সামূদ জাতির মাঝে যে ভৌগোলিক দূরত্ব ছিল তা ছিল ভ্রমাত্মক। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক সূত্রগুলো হতে জানা যায় যে, এই দুই জাতির মাঝে একটি জোরাল সম্পর্ক ছিল। সামূদজাতি আ'দ জাতির ব্যাপারে ওয়াকেফহাল ছিল, কেননা এই দুই জাতির উৎপত্তিস্থল খুব সম্ভবত একই ছিল। ব্রিটানিকা মাইক্রোপেডিয়া সামূদ শিরোনামে এ জাতির কথা লিখেছে এভাবে ঃ

> প্রাচীন আরবে উপজাতি কিংবা উপজাতি দলগুলোকে মুখ্য বলে মনে করা হত। যদিও সামূদ জাতির উৎপত্তি ছিল দক্ষিণ আরবে, এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, প্রাথমিক যুগে এদের বড় একটি অংশ উত্তর অভিমুখে চলে যায়, আর প্রথাগতভাবে জাবাল আযলাবের (পর্বতের) ঢালে বসতি স্থাপন করে। সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রম থেকে সামূদ জাতির অসংখ্য শিলালিখন ও ছবি উদঘাটিত হয়েছে। এগুলো শুধু জাবাল আযলাব থেকেই নয় বরং সমগ্র মধ্য এশিয়া জুড়েই পাওয়া গিয়েছিল।[৩১]

নকশায় স্মায়াটিক বর্ণমালার অনুরূপ অন্য একটি লিপি (সামূদিক নামে পরিচিত) দক্ষিণ আরব ও উপরে হিদজাযের সর্বত্র পাওয়া গিয়েছে।[৩২]

এই লিপিটি সর্বপ্রথম দক্ষিণ ইয়েমেনে, সামূদ নামে অভিহিত একটি অঞ্চলে সনাক্ত করা হয়। সামূদ অঞ্চলটি উত্তরে রাবুলখালি, দক্ষিণে হাদ্রামাউত ও পশ্চিমে শাবওয়াহ নগরীগুলো দ্বারা সীমাবদ্ধ।
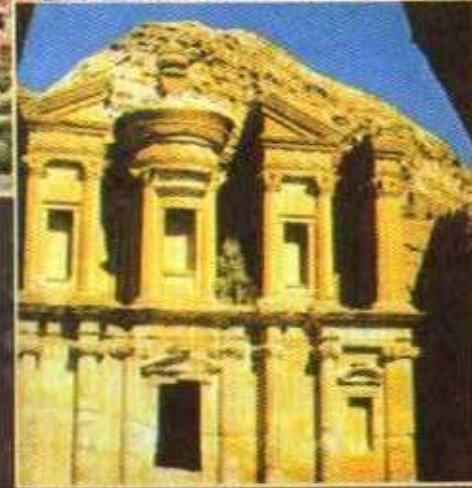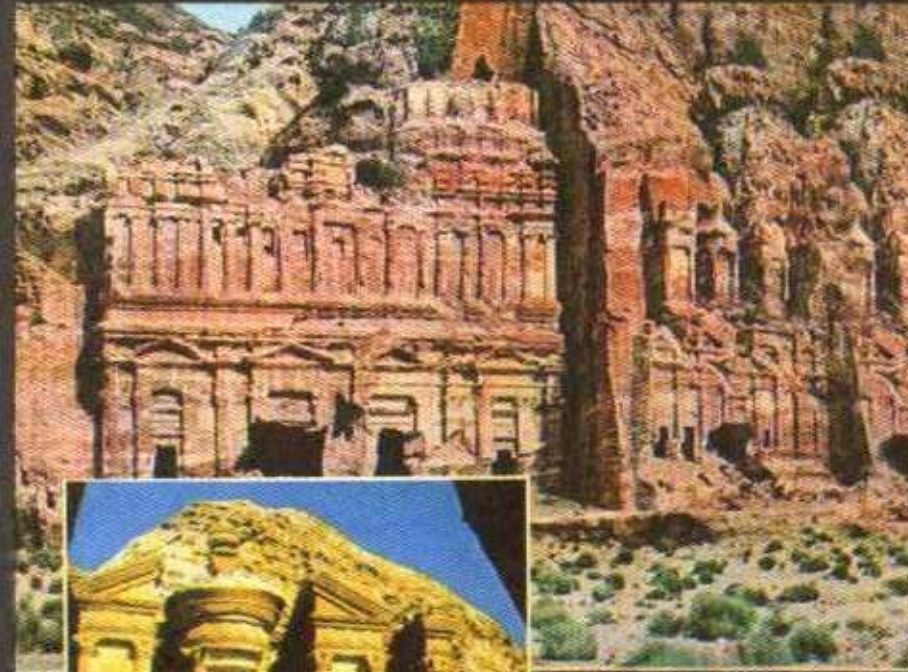
নাবা তাই আন নামে একটি আরব উপজাতি জর্ডানের রম উপত্যকায় একটি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। পেট্রার ভেলী নামক আরেকটি নামে পরিচিত এই জায়গাটিতে এই সকল লোকের পাথরে খোদাই করা কাজ দেখা সম্ভবপর। পবিত্র কোরআনেও সামূদ জাতির পাথরের কাজে দক্ষতা বা দখলের কথা বলা হয়েছে। যাই হোক, উভয় সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষের যা-কিছু রয়ে গিয়েছে তা আমাদের সে কালের শিল্পের ধারণা দিয়ে থাকে। ছবিগুলোতে, পেট্রাভেলীতে পাথরের খোদাইকৃত কাজের নানাবিধ উদাহরণ দেখান হয়েছে

আর তোমরা এই কথাও স্মরণ কর যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে আ'দ সম্প্রদায়ের পর (ভূপৃষ্ঠে) আবাদ করিয়াছেন। আর তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে বসবাস করার স্থান দিয়াছেন, যেন তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা নির্মাণ কর আর পর্বতসমূহ খুঁদিয়া খুঁদিয়া গৃহ নির্মাণ কর। অতএব, আল্লাহর নেয়ামতসমূহ স্মরণ কর এবং ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ বিস্তার করিও না।

— সূরা আ'রাফ ঃ ৭৪

পূর্বে আমরা দেখেছি যে আ'দ সম্প্রদায় বাস করত দক্ষিণ আরবে। এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে সামূদ জাতির কিছু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে সেই অঞ্চলের চারদিকে যেখানে আ'দ জাতি বসবাস করত। বিশেষ করে সেই অঞ্চলের আশেপাশে যেখানে আ'দ জাতির বংশধর হাদ্রামাইটসরা অবস্থান করছিল এবং যেখানে তাদের রাজধানী নগরীটি দাঁড়িয়েছিল। এই অবস্থাটি পবিত্র কোরআনে লেখা আদ-সামূদ সম্পর্কিত ব্যাপারটিই ব্যাখ্যা করে। সালেহ (আঃ) যখন বলছিলেন যে সামূদ জাতি আ'দ জাতির পরিবর্তে এসেছিল, তখন তাঁর মুখের ভাষায় দু' জাতির এ সম্পর্কটি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

> আর আমি সামূদ সম্প্রদায়ের প্রতি তাহাদের ভ্রাতা সালেহকে পাঠাইয়াছি। তিনি বলিলেন, "হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নাই।
>
> আর তোমরা এই অবস্থাও স্মরণ কর যে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে আ'দ সম্প্রদায়ের পর (ভূপৃষ্ঠে) আবাদ করিয়াছেন। আর তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে বসবাস করার স্থান দিয়াছেন।"

সংক্ষিপ্তভাবে, সামূদ জাতি তাদের নবীকে মেনে নেয়নি বলে তাদেরকে মূল্যও দিতে হয়েছিল; ফলস্বরূপ তারা দুর্যোগের মাধ্যমে পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়ে যায়। তাদের নির্মিত অট্টালিকাসমূহ ও তাদের উদ্ভাবিত চারুকলা তাদেরকে শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। সামূদ জাতি, তাদের পূর্বে ও পরে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী অপরাপর সম্প্রদায়গুলোর ন্যায় এক ভয়ংকর দুর্যোগের মধ্য দিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

অধ্যায় ছয়

নিমজ্জিত ফেরাউনের কাহিনী

"তাহাদের অবস্থা ফেরাউনের এবং তাহাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার অনুরূপ; তাহারা আপন প্রভুর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছিল, ফলে আমি তাহাদের অপরাধসমূহের কারণে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি এবং ফেরাউন সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করিয়াছি, আর তাহারা সকলেই ছিল অবিচারী।"

— সূরা আনফাল ঃ ৫৪

প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা তৎকালীন সময়ে মেসোপটেমিয়াতে গড়ে ওঠা অন্যান্য কতকগুলো নগর রাষ্ট্রসহ এমন একটি সভ্যতার জন্ম দেয়, যা ছিল পৃথিবীর সবচাইতে পুরনো সভ্যতাগুলোর অন্যতম একটি। আর এ সভ্যতা তার নিজস্ব যুগের সবচাইতে প্রাগ্রসর সামাজিক শৃঙ্খলা সম্বলিত একটি সুবিন্যস্ত রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল বলে স্বীকার করা হয়ে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে তারাই খ্রিস্ট জন্মের পূর্বে তৃতীয় সহস্রাব্দিতে প্রথম লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার করে এবং তা ব্যবহারও করে, তারাই নীলনদকে তাদের নিজেদের কাজে ব্যবহার করে; আর তারা তাদের দেশের প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণে বহিরাগত কোন বিপদ-আপদ থেকে সুরক্ষিত থেকে যায়; আর এটাই তাদের সভ্যতাকে ক্রমোন্নত করার ক্ষেত্রে বেশ অবদান রেখেছিল।

কিন্তু এ "সভ্য" সমাজটি ছিল এমন, যেখানে "ফেরাউনদের রাজত্বের" প্রসার ঘটেছিল, আর পবিত্র কোরআনে সবচাইতে পরিষ্কারভাবে এবং অত্যন্ত সোজাসুজি এই শাসনকে নাস্তিকতাবাদের পদ্ধতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা অহংকারে ফুলে উঠেছিল, মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল সত্য হতে এবং আর আল্লাহর নিন্দায় মুখর ছিল তারা। কিন্তু অবশেষে, না তাদের অগ্রসর

সভ্যতা, তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃংখলা আর না তাদের সৈন্যবাহিনীর সাফল্য তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে ঠেকাতে পেরেছিল।

নীলনদের উর্বরতাই মিসরীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি। নীলনদের প্রচুর পানি থাকায় বর্ষাকালের উপর নির্ভরশীল না হয়ে এই নদের পানি দিয়েই তারা চাষাবাদ করতে পারত, আর তাই তারা নীলনদের উপত্যকায় তাদের বসতি গড়ে তোলে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আর্নস্ট এইচ. গমব্রিচ তাঁর লেখায় উল্লেখ করেন যে, আফ্রিকার আবহাওয়া অত্যন্ত উষ্ণ, কখনও মাসের পর মাস সেখানে বৃষ্টিপাত হয় না। এ কারণে বিশাল এ মহাদেশের অসংখ্য অঞ্চল অতিরিক্ত শুষ্ক। মহাদেশটির এ অঞ্চলগুলোতে রয়েছে বিশাল বিশাল মরুভূমি। নীলনদের উভয় পাশেও রয়েছে মরু এলাকা আর মিসরে কদাচিৎই বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু নীলনদটি সমগ্র দেশটির মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় এ দেশটিতে বৃষ্টিপাতের তেমন বেশি দরকার পড়ে না।

সুতরাং যাদেরই দখলে অত্যন্ত গুরুত্ববহ এই নীলনদ রয়েছে, তারাই মিসরের বাণিজ্য ও কৃষির বৃহত্তম উৎসকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। ফেরাউনরা এভাবেই মিসরে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। নীল উপত্যকার সরু ও খাড়া আকৃতি নীলনদের আশেপাশে অবস্থিত আবাসিক এলাকাগুলোকে ততটা প্রসারিত হতে দেয়নি, যার ফলে মিসরীয়রা বড় বড় নগরীর পরিবর্তে ছোট মাত্রার শহর ও গ্রাম নিয়েই তাদের সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। এ কারণগুলোই ফেরাউনদেরকে তাদের জনসাধারণের উপর তাদের প্রাধান্যকে সুদৃঢ় করতে সহায়তা করে।

রাজা মেনিস সর্বপ্রথম মিসরীয় ফেরাউন ছিল বলে জানা যায়। সে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দিতে গোটা প্রাচীন মিসরকে একত্রিত করে একটি যুক্ত রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। প্রকৃতপক্ষে "ফেরাউন" শব্দটি মিসরের রাজাদের প্রাসাদকে উল্লেখ করতে ব্যবহৃত হত। কিন্তু পরে, কালক্রমে, এটা মিসরীয় রাজাদের উপাধিতে পরিণত হয়। আর তাই পুরনো মিসরের শাসকদের ডাকা হত ফেরাউন বলে।

ফেরাউনরা পুরো রাষ্ট্র ও এর অঞ্চলসমূহের মালিক, প্রশাসক ও শাসক হওয়ায়, তাদেরকে পুরনো মিসরের বিকৃত বহুত্ববাদী ধর্মের বড় বড় দেবতাদের প্রতিফলন হিসেবে গ্রহণ করে নেয়া হত। মিসরীয় ভূখণ্ডসমূহের প্রশাসন, তাদের বিভাজন, তাদের আয়, সংক্ষেপে সমস্ত সম্পত্তি, চাকরি আর দেশটির সীমান্তের আভ্যন্তরীণ সমস্ত প্রকার উৎপাদন ফেরাউনদের পক্ষ হতে পরিচালিত হত।

শাসনব্যবস্থায় বিদ্যমান যথেচ্ছাচার ফেরাউনদেরকে দেশ শাসনের ক্ষেত্রে এমনিই ক্ষমতাধর করে তোলে যে, তারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারত। মিসরের উঁচু ও নিচু অঞ্চলকে একত্রিত করে সর্বপ্রথম মিসরের রাজা হন যে রাজা মেনিস, তার সময়ে ঠিক প্রথম রাজতন্ত্রের গোড়াপত্তনকালে — খাল কেটে কেটে মিসরের জনগণকে নীলনদের পানি বন্টন করে দেয়ার কাজ শুরু হয়েছিল। তাছাড়া, উৎপাদনসমূহ রাজার নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল আর সমস্ত উৎপাদন ও চাকরিসমূহ রাজার নামে বরাদ্দ ছিল। রাজা তাদের প্রয়োজনীয় লোকদের অনুপাতে এই পণ্যদ্রব্য ও চাকরিসমূহ বন্টন ও ভাগাভাগি করতেন। এমন ক্ষমতাধর রাজাদের পক্ষে তাদের জনগণকে বশে রাখা কোন কঠিন কাজই ছিল না। মিসরের রাজা, অথবা যাদের ভবিষ্যত নাম ছিল ফেরাউন, তাদেরকে এমন একটি পবিত্র সত্ত্বা হিসেবে দেখা হত, যার হাতে রয়েছে প্রচুর ক্ষমতা আর যিনি তার জনগণের সমস্ত প্রয়োজন মেটান।

তাকে দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত করে রাখা হত। ফলে কালক্রমে ফেরাউনরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, প্রকৃতপক্ষে তারাই দেবতা। পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত, মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে ফেরাউনের কথোপকথনের সময় এমন কিছু কথা ফেরাউন ব্যবহার করে যে তাতে প্রমাণিত হয় যে তারা এ ধরনের বিশ্বাসই করত। সে মূসা (আঃ)-কে এই বলে বশীভূত করতে চেয়েছিল ঃ

"যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কোন দেবতাকে উপস্থাপিত কর তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে পাঠাইব।"

— সূরা শুআরা ঃ ২৯

এবং সে আশেপাশের লোকজনদের বলিয়াছিল, "আমি আমার নিজেকে ছাড়া তোমাদের জন্য অন্য কোন ঈশ্বরকে জানি না।

— সূরা ক্বাসাস ঃ ৩৮

ফেরাউন নিজেকে দেবতা বলে বিবেচনা করত বলেই এমন কথা বলতে পেরেছিল।

ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহ

ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের মতানুসারে, প্রাচীন মিসরীয়গণ পৃথিবীর সবচাইতে ধর্মপ্রাণ জাতি ছিল।

কিন্তু যাই হোক না কেন, তাদের কথিত এই ধর্ম প্রকৃত সত্যধর্ম ছিল না বরং তা ছিল বহু ঈশ্বরবাদী বিকৃত একটি ধর্ম; আর মিসরীয়রা তাদের অতিমাত্রার রক্ষণশীলতার জন্য বিকৃত এই ধর্মকে পরিত্যাগ করতেও পারেনি। মিসরীয়রা তাদের আবাসভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল অত্যন্ত বেশিমাত্রায়। মিসরের চারপাশ ঘিরে ছিল মরুভূমি, পার্বত্য এলাকা আর সমুদ্র। এই দেশটিতে আক্রমণ চালানোর মাত্র দুটি সম্ভাব্য রাস্তা ছিল। আর এই রাস্তা দুটিকে সুরক্ষিত রাখা মিসরীয়দের জন্য অত্যন্ত সহজ ছিল। এ সব প্রাকৃতিক কারণগুলোর বদৌলতে মিসরীয়গণ বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। কিন্তু বহমান শতাব্দীগুলো তাদের এই বিচ্ছিন্নতাকে অন্ধ গোঁড়ামিতে পূর্ণ বিশ্বাসে রূপান্তরিত করে।

এভাবেই তারা এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করে, যা ছিল নবনব উন্নয়ন ও অভিনব সব কিছু থেকে সংরক্ষিত অবস্থায়; আর এ দৃষ্টিভঙ্গী তাদের ধর্মের ব্যাপারে ছিল অতিমাত্রায় রক্ষণশীল।

পবিত্র কোরআনে বারংবার উল্লেখিত **"তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মই"** হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।
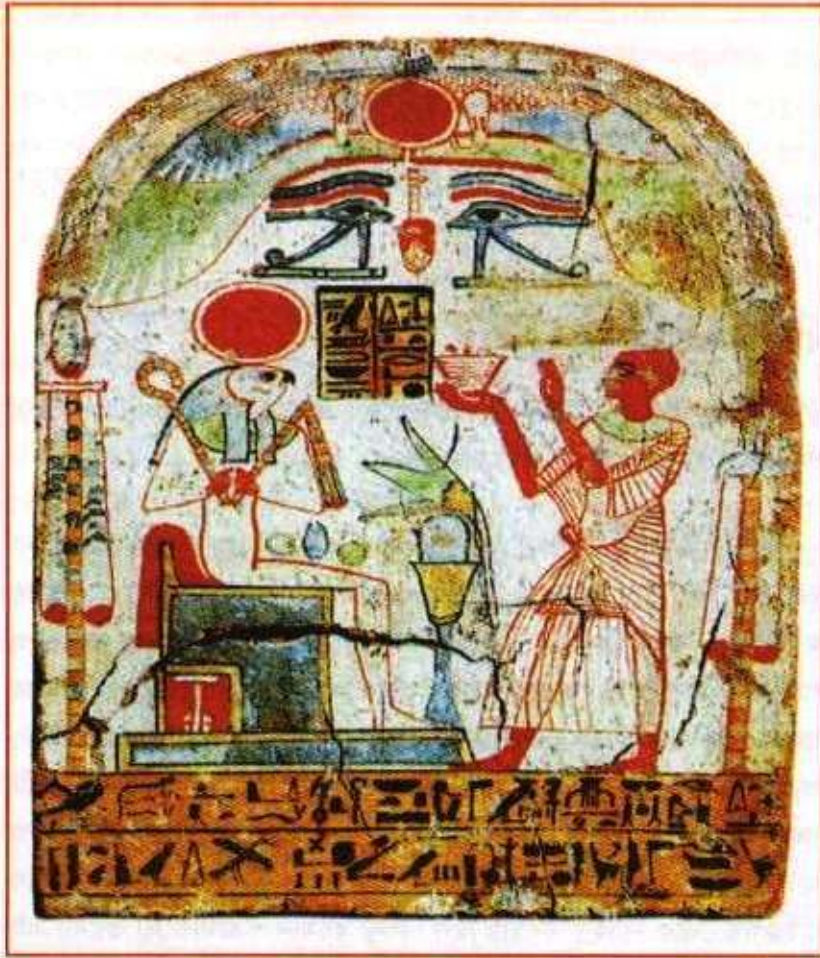
দেবতাদের পূজা অর্চনার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল মিসরীয়দের ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহ। তাদের পুরোহিতরা এসব দেবতা ও লোক সমাজের মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ছিল আর এই পুরোহিতরা তাদের সমাজের নেতাদের মধ্য হতেই নির্বাচিত ছিল। যাদু ও ডাকিনী বিদ্যা প্রয়োগের মাধ্যমে এই পুরোহিতরা একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী গড়ে তুলেছিল। আর ফেরাউনরা এই শ্রেণীটিকে তার প্রজাদের বশে রাখার কাজে ব্যবহার করত

এসব কারণেই ফেরাউন ও তার ঘনিষ্ঠজনদের কাছে যখন মূসা (আঃ) ও হারুণ (আঃ) সত্যধর্মের ঘোষণা দিলেন, তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নিল, যা-কিনা নিম্নের আয়াতে উল্লেখ রয়েছে ঃ

তাহারা বলিল, "তোমরা কি এইজন্যই আসিয়াছ, যেন আমাদের সেই নীতি হইতে বিচ্যুত করিয়া দাও, যাহার উপর আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের দেখিয়াছি এবং (এজন্য আসিয়াছি যে) ভূপৃষ্ঠে তোমাদের দুজনেরই যেন আধিপত্য বিস্তার হয়? আর আমরা কখনও তোমাদের দুইজনকে মানিব না।"

— সূরা ইউনুস ঃ ৭৮

প্রাচীন মিসরীয়দের ধর্ম বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ছিল। এদের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল রাজ্যের আনুষ্ঠানিক ধর্ম, জনসাধারণের বিশ্বাসসমূহ ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনের উপর বিশ্বাস।

রাজ্যের আনুষ্ঠানিক ধর্ম অনুসারে ফেরাউন ছিল পবিত্র সত্ত্বা। সে পৃথিবীর বুকে জনসাধারণের দেবতাসমূহের প্রতিফলন হিসেবে বিদ্যমান ছিল আর তার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীতে জনগণের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা ও তাদেরকে রক্ষা করা।

জনসাধারণের মাঝে বহুল বিস্তৃত যে বিশ্বাসগুলো প্রচলিত ছিল সেগুলো ছিল অত্যন্ত জটিল।

আর যে ব্যাপারগুলোর সঙ্গে রাজ্য ধর্মের অমিল ছিল সেগুলো ফেরাউনের আধিপত্য দিয়ে দাবিয়ে রাখা হত।

মূলত তারা বহু দেবতায় বিশ্বাসী ছিল এবং এ দেবতাগুলোকে চিত্রিত করা হত মানব দেহের উপর পশুর মাথা — এমন অবয়বের মাধ্যমে। কিন্তু স্থানীয় ঐতিহ্যসমূহ এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ভিন্নরূপ নিয়ে অবস্থান করছিল — এ দৃশ্যও দেখা যেত।

মিসরীয়দের ধর্মীয় বিশ্বাসের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়েছিল মৃত্যু পরবর্তী জীবন। তারা বিশ্বাস করত যে দেহের মৃত্যুর পরও আত্মা জীবিত থাকে। সে অনুযায়ী, মৃতের আত্মাকে বিশেষ কতক ফেরেশতা ঈশ্বরের সামনে এনে হাজির করে। এখানে ঈশ্বর নিজে বিচারপতি, তার সঙ্গে আরও ৪২ জন সাক্ষী বিচারক থাকবে। মাঝখানে একটি নিক্তি বসান হবে; আর এই নিক্তিটিতে মৃত আত্মার অন্তরের ওজন নেয়া হবে। যে আত্মার পুণ্য বেশি হবে সে সুন্দর এক জায়গায় সুখে বসবাস করতে থাকবে, অন্যদিকে যাদের মন্দকাজের পরিমাণ বেশি হবে তাদেরকে নিদারুণ যন্ত্রণাপূর্ণ এক জায়গায়

পাঠিয়ে দেয়া হবে। আর সেখানে তারা "মৃতজীব ভক্ষক" নামক এক অদ্ভুত প্রাণী কর্তৃক অসহনীয় যন্ত্রণায় ভুগতে থাকবে অনন্তকাল।

মিসরীয়দের পরকালের উপর বিশ্বাস স্পষ্টভাবেই একত্ববাদী, বিশ্বাস ও সত্যধর্মের সঙ্গে সাদৃশ্য প্রদর্শন করে। এমনকি, শুধু তাদের পরকালের উপর বিশ্বাসের ব্যাপারটি এটাই প্রমাণ করে যে, প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার কাছে সত্যধর্ম এবং এর বার্তা পৌছেছিল, কিন্তু পরবর্তীতে এই ধর্ম বিকৃত হয়ে যায় আর একত্ববাদ বহুত্ববাদের রূপ নেয়। ইতিমধ্যে এটা জানা গেছে যে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির কাছে এক সময় না এক সময় যেমন করে সাবধানবাণী বাহকগণ এসেছেন ঠিক তেমনিভাবেই মিসরীয়দের কাছেও সময়ে সময়ে সতর্ককারীগণ প্রেরিত হয়েছেন যাঁরা কি-না জনগণকে আল্লাহর একত্বের দিকে ডাকতেন এবং আহ্বান করতেন যেন তারা আল্লাহর বান্দা হতে পারে। এসব আহবানকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন ইউসুফ (আঃ)-যাঁর কথা কোরআনে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। ইউসুফ (আঃ)-এর ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে তাতে বনী ইসরাঈলীদের মিসরে আগমন এবং সেখানে বসতি গড়ার কথা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অন্যদিকে ইতিহাসের পাতায় মিসরবাসী এমন কতক লোকের উল্লেখ রয়েছে যারা এমনকি মূসা (আঃ)-এরও আগমনের পূর্বে এসে তাঁদের জনগণকে তৌহিদবাদী ধর্মের প্রতি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মিসরের ইতিহাসে এমনি একজন অত্যন্ত কৌতূহলদ্দীপক ফেরাউন হলেন আমেনহোটেপ-৪।

একেশ্বরবাদী ফেরাউন আমেনহোটেপ-৪

সাধারণভাবে মিসরের ফেরাউনরা ছিল পাশবিক, অত্যাচারী, যুদ্ধবাজ, নির্মম প্রকৃতির মানুষ। সচরাচর তারা মিসরের বহু ঈশ্বরবাদী ধর্ম গ্রহণ করত এবং এই ধর্মের মাধ্যমে নিজেদেরকে দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত করত। কিন্তু মিসরের ইতিহাসে এমন একজন ফেরাউনের উল্লেখ রয়েছে যে কিনা অন্যান্য ফেরাউনদের চেয়ে ভিন্ন ছিল। এই ফেরাউন একজন স্রষ্টায় বিশ্বাসের পক্ষপাতী ছিল। আর তাই সে আমনের (Ammon)-এর যাজকদের পক্ষ থেকে বড় ধরনের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এই যাজকরা বহু ঈশ্বরবাদী ধর্ম

হতে লাভবান হচ্ছিল আর কিছু সৈন্যও তাদের সমর্থন করত। সেজন্য অবশেষে এই ফেরাউন নিহত হয়। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে ক্ষমতায় উঠে আসা এই ফেরাউনই হল আমেনহোটেপ-৪।

খ্রিস্টপূর্ব ১৩৭৫ সনে আমেনহোটেপ-৪ যখন সিংহাসনে বসে, তখন শতাব্দীকাল স্থায়ী রক্ষণশীলতা ও ঐতিহ্য অনুরাগের সম্মুখীন হতে হয় তাকে। তখনও পর্যন্ত সমাজের গঠন ও রাজপ্রাসাদের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক কোন রকম পরিবর্তন ছাড়াই চলে আসছিল। সবধরনের বাহ্যিক ঘটনাসমূহ ও ধর্মীয় নব ধারণা থেকে সমাজ তার সব দুয়ার বন্ধ করে রেখেছিল। আমরা পূর্বে যেমন ব্যাখ্যা করেছি সেভাবেই, মিসরের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থাদির কারণেই এই অতিমাত্রার সংরক্ষণশীলতার জন্ম হয়েছিল, যা-কিনা গ্রীক পর্যটকগণ কর্তৃকও উল্লেখ রয়েছে। জনগণের উপর ফেরাউন কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া এ ধর্মের জন্য দরকার ছিল পুরনো ও ঐতিহ্যগত সবকিছুর উপর মানুষের নিঃশর্ত বিশ্বাস।

আমেনহোটেপ-৪

ঐতিহাসিক আর্নস্ট গমব্রিচ লিখেন

যুগ যুগ পুরনো ঐতিহ্য কর্তৃক পবিত্র বলে গণ্য বহু সামাজিক প্রথা সে পরিত্যাগ করে। সে তার জনগণের অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট দেবতাগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে চায়নি। তার জন্য একজন দেবতা, "এটনের", স্থান ছিল সর্বোচ্চ। এটনের আরাধনা সে করত, যাকে সে সূর্যের আকৃতিতে রূপ দিয়েছিল। সে তার দেবতার নামানুসারে নিজেকে "আমেনহোটেপ" বলে ডাকত। আর সে তার কর্মশালা কোর্টকে অন্যান্য দেবতাসমূহের পূজারী পুরোহিতদের নাগালের বাইরে এনে অন্য একটি স্থানে সরিয়ে নিয়ে যায়, যে স্থানটি আজ আল-আমারনাহ নামে অভিহিত।[৩৪]

আমেনহোটেপ-৪ তার পিতার মৃত্যুর পর বড় ধরনের চাপের মুখোমুখি হয়। সে মিশরের ঐতিহ্যগত বহু ঈশ্বরবাদী ধর্মকে পরিবর্তন করে একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্মের অবতারণা করে; আর সব ক্ষেত্রে সর্বত্র আমূল পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালায়। এ ঘটনাগুলো তার উপর নিপীড়ন বয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু থিব্‌সের নেতারা তাকে এই নতুন ধর্ম প্রচারের অনুমতি দেয়নি। তাই আমেনহোটেপ তার লোকজনকে নিয়ে থিব্‌স নগরী থেকে সরে আসে ও "তেল-আল-আমারনা"-তে বসতি স্থাপন করে। এখানে এসে তারা "আখ-এট এটন" নামে একটি নতুন ও আধুনিক নগরী স্থাপন করে। আমেনহোটেপ তার পূর্বের এই নাম (যার অর্থ হল "আমনের সন্তুষ্টি") বদলে নতুন নাম "আখ-এন-এটন" রাখে, এই নামটির অর্থ হল, "এটনের বশীভূত"। 'আমন" হল একটি নাম যা মিসরের বহু ঈশ্বরবাদে সবচাইতে গুরুত্বের অধিকারী টোটেমকে দেয়া হয়েছিল। আমেনহোটেপের মতে, "এটনই" হলেন স্বর্গ ও মর্ত্যের সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহর সঙ্গে সমান বিবেচনাযোগ্য যার নাম।

এসব ঘটনার সর্বশেষ পর্যায়ে আমেনের পুরোহিতরা নিজেদেরকে বিঘ্নিত বলে অনুভব করল। তারা তখন দেশে অর্থনৈতিক সংকটাবস্থার সুযোগ নিয়ে আখেনাটনের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে চাইল। অবশেষে আমেনাটন ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা বিষ প্রয়োগে নিহত হয়, পরবর্তী ফেরাউনরা পুরোহিতদের প্রভাবের অধীনে অত্যন্ত সাবধানে থাকত।

আমেনাটনের পরে, সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ফেরাউনরা ক্ষমতায় আসে। এর ফলে আবার পুরনো ঐতিহ্যগত বহু ঈশ্বরবাদ চারদিকে বিস্তার লাভ করে এবং তারা অতীতে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। প্রায় এক শতাব্দী পর, মিসরের ইতিহাসে সবচাইতে দীর্ঘ সময় ধরে শাসন ক্ষমতায় ছিল যে ফেরাউন, সেই রামসেস-২, সিংহাসনে বসে। বহু ঐতিহাসিকের মতে এই রামসেস-২ হল সেই ফেরাউন, যে বনী ইসরাঈলদের উপর নিদারুণ নির্যাতন চালিয়েছিল ও মূসার সঙ্গে যুদ্ধে রত হয়েছিল।[৩৫]

মূসা নবীর আবির্ভাব

গভীর গোঁড়ামিতে নিমগ্ন থাকার ফলে প্রাচীন মিসরীয়রা তাদের পৌত্তলিক বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করতে পারত না। একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার বার্তা নিয়ে কিছু লোক তাদের কাছে এসেছিল, কিন্তু ফেরাউনের লোকেরা সর্বদা তাদের বিকৃত বিশ্বাসের দিকেই ফিরে যেত। অবশেষে আল্লাহ কর্তৃক মূসা (আঃ) তাদের প্রতি রাসূল হিসেবে প্রেরিত হন। মূসা (আঃ) যে দুটি কারণে আসেন তাহল যে, তারা সত্যধর্মের পরিবর্তে মিথ্যাবাদের এক ধর্মকে গ্রহণ করে নিয়েছিল; আর তারা বনী ইসরাঈলদের ক্রীতদাসেও পরিণত করেছিল। মূসা (আঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তিনি যেন মিসরবাসীকে সত্যধর্মের আমন্ত্রণ জানান এবং বনী ইসরাঈলদের ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত করে সঠিক পথে নিয়ে আসেন।

পবিত্র কোরআনে তা এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

> "আমি আপনার নিকট মূসা ও ফেরাউনের কিছু কাহিনী যথাযথভাবে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছি তাহাদের জন্য যাহারা ঈমান রাখে। ফেরাউন ভূভাগের মধ্যে অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছিল এবং সে তথাকার অধিবাসীগণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একদলের শক্তি খর্ব করিয়া (বনী ইসরাঈলের) রাখিয়াছিল, তাহাদের পুত্রসন্তানদের হত্যা করাইতেছিল এবং নারীদের (কন্যাদের) জীবিত থাকিতে দিত। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল বড় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।
>
> আর আমার স্পৃহা ছিল এই যে, ভূভাগে যাহাদের ক্ষমতা খর্ব করা হইতেছিল তাহাদের প্রতি (পার্থিব ও দ্বীনি বিষয়ে) আমি অনুগ্রহ করি, আর তাহাদিগকে নেতা বানাইয়া দেই ও তাহাদের দেশের মালিক বানাইয়া দেই এবং ফেরাউন, হামান এবং তাহাদের অনুসারীদেরকে তাহাদের (বনী ইসরাঈলের) পক্ষ হইতে সে ঘটনাবলী দেখাইয়া দেই যাহা হইতে তাহারা আত্মরক্ষা করিতেছিল।"

— সূরা ক্বাসাস ঃ ৩—৬

ফেরাউন বনী ইসরাঈলদের সংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে চেয়েছিল; আর তাই সে তাদের সকল নবজাতক পুত্রসন্তানদের হত্যা করে ফেলত। আর এ কারণেই মূসা (আঃ)-এর মাতা অন্তরবাণী মারফত আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে তাঁকে একটি বাক্সে পুরে নদীতে ভাসিয়ে দেন। আর এ পথেই তিনি ফেরাউনের প্রাসাদে নীত হন। এই বিষয়টির উপর পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো হল নিম্নরূপ ঃ

আর আমি মূসার মাতার প্রতি অন্তরবাণী করিলাম যে, "তুমি তাহাকে দুধপান করাইতে থাক, বস্তুত তাঁহার সম্বন্ধে যদি তোমার কোন আশংকা হয়, তখন তাঁহাকে (নির্বিঘ্নে) সাগরে ফেলিয়া দিবে, আর তুমি (ইহাতে) না (ডুবিয়া যাওয়ার) কোন ভয় করিবে, আর না (বিরহের) কোন চিন্তা করিবে; আমি অবশ্যই তাঁহাকে তোমার নিকট ফেরত দিব এবং তাঁহাকে নবী বানাইব।"

অনন্তর ফেরাউনের লোকেরা মূসাকে (সিন্দুকসহ) উঠাইয়া লইল, যেন তিনি তাহাদের জন্য শত্রু ও উদ্বিগ্নের কারণ হন।

নিশ্চয়ই ফেরাউন, হামান ও তাঁহাদের অন্যান্য অনুসারীরা (এই বিষয়ে) বিরাট ভুল করিয়াছিল।

আর ফেরাউনের বিবি (আছিয়া ফেরাউনকে) বলিল, "ইহা আমার ও তোমার নয়ন শীতলকারী, ইহাকে হত্যা করিও না। বিচিত্র নয় যে, (বড় হইয়া) আমাদের কোন উপকার সাধন করিবে; অথবা আমরা তাহাকে পুত্র বানাইয়া লইব"; অথচ তাহাদের নিকট (পরিণামের) খবর ছিল না।

—সূরা ক্বাসাস ঃ ৭—৯

ফেরাউনের স্ত্রী মূসা (আঃ)-কে হত্যা থেকে নিবৃত্ত করলেন ও তাঁকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করলেন। ফেরাউনের প্রাসাদেই মূসা (আঃ)-এর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। আল্লাহ তায়ালার সহায়তায় তাঁর আপন মা'কেই ধাত্রী হিসেবে ফেরাউনের প্রাসাদে আনা হয়েছিল।

তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর একদিন দেখলেন যে, বনী ইসরাঈলের এক লোক মিসরীয় এক লোকের হাতে নির্যাতিত হচ্ছে, তখন সেখানে মধ্যস্থতা করতে গিয়ে মূসা (আঃ) মিসরীয় লোকটিকে একটি ঘুষি মারলেন আর তাতেই সেই লোক মৃত্যুবরণ করল। যদিও এটা সত্য যে, তিনি ফেরাউনের প্রাসাদে বাস করে আসছিলেন আর রানী তাঁকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিল, এসব সত্ত্বেও নগর প্রধানরা সিদ্ধান্ত নিল যে, তাঁর শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। আর তা শুনে মূসা (আঃ) মিসর থেকে পালিয়ে গিয়ে মাদায়েনে আসলেন। সেখানে তাঁর অবস্থান কালের শেষদিকে আল্লাহ সরাসরি তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করলেন ও তাঁকে নবীত্ব দান করলেন। তিনি ফেরাউনের কাছে ফিরে গিয়ে তার কাছে আল্লাহর ধর্মের বাণী পৌছে দিতে আদিষ্ট হলেন।
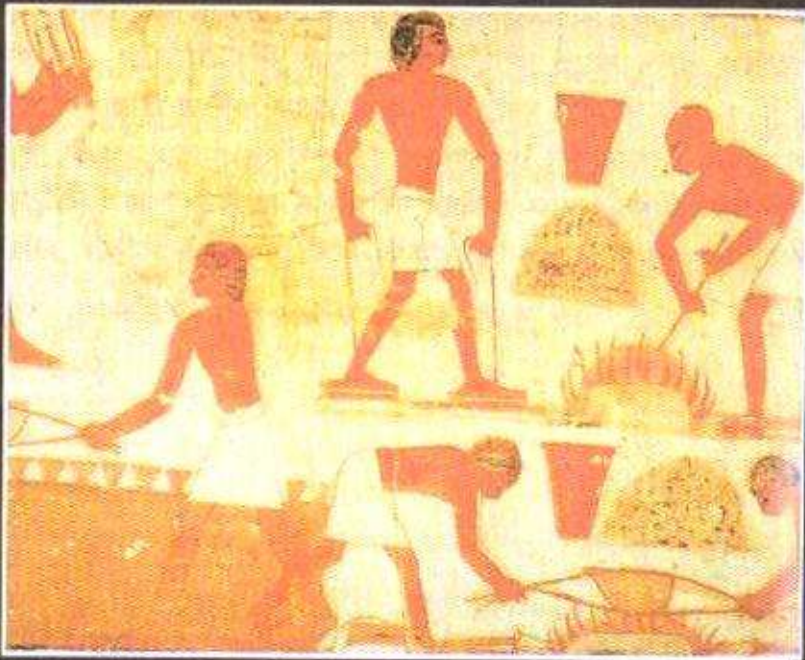
ক্রীতদাসগণ যাদের প্রতি ফেরাউন অবিচার করত। বিশেষ করে নতুন রাজ্যের যুগে দেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বিশাল নির্মাণকার্যে নিয়োগ করা হত। বনী ইসরাঈলগণ ছিল এই সংখ্যালঘুদেরই একটি অংশ। উপরের প্রথম চিত্রটিতে, একটি মন্দির নির্মাণকার্যে যেসব দাসদের দেখা যাচ্ছে তারা খুব সম্ভবত বনী ইসরাঈলরাই হবে। নিচের চিত্রে নির্মাণ প্রকল্প শুরু করার আগে প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি নেয়ার চিত্র ধারণ করা হয়েছে। তাদেরকে বনী ইসরাঈলই মনে করা হয়। দাসরা আগুনে কাদা পুড়িয়ে ইট তৈরি করছে এবং চুন-সুরকির মিশ্রণ তৈরি করছে
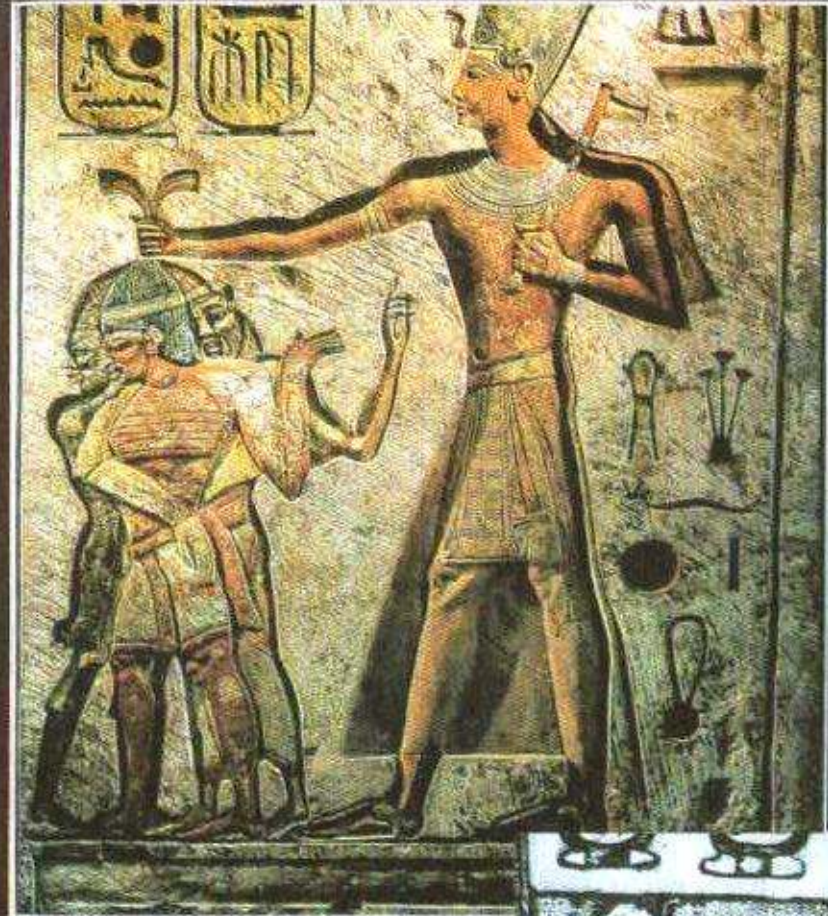
অনেক ঐতিহাসিকের মতে কোরআনে বর্ণিত সেই ফেরাউন, রামসেস দুইকে দেখা যাচ্ছে ধৃত কিছু দাসকে সে হত্যা করছে

ছবিগুলো থেকে প্রকাশ পাচ্ছে যে, ফেরাউনরা নিজেদেরকে আদর্শে পরিণত করত এবং নিজেদেরকে যোদ্ধা হিসেবে চিত্রিত করত। তাদেরকে উপস্থাপিত করা হত লম্বা ও চওড়া কাঁধওয়ালা বীর হিসেবে যারা কি-না একাধারে বহু সংখ্যক লোককে কাবু করতে পারত

উপরে ঃ যেহেতু ফেরাউনরা নিজেদের স্বর্গীয় সত্তা হিসেবে দেখত, তারা অন্যান্য সকল লোকের চাইতে নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার চেষ্টা করত
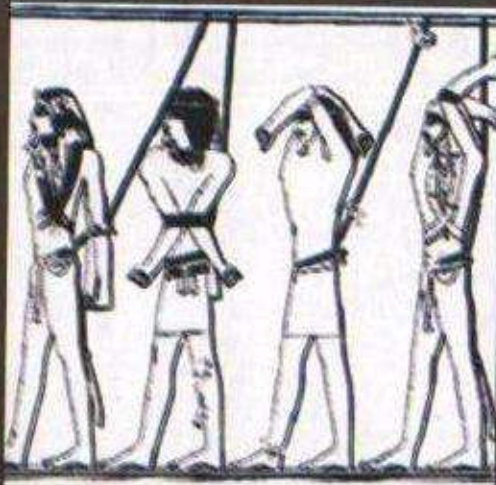
নিচে ঃ মিসরীয়দের দ্বারা গ্রেফতারকৃত যুদ্ধবন্দীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হওয়ার জন্য অপেক্ষমান দেখা যাচ্ছে

ফেরাউনের প্রাসাদ

আল্লাহ তায়ালার আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) ফেরাউনের কাছে গিয়ে তাকে সত্যধর্মের বার্তা পৌঁছালেন। তাঁরা ফেরাউনকে বললেন সে যেন বনী ইসরাঈলের উপর নিপীড়ন বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে মূসা ও হারুন (আঃ)-এর সঙ্গে যেতে দেয়। যে মূসা (আঃ)-কে ফেরাউন বছরের পর বছর নিজের কাছে রেখেছে, সিংহাসনে ফেরাউনের উত্তরাধিকার হবার কি-না যাঁরই সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা ছিল, সেই মূসা তার সামনে উঠে দাঁড়িয়ে এমনভাবে কথা বলছে, এ যেন ফেরাউনের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। সে কারণেই ফেরাউন মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে অকৃতজ্ঞ হওয়ার অভিযোগ আনল।

> ফেরাউন বলিল, "তোমাকে কি শৈশবকালে আমরা প্রতিপালন করি নাই? এবং তুমি তোমার জীবনের বহু বৎসর আমাদের মধ্যে বসবাস করিয়াছ, আর তুমি তো সেই কর্ম ও (কিবতীকে হত্যা) করিয়াছিলে, যাহা করিয়াছিলে বস্তুত তুমি বড় অকৃতজ্ঞ।"
>
> — সূরা আশ-শুয়ারা ঃ ১৮—১৯

ফেরাউন, মূসা (আঃ)-এর আবেগ অনুভূতি নিয়ে খেলা করার ও তাঁর বিবেকের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছিল। সে যেন এটাই বলতে যাচ্ছিল যে যেহেতু সে এবং তার স্ত্রীই মূসা (আঃ)-কে লালন-পালন করে বড় করেছে সেহেতু মূসারই উচিত তাদের মান্য করা। তার উপর মূসা (আঃ) একজন মিসরীয় লোককে খুনও করেছিলেন। মিসরীয়দের মতে এসব কাজের জন্য তাঁর গুরুতর শাস্তি হওয়া দরকার। ফেরাউন যে আবেগময় পরিবেশের সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল তা তার জনগণের নেতাদের প্রভাবান্বিত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল, যেন তারাও সবাই ফেরাউনের সঙ্গে একমত হয়ে যায়।

অন্যদিকে মূসা (আঃ) কর্তৃক ঘোষিত সত্যধর্মের বার্তাও ফেরাউনের ক্ষমতাকে খর্ব করে তাকে সাধারণ জনগণের সারিতে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে এটা উন্মোচিত বা ফাঁস হয়ে যাবে যে সে ঈশ্বর বা দেবতা নয় আরও অধিকন্তু সে মূসা (আঃ)-কে মানতে বাধ্য হবে। তাছাড়া সে যদি বনী ইসরাঈলদেরকে মুক্ত করে দেয় তবে সে বেশ কিছু সংখ্যক অতীব প্রয়োজনীয় জনশক্তি হারিয়ে বসবে; আর এভাবে সে সাংঘাতিক এক দুর্দশায় পতিত হতে পারে।

এ সমস্ত কারণে ফেরাউন মূসা (আঃ)-এর কথাগুলো পর্যন্ত শুনল না। সে তাঁকে নিয়ে হাসি-তামাশা করতে চাইল আর অর্থহীন নানা ধরনের প্রশ্ন করে বিষয়টি বদলানোর প্রয়াস চালাল। একই সময়ে সে মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ)-কে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী বলে দেখাতে চেষ্টা করল এবং তাদেরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত বলে অভিযুক্ত করল। সবশেষে, একমাত্র যাদুকরগণ ছাড়া, না ফেরাউন কিংবা না তার ঘনিষ্ঠবর্গরা মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ)-কে মেনে নিল। তারা তাদের প্রতি প্রদর্শিত সত্যধর্মকে অনুসরণ করল না। তাই আল্লাহ সর্বপ্রথম তাদের উপর কিছু দুর্যোগাবলী প্রেরণ করলেন।
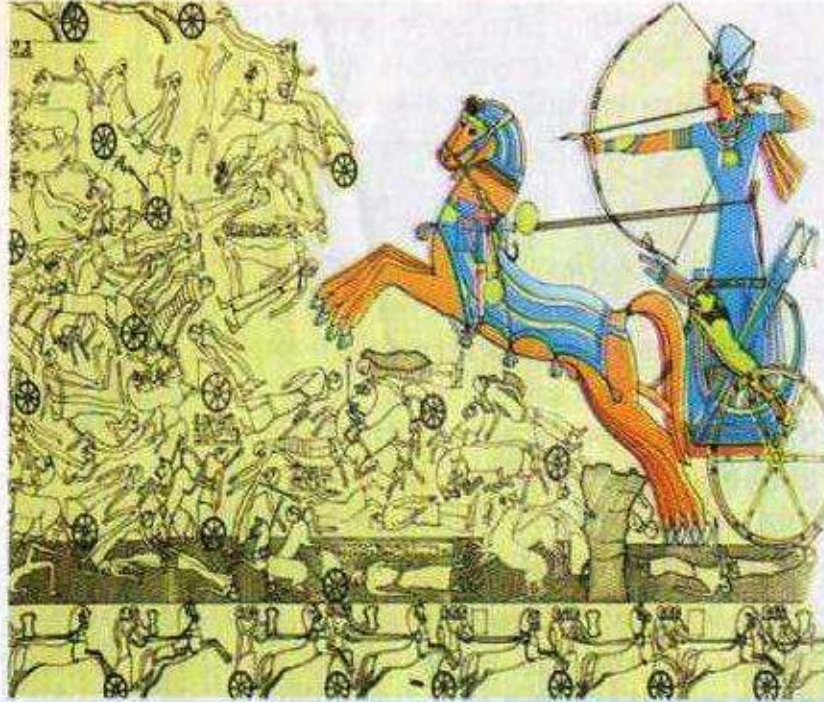
রামসেস-২-কে তার যুদ্ধরথীতে করে শত্রুদের একটি বিরাট দলকে পিছু হটিয়ে দিতে দেখা যাচ্ছে। ঠিক অন্যান্য বহু নেতার মত ফেরাউন তার চিত্রকরদের দিয়ে এই কাল্পনিক দৃশ্যাবলী আঁকিয়েছিল
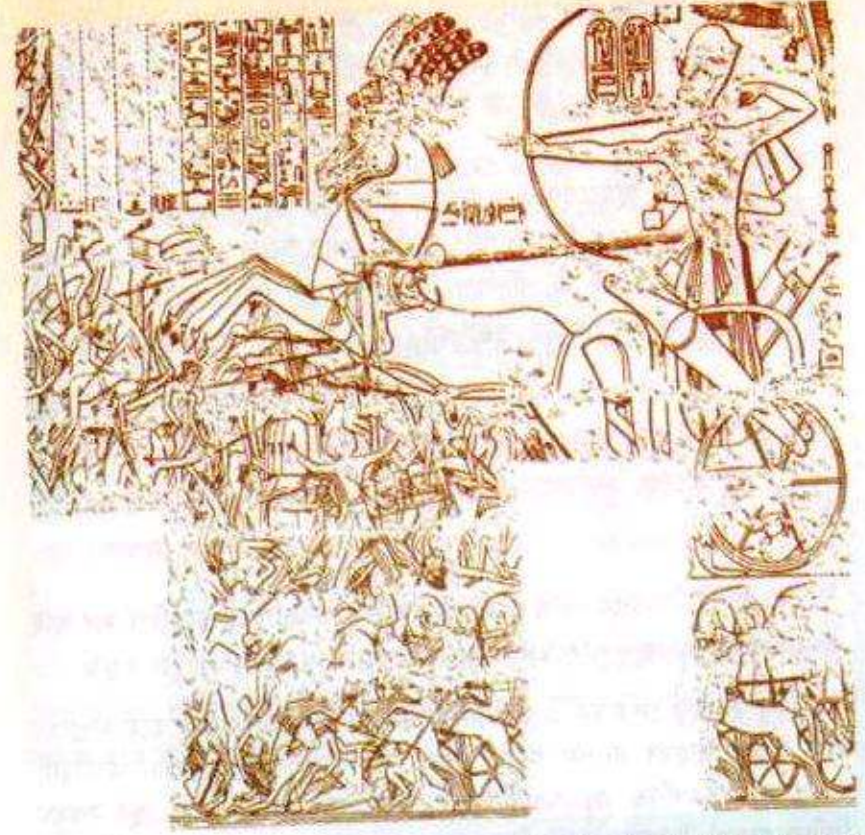
কাদেশের যুদ্ধ। মিসরের ইতিহাসে রামসেস-২ ও হিট্টিসের মাঝে সংঘটিত এই যুদ্ধটি প্রতারণামূলকভাবে ফেরাউনের মহান বিজয় বলে বিবৃত হয়ে আসছিল। প্রকৃতপক্ষে, এ যুদ্ধে ফেরাউন ঠিক শেষ মুহূর্তে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল এবং তাকে তখন শান্তি চুক্তি করতে হয়েছিল

ফেরাউন ও তার উপর যেসব দুর্যোগাবলী নেমে এসেছিল

ফেরাউন ও তার পরিষদ তাদের "পূর্বপুরুষদের ধর্ম" বলে কথিত বহু ঈশ্বরবাদ ও পৌত্তলিকতায় এমনি গভীরভাবে নিমগ্ন ছিল যে, তারা কখনও তা পরিত্যাগ করার কথা বিবেচনাই করত না। এমনকি মূসা (আঃ)-এর হাত সাদা হয়ে বের হয়ে আসা ও তাঁর লাঠির সাপে পরিণত হওয়া — বহু অলৌকিক ব্যাপারের মাঝে এ দুটি প্রধান ব্যাপার ও তাদেরকে কুসংস্কার হতে সরিয়ে আনার ব্যাপারে যথেষ্ট ছিল না। উপরন্তু, তারা তাদের কুসংস্কারকে খোলাখুলি প্রকাশ করতে লাগল।

তাহারা বলিল, "যত চমকপ্রদ বিষয়ই আমাদের সকাশে আনয়ন কর যদ্দ্বারা আমাদের উপর যাদু পরিচালনা কর। তবুও আমরা তোমাদের কথা কখনও মানিব না।"

— সূরা আরাফ ঃ ১৩২

তাদের এমন আচরণের জন্য আল্লাহ তাদের উপর "পৃথক পৃথক অলৌকিক ঘটনাবলী হিসেবে" বেশ কিছু সংখ্যক দুর্যোগ প্রেরণ করেন যেন তারা পরকালের অনন্ত শাস্তি আসার পূর্বেই এই পৃথিবীতে কিছু শাস্তির স্বাদ ভোগ করতে পারে। এদের মাঝে প্রথমটি ছিল অনাবৃষ্টি এবং শস্যাভাব। এই ব্যাপারটি সম্পর্কে কোরআনে লেখা আছে,

"আমি ফেরাউনের লোকদের বছরব্যাপী অনাবৃষ্টি ও ফসলের স্বল্পতার শাস্তি ভোগ করাইলাম যাহাতে তাহারা সত্য কথা উপলব্ধি করে।"

— সূরা আ'রাফ ঃ ১৩০

মিসরীয়রা নীলনদকে ভিত্তি করেই তাদের কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল আর তাই তারা প্রাকৃতিক অবস্থায় পরিবর্তন দিয়ে প্রভাবিত হত না।

কিন্তু যেহেতু ফেরাউন ও তার নিকটতম বন্ধু-বান্ধবেরা গর্বিত হয়ে আল্লাহর প্রতি উদ্ধত আচরণ প্রদর্শন করছিল এবং তাঁর রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেজন্যে অনাকাংখিত এক মহাদুর্যোগ তাদের উপর নেমে আসে। খুব সম্ভবত বিভিন্ন কারণে নীলনদের পানি সীমা অনেক নিচে নেমে যায় আর এই নদী থেকে বয়ে যাওয়া সেচ খালগুলো কৃষিজ এলাকাগুলোতে পরিমাণমত পানি বয়ে নিয়ে যেতে পারছিল না। আর চরম উষ্ণ তাপমাত্রায় ফসলসমূহ শুকিয়ে যাচ্ছিল। এভাবে এক অনভিপ্রেত দিক থেকে অর্থাৎ যে নীলনদের উপরই তারা নির্ভরশীল ছিল সেই নীলনদ থেকেই ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের উপর দুর্যোগ নেমে আসে। এই অনাবৃষ্টি ও শুষ্কতা ফেরাউনকে আতংকিত করে তুলল, যে কি-না পূর্বে তার জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলত, আর ফেরাউন নিজের জাতির মধ্যে ঘোষণা করাইয়া এ কথা বলিল ঃ

"হে আমার জাতি! মিশরের রাজত্ব কি আমার নহে, এবং এই প্রস্রবণসমূহ আমার (প্রাসাদের) পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তোমরা কি দেখিতেছ না ?"

— সূরা যুখরুফ ঃ ৫১

যাই হোক, আয়াতসমূহে যেমন প্রদর্শিত হয়েছে ঠিক তেমনভাবেই কর্ণপাত করার পরিবর্তে তারা যা-কিছু ঘটছিল সে ব্যাপারে এ বক্তব্যই তুলে ধরল যে মূসা ও বনী ইসরাঈলদের দ্বারাই এই সমস্ত দুর্ভাগ্যসমূহ আনীত হয়েছে।

তারা তাদের কুসংস্কার ও পূর্বপুরুষদের ধর্মের কারণে এ ধরনের নানা অভিযোগ তুলেই পার হয়ে যেতে চাইল। এ কারণে তারা চরম বিপদ-আপদে কষ্ট করে যাওয়ার পথই বেছে নিল; কিন্তু তাই বলে, শুধু এ সব কিছুতেই তাদের উপর আপতিত দুর্যোগ সীমাবদ্ধ রইল না। এটা ছিল কেবল শুরু। পরবর্তীতে আল্লাহ তাদের উপর ধারাবাহিকভাবে নানা ধরনের দুর্যোগ প্রেরণ করতে থাকেন। নিম্নে পবিত্র কোরআনে দুর্যোগগুলোর কথা এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"অতএব আমি তাহাদের প্রতি তুফান বা ঝড় প্রেরণ করিলাম এবং পঙ্গপাল ও উকুন আর ভেক ও রক্ত, যাহা স্পষ্ট মোযেজাই ছিল; অনন্তর তাহারা তবুও অহংকারই করিতে থাকে এবং তাহারা ছিলও অপরাধপরায়ণ জাতি।"

— সূরা আরাফ ঃ ১৩৩

আল্লাহ তায়ালা ফেরাউন ও তার জনগণের উপর যে দুর্যোগসমূহ প্রেরণ করেন যেগুলো ওল্ড টেস্টামেন্টেও বর্ণিত আছে এবং এই বর্ণনাসমূহ পবিত্র কোরআনের বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আর মিসরের স্থলভাগে সর্বত্র ছিল রক্ত আর রক্ত।

— এক্সোডাস ৭ ঃ ২১

আর দেখ তুমি যদি (তাদের) যেতে দিতে অস্বীকার কর, তবে আমি তোমার চারিদিকে সর্বত্র ব্যাঙ দিয়ে আঘাত হানব। নদী প্রচুর পরিমাণ ব্যাঙ উৎপন্ন করবে যেগুলো উপরে উঠে গিয়ে তোমাদের বাসায়, শয়নকক্ষে, তোমাদের বিছানায়, তোমাদের দাসদের ঘরে, তোমাদের জনগণের কাছে, তোমাদের চুল্লীতে আর ময়দা মাখানোর পাত্রে আশ্রয় নিবে।

— এক্সোডাস ৮ ঃ ২-৩

আর প্রভু মূসাকে বললেন, "হারুনকে বল, তোমার লাঠিকে বাড়িয়ে দাও এবং ধূলিতে আঘাত কর, যেন মিসরের সর্বত্র উকুনে ভরে যায়।"

— এক্সোডাস ৮ ঃ ১৬

আর মিশরের সর্বত্র পঙ্গপালের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল আর সেগুলো মিসরের পুরো উপকূলীয় এলাকায় গিয়ে অবস্থান নিল; ভীষণ ছিল (এরা); পূর্বে কখনও তারা এমন পঙ্গপাল দেখেনি, না তাদের পরে কখন এমন হবে।

— এক্সোডাস ১০ ঃ ১৪

তখন যাদুকরগণ ফেরাউনকে বলল, এতে আল্লাহ তায়ালার হাত রয়েছে। ফেরাউনের হৃদয় আরো কঠিন হল, ঈশ্বর যেমন বলেছিলেন, ঠিক তেমনি সে তাদের কথায় কর্ণপাত করেনি।

— এক্সোডাস ৮ ঃ ১৯

ফেরাউন ও তার নৈকট্যবান পরিষদের উপর ভয়ানক সব দুর্যোগসমূহ ঘটে যাচ্ছিল। এই পৌত্তলিক লোকেরা যেসব বস্তুকে দেবতা বলে পূজা করত সেসব বস্তুই কিছু কিছু দুর্যোগের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

উদাহরণস্বরূপ নীলনদ ও ব্যাঙসমূহ তাদের কাছে পবিত্র বস্তু ছিল এবং এগুলোকে তারা দেবতার আসনে স্থান দিয়েছিল। যেহেতু তারা তাদের এসব দেবতা থেকে পথনির্দেশ পাওয়ার আকাংখা করত ও সাহায্যের জন্য তাদেরই ডাকত তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের নিজেদের "দেবতাসমূহ" দিয়েই তাদের শাস্তি দিলেন যেন তারা নিজেদের ভুল ধরতে পারে আর তাদের কৃত পাপের মাশুল দিতে পারে।

ওল্ড টেস্টামেন্টের ব্যাখ্যাকারীদের মতে "রক্ত" শব্দটি হল, নীলনদের পানি রক্তে পরিণত হওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শব্দ। নীলনদের পানি কঠিন হয়ে রক্তবর্ণ ধারণ করায় এই উপমা দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোন এক ব্যাখ্যা অনুসারে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া নীলনদের পানিকে লালবর্ণে রঙ্গিন করে তুলেছিল।

মিসরীয়দের জীবন ধারণের প্রধান উৎস ছিল নীলনদ। আর এই নদের যেকোন ধরনের ক্ষতি হওয়ার মানেই ছিল পুরো মিসরের মৃত্যুর সমান।

ব্যাকটেরিয়া যদি নীলনদকে পুরোপুরি আচ্ছাদিত করে ফেলত যার ফলে নীলনদের পানি লালবর্ণ ধারণ করেছিল, তাহলে তো এই পানির উপর নির্ভরশীল সব জীব সংক্রমিত হওয়ার কথা।

পানির লালবর্ণ ধারণের কারণসমূহের সাম্প্রতিক ব্যাখ্যা হল যে, প্রোটোজোয়া, যোপ্লেঙ্কটন, লোনা ও স্বাদু পানির শৈবাল (ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন) ফুল, ডাইনোফ্ল্যাজেলেটগুলোই ছিল এর কারণ। এসব বিভিন্ন রকম ছত্রাক কিংবা প্রোটোজোয়া জাতীয় ফুল, গাছ, পানি থেকে অক্সিজেন দূর করে আর তাতে মাছ ও ব্যাঙ উভয়ের জন্য ক্ষতিকর বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে।

ন্যাশনাল মেরিন ফিশারিজ সার্ভিস থেকে প্যাট্রিসিয়া এ টেস্টার নিউইউয়র্ক একাডেমী অব সায়েন্স-এর বর্ষপঞ্জী লেখার উদ্দেশ্যে বাইবেলের এক্সোডাসের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে খেয়াল করেন যে, প্রায় ৫০০০ জানা ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন প্রজাতির মধ্যে ৫০টিরও কম প্রজাতি হল বিষাক্ত, আর এই বিষাক্ত প্রজাতিগুলো জলজ জীবের জন্য মারাত্মক হতে পারে। একই প্রকাশনায় হেলথ কানাডার ইউয়েন সি. ডি. ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক ডাটার উল্লেখ করতে গিয়ে নির্দিষ্ট এক ধরনের প্রায় ২ ডজন ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের উদ্ধৃতি দেন যেগুলো বিশ্ব জুড়ে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায়।

ডব্লিউ. ডব্লিউ. কারমাইকেল এবং আই. আর. ফেলকনার স্বাদু পানির নীল-সবুজ শৈবালজনিত রোগগুলোর তালিকা প্রস্তুত করেন। নর্থ কেরোলিনা স্টেট ইউনিভার্সিটির একোয়াটিক ইকোলজিস্ট জন এম. বার্কহলডার এক প্রকার ডাইনোফ্ল্যাজেল্যাট, ফিয়েসটেরিয়া পিসকিমোরটি (মোহনার পানিতে প্রাপ্ত) এর বর্ণনা দেন যা-কিনা মাছসমূহের মৃত্যু ঘটাতে সক্ষম।

ফেরাউনের সময়কালে এই ধরনের দুর্যোগসমূহের ঘটনা একটার পর একটা ধারাবাহিকভাবে ঘটেই যাচ্ছিল বলে মনে হয়। এই ঘটনা পরম্পরা অনুসারে, যখন নীলনদের পানি দূষিত হয়েছিল তখন মাছসমূহ মরে যেতে থাকে, তারই সঙ্গে মিসরীয়রা পুষ্টির এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস থেকে বঞ্চিত হয়।

শিকারী মাছগুলো না থাকায় প্রথমত ব্যাঙগুলো পুকুর ও নীলনদ উভয় স্থানেই নির্বিঘ্নে বংশ বৃদ্ধি করতে থাকে। ফলে নীলনদের পানিতে এদের সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। অবশেষে এরা অক্সিজেনবিহীন বিষাক্ত আর পঁচা পরিবেশ ছেড়ে স্থলভাগে পালিয়ে যেতে থাকে। এভাবে তারা স্থলভাগেও মাছের সঙ্গে মরতে ও পঁচতে শুরু করে। নীলনদ ও তৎসংলগ্ন স্থলভাগগুলো হতে থাকে দুর্গন্ধময় আর পানি পান করা ও গোসল করা অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। অধিকন্তু ব্যাঙ প্রজাতিসমূহের বিলুপ্তির ফলে পঙ্গপাল আর উকুনসমূহ সংখ্যাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পরিশেষে, যেভাবেই দুর্যোগসমূহ ঘটে থাকুক কিংবা এর ফলে যে পরিমাণ প্রভাবই তাদের উপর পড়ে থাকুক না কেন, এতে করে না ফেরাউন কিংবা না তার জনগণ কর্ণপাত করেছিল কিংবা না আল্লাহর পানে মুখ ফিরিয়েছিল বরং তারা আরো বেশি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেই যেতে লাগল।

ফেরাউন ও তার ঘনিষ্ঠজনরা এমনি ভণ্ড প্রকৃতির ছিল যে, তারা মূসা (আঃ) ও আল্লাহকে প্রতারিত করতে পারবে বলে ভাবত। ভয়ংকর শাস্তিসমূহ যখন তাদের উপর আপতিত হত তখন তারা মূসা (আঃ)-কে ডেকে অনুনয় করত তিনি যেন তাদেরকে এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেন।

আর তাহাদের প্রতি যখন কোন আযাব আপতিত হইত তখন তাহারা এইরূপ বলিত, "হে মূসা! আমাদের জন্য আপন প্রভু সকাশে সেই বিষয়ের দোয়া করুন যে সম্বন্ধে তিনি আপনার নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়া রাখিয়াছেন, আপনি যদি আমাদের হইতে এই আযাব বিদূরিত করিয়া দেন, তবে আমরা নিশ্চয়ই আপনার কথায় ঈমান আনিব এবং বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দিয়া আপনার সঙ্গে যাইতে দিব।"

অতএব যখন তাহাদের হইতে সেই আযাব এক বিশেষ সময় পর্যন্ত- যে পর্যন্ত তাহাদের উপনীত হওয়া অনিবার্য ছিল — দূরীভূত করিয়া দিতাম, তখন তাহারা সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াদা ভঙ্গ করা আরম্ভ করিত।

— সূরা আরাফ ঃ ১৩৪—১৩৫

মিসর থেকে বনী ইসরাঈলীদের দলবদ্ধ প্রস্থান

আল্লাহ তায়ালা, মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে ফেরাউন ও তার নৈকট্যবর্গকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে কোন কোন বিষয়ে তাদের কর্ণপাত করা উচিত; আর এভাবেই তিনি তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন। উত্তরে তারা বিরোধিতা করল এবং মূসা (আঃ) একজন উন্মাদ ও অসত্য — এসব অভিযোগ করে যেতে লাগল। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য অবমাননাকর পরিণতির প্রস্তুতি নিলেন। এরপর কি কি ঘটতে যাচ্ছে এ সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা মূসা (আঃ)কে অবহিত করলেন।

আর আমি মূসার প্রতি আদেশ পাঠাইলাম যে, "আমার এই বান্দাদের তুমি রাতারাতি মিসর হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাও, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হইবে।"

ফেরাউন তাহার পশ্চাদ্ধাবনে নগরে নগরে লোক সংগ্রহকারীদের পাঠাইল (এই বলিয়া যে) ইহারাও (বনী ইসরাইল) একটি ক্ষুদ্র দল এবং তাহারা আমাদের অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেক ঘটাইয়াছে; অথচ আমরা সকলে একটি সুসংঘটিত দল। মোট কথা আমি তাহাদিগকে বাগান হইতে এবং প্রস্রবণ হইতে, ধনভাণ্ডার হইতে এবং সুরম্য অট্টালিকা হইতে বাহির করিয়া আনিলাম; (আমি তাহাদের সঙ্গে) এইরূপ করিলাম, আর তাহাদের পরে বনী ইসরাঈলকে তাহাদের মালিক বানাইয়া দিলাম।

তাহারা (একদিন) সূর্যোদয়কালে উহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল, অতঃপর উভয় দল যখন (সন্নিকট হইয়া) পরস্পরকে দেখিতে পাইল, তখন মূসার সঙ্গীগণ বলিতে লাগিল, "(হে মূসা!) আমরা তো হাতেই আসিয়া গেলাম।"

— সূরা আশ-শুআরা ঃ ৫২—৬১

ঠিক এমনি পরিস্থিতিতে, যখন বনী ইসরাঈলরা ভাবল যে তারা ধরা পড়ে যাচ্ছে আর ফেরাউনের লোকরা ভাবল যে তারা তাদেরকে ধরে ফেলতে যাচ্ছে, তখন মূসা (আঃ) আল্লাহর প্রতি একটুও বিশ্বাস না হারিয়ে বললেন,

"কিছুতেই নয়, আমার সঙ্গে আমার প্রভু আছেন, তিনি এখনই আমাকে পথ দেখাইবেন।"

— সূরা আশ-শুআরা ঃ ৬২

সেই মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালা সমুদ্রকে দু' ভাগ করে বাঁচিয়ে দিলেন মূসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈলকে। বনী ইসরাঈলরা নিরাপদে পার হয়ে যাওয়ার পর সমুদ্র আবার পানিতে পূর্ণ হয়ে গেল; আর ফেরাউন এবং তার লোকেরা পানিতে ডুবে মরল।

"অতঃপর আমি মূসাকে নির্দেশ দিলাম যে, 'তোমার লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত কর;' ফলে উহা বিদীর্ণ হইয়া প্রত্যেক ভাগ বড় পর্বতসম হইয়া গেল।"

আর অপর দলটিকেও ঐ স্থানের নিকটবর্তী পৌঁছাইয়া দিলাম।

আর মূসা এবং তাঁর সঙ্গীদের সকলকে উদ্ধার করিয়া লইলাম, তৎপর অপর দলটিকে ডুবাইয়া দিলাম।

এই ঘটনাটিতেও বড় উপদেশ রহিয়াছে এবং (এতদসত্ত্বেও) উহাদের অনেকেই ঈমান আনে নাই। আর আপনার প্রভু মহা পরাক্রান্ত পরম দয়ালু।"

— সূরা আশ-শুআরা ঃ ৬৩—৬৮

মূসা (আঃ)-এর লাঠিটির কিছু অলৌকিক বৈশিষ্ট্য ছিল। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রথম প্রকাশের সময় এটাকে সাপে পরিণত করেন আর তারপর সেই একই লাঠি আবার সাপে রূপান্তরিত হয়ে ফেরাউনের যাদুকরদের যাদুসমূহকে খেয়ে ফেলে। আর এখন মূসা (আঃ) সেই একই লাঠি দিয়ে সমুদ্রকে বিভক্ত করে ফেললেন। নবী মূসা (আঃ)-এর প্রতি প্রদত্ত মোজেযাসমূহের মধ্যে এটাই ছিল অন্যতম একটি মোজেযা।

ঘটনাটি কি মিসরের ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে সংঘটিত হয়েছিল না-কি লোহিত সাগরে ঘটেছিল?

মূসা (আঃ) ঠিক কোন স্থানে সমুদ্রকে বিভক্ত করেছিলেন সে ব্যাপারে সাধারণ কোন ঐকমত্য পাওয়া যায় না। যেহেতু কোরআনে এই বিষয়টির উপর বিশদ কোন বর্ণনা দেয়া হয়নি সেজন্য আমরা এই বিষয়টির উপর কোন বিবেচনারই সত্যতা নিরূপণ করতে পারি না। কিছু সূত্রে জানা যায় যে, মিসরের ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলই সে জায়গা যেখানে সমুদ্র বিভক্ত হয়েছিল। এনসাইক্লোপেডিয়া জুডাইকাতে বলা হয় ঃ

অধুনা সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতই এক্সোডাসের লোহিত সাগর আর ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের কোন একটি উপহ্রদকে অভিন্ন বা একই বলে গণ্য করে থাকে।৩৭

ডেভিড বেন গুরিয়ন বলেন যে, ঘটনাটি রামসিস-২-এর রাজত্বকালে কাদেশ পরাজয়ের পর পর ঘটে থাকতে পারে।

ওল্ড টেস্টামেন্টের এক্সোডাসের গ্রন্থে ঘটনাটি ডেল্টার উত্তরে অবস্থিত মিগডল ও বাল যেফোনে ঘটেছিল বলে বলা হয়েছে।৩৮

ওল্ড টেস্টামেন্টের উপর ভিত্তি করে এই মতটি গ্রহণ করা হয়েছে। ওল্ড টেস্টামেন্টে এক্সোডাসের গ্রন্থের ভাষান্তরে বলা হয়েছে যে, লোহিত সাগরে ফেরাউন ও তার লোকেরা নিমজ্জিত হয়েছিল। কিন্তু এই মতামত পোষণকারীদের মতানুসারে, প্রকৃতপক্ষে "নলখাগড়ার সমুদ্রকে" ভাষান্তরের সময় "লোহিত সাগর" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অনেক সূত্রেই শব্দটি আর লোহিত সাগরকে অভিন্ন বলে উল্লেখিত হয়েছে এবং সেই জায়গাটির জন্যই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যাই হোক, "নলখাগড়ার সমুদ্র" আসলে মিসরের ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলকে উল্লেখ করতে ব্যবহার করা হয়। ওল্ড টেস্টামেন্টে মূসা (আঃ) আর তাঁর অনুসারীরা যে পথ অনুসরণ করেছিলেন, তার উল্লেখ করতে গিয়ে মিগডল আর বা-ল যেফোন শব্দগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। আর এগুলো উত্তরে মিসরের উপকূলে নীল ডেল্টায় অবস্থিত। ব্যাঞ্জনার্থে নলখাগড়ার সমুদ্রটি এই সম্ভাবনারই সমর্থন করছে যে ঘটনাটি হয়তবা মিসরীয় উপকূলেই সংঘটিত হয়ে থাকবে কেননা নামটির অর্থের সঙ্গে সংগতি রেখেই এ অঞ্চলে ডেল্টা পলিমাটির বদৌলতে নলখাগড়া উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ফেরাউন ও তার দলের সমুদ্রে নিমজ্জন

পবিত্র কোরআন আমাদেরকে লোহিত সাগর বিভাজনের ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সম্বন্ধে অবহিত করে ঃ

কোরআনের বর্ণনা অনুসারে, মূসা তাঁহাকে সমর্থনকারী বনী ইসরাইলদের দলটিকে লইয়া মিসর ত্যাগের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। কিন্তু ফেরাউন, তাহার অনুমতি ছাড়া তাহাদের এই বিদায়কে মানিয়া লইতে পারে নাই। সে আর তাহার সৈন্যরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে "দাম্ভিকতা ও আক্রোশ সহকারে।"

— সূরা ইউনুস ঃ ৯০

মূসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈলরা যখন উপকূলে গিয়ে পৌছল, তখন ফেরাউন তার সৈন্যদের নিয়ে তাদের পাকড়াও করতে গেল। বনী ইসরাঈলগণ এ ঘটনাটি দেখতে পেয়ে মূসা (আঃ)-এর কাছে অভিযোগ করতে শুরু করল।

অতএব, অদ্যকার দিন আমি তোমার লাশ (পানিতে তলিয়ে যাওয়া হইতে) রক্ষা করিব যেন তোমার পরবর্তীদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হইয়া থাক। আর প্রকৃতপক্ষে

ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুযায়ী ঃ তাহারা মূসাকে বলিল, "কেন আপনি আমাদের দেশ থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছেন? সেখানে আমরা দাস হয়ে থাকলেও অন্তত নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে তো পারতাম, আর এখন আমরা মরতে যাচ্ছি।" বনী ইসরাঈলদের এই দুর্বলতা সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটিতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

"আর যখন দুই দল পরস্পরকে দেখিতে পাইল, মূসার লোকেরা বলিল, আমরা নিশ্চিত তাহাদের নাগালে আসিয়া গেলাম।"

— সূরা আশ-শুয়ারা ঃ ৬১

প্রকৃতপক্ষে মূসা (আঃ)-এর কাছে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের বশ্যতা স্বীকার না করার আচরণ প্রদর্শনের এটাই প্রথম কিংবা শেষ সময় ছিল না। পূর্বে আরো একবার তারা মূসা (আঃ)-কে এই বলে অভিযোগ করেছিল।

"আমরা তো সর্বদা মুসিবতেই রহিলাম, আপনার আগমনের পূর্বে ও আপনার আগমনের পরেও।"

বনী ইসরাঈলীয়দের এই দুর্বল আচরণের ঠিক বিপরীতক্রমে মূসা ছিলেন অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী, কেননা আল্লাহ তায়ালার উপর তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। তাঁর সংগ্রামের শুরু থেকেই আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অবহিত করে আসছিলেন যে, আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন তাঁর সঙ্গে থাকবে। আল্লাহ বলিলেন, "তোমরা ভয় করিও না, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সব শুনিতেছি ও দেখিতেছি।"

— সূরা ত্বা-হা ঃ ৪৬

প্রথম যখন মূসা ফেরাউনের যাদুকরদের দেখেন তখন তিনি "এক ধরনের ভয় অনুভব করিলেন।"

— সূরা ত্বা-হা ঃ ৪৬

এতে আল্লাহ তাহকে জানাইলেন যে, তাহার মোটেও ভয় করা উচিত নয়, কেননা অবশেষে অবশ্যই তিনি জয়ী হইবেন।

— সূরা ত্বা-হা ঃ ৬৮

এভাবেই মূসা আল্লাহ কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং আল্লাহর রাস্তায় এভাবেই তিনি পূর্ণত্ব লাভ করেন। ফলে তাঁর দলের কিছু লোক যখন ধরা পড়ার আশংকায় ভীত হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন,

"কোনভাবেই নয়। আমার প্রভু আমার সঙ্গে আছেন। শীঘ্রই তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন।"

— সূরা আশ-শুয়ারা ঃ ৬২

আল্লাহ মূসাকে তাঁহার লাঠি দিয়া সমুদ্রে আঘাত করার কথা বলিলেন। এর ফলে "ইহা বিদীর্ণ হইয়া প্রত্যেক ভাগ বড় পর্বতসম হইয়া গেল।"

— সূরা আশ-শুয়ারা ঃ ৬৩

প্রকৃতপক্ষে, যে মুহূর্তে ফেরাউন এমন একটি অলৌকিক ঘটনা অবলোকন করেছিল তখনই তার বুঝে নেয়া উচিত ছিল যে, এই অবস্থাটির কোন অসাধারণ দিক রয়েছে এবং এতে কোন স্বর্গীয় বা দৈব হস্তক্ষেপ রয়েছে। যে লোকদেরকে ফেরাউন ধ্বংসে করতে চেয়েছিল, তাদেরই জন্য সমুদ্র উন্মুক্ত হয়ে গেল। অধিকন্তু এই দলটি পার হয়ে যাওয়ার পর সমুদ্র যে আবার পূর্ণ হয়ে যাবে না এর তো কোন নিশ্চয়তাও ছিল না। কিন্তু তারপরও ফেরাউন ও তার সৈন্যরা বনী ইসরাঈলদের অনুসরণ করে সমুদ্রে গেল। খুব সম্ভবত ফেরাউন এবং তার সৈন্যরা তাদের ঔদ্ধত্য আর বিদ্বেষের বশে যৌক্তিকভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল আর এই অবস্থাটির অলৌকিক প্রকৃতিকে অনুধাবন করতে অসমর্থ হয়ে গিয়েছিল।

কোরআনে ফেরাউনের শেষ সময় টুকুর বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে

আর আমি বনী ইসরাঈলদিগকে সমুদ্র পার করাইয়া দিলাম, অতঃপর ফেরাউন আপন সৈন্য সামন্তসহ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল জুলুম ও নির্যাতনের উদ্দেশ্যে, অবশেষে সে যখন নিমজ্জিত হইতে লাগিল তখন ব্যাকুল হইয়া বলিতে লাগিল, "আমি ঈমান আনিতেছি যে সেই সত্তা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, যাঁহার উপর বনী ইসরাঈল ঈমান আনিয়াছে এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হইতেছি।"

— সূরা ইউনুস ঃ ৯০

এখানে মূসা (আঃ)-এর আরেকটি মো'জেযা দেখা সম্ভবপর। চলুন আমরা নিচের আয়াতটি স্মরণ করি ঃ

মূসা আবেদন করিলেন, "হে আমাদের প্রভু! আপনি ফেরাউন ও তাহার প্রধানবর্গকে জাঁকজমক সরঞ্জাম ও বিভিন্ন প্রকারের সম্পদ দান করিয়াছেন পার্থিব জীবনে; এইজন্যই যেন হে প্রভু! তাহারা আপনার পথ হইতে (মানুষকে) বিপথগামী করিয়া দেয়।

হে আমাদের প্রভু! তাহাদের সম্পদসমূহ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিন এবং তাহাদের অন্তরসমূহকে অধিক কঠোর করিয়া দিন, বস্তুত তাহারা ঈমান আনিতে না পারে যে পর্যন্ত না তাহারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করে।

আল্লাহ পাক বলিলেন, "তোমাদের উভয়ের (মূসা ও হারুন) দোয়া কবুল করা হইল; অতএব তোমরা স্থির থাক, ঐ সকল লোকের পথে চলিও না যাহাদের জ্ঞান নাই।"

—সূরা ইউনুস ঃ ৮৮-৮৯

মূসা (আঃ) তাঁর প্রার্থনার উত্তরে জ্ঞাত হয়েছিলেন যে ফেরাউন মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে আল্লাহতে ঈমান আনবে — এটা এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। বাস্তবে সাগরের পানি যখন পূর্ণ হতে শুরু করেছিল তখনই ফেরাউন বলেছিল যে সে আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে। তথাপি, এটা অত্যন্ত স্বচ্ছ যে, তার আচরণ ছিল মিথ্যা ও আন্তরিকতাহীন। খুব সম্ভবত নিজেকে এই অবস্থায় বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই ফেরাউন তা বলেছিল।

নিশ্চিতভাবেই, শেষ মুহূর্তে ফেরাউনের ঈমান আনা ও ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ কর্তৃক গৃহীত হয়নি। ফেরাউন তার সৈন্য সামন্তসহ সমুদ্রের পানিতে নিমজ্জিত হয়েছিল, ফলে নিজেদেরকে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচাতে পারেনি।

উত্তর দেওয়া হইল যে, "এখন ঈমান আনিতেছ, অথচ (পরকাল দর্শনের) পূর্ব (মুহূর্ত) পর্যন্ত ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিতেছিলে; অতএব অদ্যকার দিন আমি তোমার লাশ (পানিতে তলিয়ে যাওয়া হইতে) রক্ষা করিব, যেন তোমার পরবর্তীদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হইয়া থাকে? আর প্রকৃতপক্ষে বহু লোক আমার নিদর্শনাবলী হইতে গাফেল রহিয়াছে।"

— সূরা ইউনুস ঃ ৯১-৯২

আমরা আরো অবগত হয়েছি যে, কেবল ফেরাউন একাই নয় তার লোকেরাও তাদের শাস্তির ভাগ পেয়েছিল। যেহেতু ফেরাউনের লোকেরা ঠিক ফেরাউনের মতই ছিল "ঔদ্ধত্য ও দ্বেষপূর্ণ মানুষ", (—সূরা ইউনুস ঃ ৯০), "পাপী' (—সূরা আল-ক্বাসাস ঃ ৮), "অন্যায়ে লিপ্ত ছিল" (— সূরা ক্বাসাস ঃ ৪০)।

"আর ভাবিয়াছিল যে, তাহাদের কখনোই আল্লাহর কাছে ফেরত যাইতে হইবে না।"

— সূরা ক্বাসাস ঃ ৩৯

তাই তারা ভালভাবেই শাস্তির যোগ্য লোক ছিল।

এইভাবে, "আল্লাহ তায়ালা ফেরাউন ও তাহার দল উভয়কে অবরুদ্ধ করিলেন এবং তাহাদের সাগরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন।"

— সূরা ক্বাসাস ঃ ৪০

সুতরাং আল্লাহ তাহাদের থেকে প্রতিশোধ লইলেন, তাহাদের সমুদ্রে ডুবাইয়া দিলেন, কেননা তাহারা তাঁহার আয়াতগুলিকে অস্বীকার করিত এবং এসব কিছু একেবারেই উপেক্ষা করিয়া যাইত।

— সূরা আরাফ ঃ ১৩৬

ফেরাউনের মৃত্যুর পর কি ঘটেছিল তা আল্লাহ তায়ালা নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করেছেন ঃ

"আর আমি ঐ সকল লোককে যাহাদের একেবারে দুর্বল পরিগণিত করা হইত তাহাদেরকে, ঐ ভূখণ্ডের পূর্ব-পশ্চিমের মালিক বানাইয়া দিলাম, যাহাতে আমি বরকত দিয়া রাখিয়াছি; আর (এইরূপে) আপনার প্রভুর সৎ প্রতিশ্রুতি বনী ইসরাঈল সম্বন্ধে পূর্ণ হইয়াছে, তাহাদের ধৈর্যের কারণে। আর ফেরাউন ও তাহার বংশধরেরা যেসব কলকারখানা স্থাপন করিয়াছিল এবং যেসব উচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিল সবকিছুই তছনছ করিয়া দিলাম।"

— সূরা আরাফ ঃ ১৩৭

অধ্যায় সাত

সাবা সম্প্রদায় ও আরিমের বন্যা

সাবাবাসীদের জন্য তাহাদের বাসভূমিতে বহু নিদর্শন বিদ্যমান ছিল। উদ্যানের দুইটি সারি ছিল, ডানে ও বামে।

আপন প্রতিপালক (প্রদত্ত) জীবিকা ভক্ষণ কর এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন কর (কেননা বসবাসের জন্য) উত্তম এই নগরী এবং প্রতিপালক হইলেন ক্ষমাশীল।

অনন্তর তাহারা অবাধ্য হইল, সুতরাং আমি তাহাদের উপর বাঁধভাঙ্গা প্লাবন দিলাম এবং তাহাদের দো-ধারী উদ্যানের পরিবর্তে অপর দুইটি উদ্যান দিলাম, যাহার মধ্যে দুই বস্তুই রহিল—বিস্বাদ ফলমূল ও ঝাউগাছ আর সামান্য কিছু কুলবৃক্ষ।

— সূরা সাবা ঃ ১৫-১৬

দক্ষিণ আরবে বসবাসরত চারটি বৃহত্তম সভ্যতার অন্যতম একটি ছিল "সাবা সম্প্রদায়"। খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ থেকে ৭৫০ সনের মধ্যে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। আর ৫৫০ সনে টানা দুই শতাব্দী জুড়ে পারস্য ও আরবদের আক্রমণের ফলে এই সভ্যতার পতন ঘটে বলে অনুমান করা হয়।

সাবা সভ্যতার প্রতিষ্ঠার সন-তারিখ একটি ব্যাপক আলোচনার বিষয়। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ সন থেকে সাবার লোকেরা তাদের সরকারী রিপোর্টসমূহ রেকর্ড করা শুরু করে। আর সেজন্যই ৬০০ সনের পূর্বে তাদের কোন রেকর্ড নেই।

পুরনো যে উৎসসমূহে সাবা সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহল, আসিরিয়ান রাজা "দ্বিতীয় সারগণ" এর সময় থেকে (খ্রিস্টপূর্ব ৭২২-৭০৫ সন) বিদ্যমান "বাৎসরিক যুদ্ধপঞ্জীসমূহ"। রাজা সারগণ, তাকে কর প্রদানকারী লোকদের রেকর্ড লিখে রাখার সময় সাবার রাজা "ঈথি-আমরা" (ইট আমারা)-এর নামও উল্লেখ করে। আর এই রেকর্ডই হল সবচাইতে পুরনো সূত্র যা সাবা সভ্যতা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। তথাপি, কেবল এই

সাবা সম্প্রদায়ের ভাষায় লেখা অভিলিখন

সূত্রের উপর নির্ভর করেই এই উপসংহারে আসা ঠিক হবে না যে, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ সনে সাবা সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল; কেননা এর অত্যন্ত জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে যে লিখিত রেকর্ড রাখার বেশ কিছু সময় পূর্ব থেকেই সাবা সভ্যতা বর্তমান ছিল। এর মানে এটাই যে, সাবার ইতিহাস উপরে উল্লেখিত সনের পূর্ব থেকেই বিদ্যমান।

বাস্তবিকই "উর" রাজ্যের সর্বশেষ রাজাদের একজন, "আরদ-নানার"- এর অভিলিখনে "সাবুম" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল, যার অর্থ "সাবা রাজ্য" বলে অনুমান করা হয়।[৩৯] যদি এই শব্দটির অর্থ সাবা হয়ে থাকে তবে এটাই প্রমাণিত হয় যে অতীতে খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ সন হতে সাবার ইতিহাস বিদ্যমান।

সাবা সম্বন্ধে বর্ণনাকারী ঐতিহাসিক সূত্রগুলো এটাই বলে যে, এরা ছিল ফোনেসিয়ানদের মতই একটি কৃষ্টি, যারা বিশেষভাবে বাণিজ্যিক কার্যকলাপেই লিপ্ত ছিল। আর সে অনুযায়ী তারা উত্তর আরবের মধ্য দিয়ে কিছু বাণিজ্যিক রুটসমূহের অধিকারী ছিল আর তারাই এই রুটগুলোর প্রশাসনকার্যে নিয়োজিত ছিল। সাবার ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যসামগ্রী ভূমধ্যসাগর ও গাজায় নিয়ে যেতে ও উত্তর আরব অতিক্রম করে যেতে রাজা "দ্বিতীয় সারগন"-এর অনুমতি নিত কিংবা তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর প্রদান করত। রাজা দ্বিতীয় সারগন ছিল এসব অঞ্চলের শাসক। যে সময় থেকে সাবার লোকেরা আসিরিয়ান রাজ্যকে কর প্রদান শুরু করে তখন থেকেই তাদের নাম সেই রাজ্যের বর্ষপঞ্জীতে রেকর্ড করা হয়ে থাকে।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সাবার অধিবাসীরা ছিল এক সভ্য সম্প্রদায়। সাবার শাসকদের অভিলিখনসমূহে "পূর্বাবস্থায় (ভাল অবস্থায়) ফিরিয়ে আনা", "উৎসর্গ করা" এবং "গঠন করা" ইত্যাদি কিছু কিছু শব্দসমূহের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ রয়েছে। এই সম্প্রদায় কর্তৃক নির্মিত অন্যতম গুরুত্ববহনকারী স্তম্ভ মারিবের বাঁধ এই জাতি প্রযুক্তি সীমার কত উঁচু তলায় পৌঁছেছিল তারই নিদর্শন বহন করে। যাহোক, এটার মানে এই নয় যে সাবা সম্প্রদায় সামরিক ক্ষমতার দিক থেকে দুর্বল ছিল বরং সাবা সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির কোন রকম পতন ছাড়াই এত লম্বা সময় টিকে থাকার পেছনে যারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, তারা হল সাবার সৈন্যবাহিনী।

সাবা রাজ্যে সেই অঞ্চলের সবচাইতে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী ছিল। এই সৈন্যবাহিনীর বদৌলতেই সমগ্র রাজ্যটি সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। সাবা রাজ্য প্রাচীন ক্বাতাবা রাজ্যের স্থলভূমি জয় করে নিয়েছিল। আফ্রিকা মহাদেশের বহু সংখ্যক ভূমি সাবা রাজ্যের অধিকারে ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২৪ সনে মাগরিবের এক অভিযানে সাবার সৈন্যবাহিনী রোমান সামাজ্য কর্তৃক নিযুক্ত মিসরের গভর্নর মারকুস এলিয়াসের সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে, যে রাজ্য কি-না নিঃসন্দেহে সেই সময়কার অন্যতম শক্তিশালী রাজ্য ছিল। যে সাবা রাজ্য মধ্যম নীতি অনুসরণ করত বলে চিত্রিত করা হয়, সেই রাজ্য প্রয়োজনে ক্ষমতার ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করত না। অত্যন্ত প্রাগ্রসর সংস্কৃতি ও সৈন্যবাহিনীর জন্যে সাবা রাজ্য নিঃসন্দেহে সেকালের "পরাশক্তিগুলোর" অন্যতম একটি ছিল।

পবিত্র কোরআনেও সাবা রাজ্যের অসাধারণভাবে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর বর্ণনা রয়েছে। কোরআনে একটি বর্ণনায় সাবার সেনাপ্রধানদের একটি অভিব্যক্তি তাদের নিজেদের আত্মবিশ্বাসের সীমা কতদূর ছিল তা প্রমাণ করে। সাবার মহিলা শাসককে (রানী) সেনাপ্রধানরা বলেছিল ঃ

> "আমরা বড় শক্তিশালী অত্যন্ত রণনিপুণ লোক (তাই যুদ্ধকে সঙ্গত মনে করি) আর অধিকার তো আপনারই হাতে; সুতরাং আপনিই ভাবিয়া দেখুন কি আদেশ করিতে হয়।"
>
> — সূরা নমল ঃ ৩৩

সাবা রাজ্যের রাজধানী নগরী ছিল মা'রিব যা-কিনা এর ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে অত্যন্ত সম্পদশালী একটি নগরী ছিল। আধানাহ নদীর অতি কাছে ছিল রাজধানী নগরী। ঠিক যে জায়গাটিতে নদীটি জাবাল বালাতে গিয়ে পৌছেছিল সেখানটি বাঁধ নির্মাণের জন্য একটি অত্যন্ত উপযুক্ত জায়গা ছিল। আর এই ব্যাপারটিরই সদ্ব্যবহার করে সাবা সম্প্রদায়। তারা তাদের সভ্যতা প্রতিষ্ঠার গোড়াতেই ঠিক সেই জায়গাটিতে একটি বাঁধ নির্মাণ করে ও সেচকার্য শুরু করে। বাস্তবিকই তারা উন্নতির এক উঁচু তলায় পৌছেছিল। রাজধানী নগরী মা'রিব সেকালের সবচাইতে উন্নত নগরী ছিল। গ্রীক লেখক প্লিনী এই অঞ্চল পরিদর্শন করেছিলেন এবং এর অত্যন্ত প্রশংসা করেন। এই অঞ্চল যে কিরূপ শ্যামল ছিল তারও উল্লেখ করেছেন তিনি।

মা'রিবে বাঁধটি উচ্চতায় ১৬ মিটার, প্রস্থে ৬০ মিটার ও লম্বায় ৬২০ মিটার ছিল। এই গণনানুসারে, সর্বমোট যতটুকু জায়গায় সেচ চালান যেত তার পরিমাণ হল ৯৬০০ হেক্টর, এর মাঝে ৫৩০০ হেক্টর ছিল দক্ষিণ সমতলের আর বাকী অংশটুকু ছিল উত্তর সমতলের। সাবাবাসীদের অভিলিখনে এ দু'টি সমতলকে "মা'রিব ও দুটি সমতল" বলে উল্লেখ করা আছে।[৪১]

কোরআনের প্রকাশে "ডানে ও বামে দুটি বাগান" এ দুটি উপত্যকারই বাগানরাজি ও আঙ্গুর বাগিচাকে নির্দেশ করা হয়েছে। এই বাঁধ ও সেচ প্রণালীর বদৌলতে এ অঞ্চলটি ইয়েমেনের সবচাইতে বেশি সেচবহুল ও ফলবান এলাকা বলে বিখ্যাত ছিল। ফ্রান্সের জে. হলেভি ও অস্ট্রিয়ার গ্লেসার, বিভিন্ন লিখিত ডকুমেন্ট থেকে এটা প্রমাণ করেন যে, মা'রিব বাঁধ প্রাচীনকাল থেকেই বর্তমান ছিল। হিমার উপভাষায় লিখিত ডকুমেন্টে বর্ণিত আছে যে এই বাঁধটি অঞ্চলটিকে অত্যন্ত উর্বরা করে তুলেছিল।

৫ ও ৬ সনে বাঁধটির বিস্তৃত মেরামত করা হয়। কিন্তু এই মেরামতকার্য বাঁধটিকে ৫৪২ সনে ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। কোরআনে উল্লেখ আছে যে বাঁধটির ভাঙ্গনের ফলে বন্যা শুরু হয় যার ফলে বেশ ক্ষতিসাধন হয়েছিল। শত শত বছর ধরে সাবার লোকেরা যে আঙ্গুর বাগিচা, বাগানরাজি ও জমি আবাদ করে আসছিল এগুলো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়।

এই বাঁধ ধ্বংসের পরে সাবার লোকেরা অত্যন্ত দ্রুত অর্থনৈতিক মন্দার একটি পর্যায়ে পতিত হয় বলেও জানা যায়। বাঁধ ভাঙ্গা দিয়ে শুরু এই মন্দার সময়ের শেষে সাবা রাজ্যেও এর শেষকাল উপস্থিত হয়।
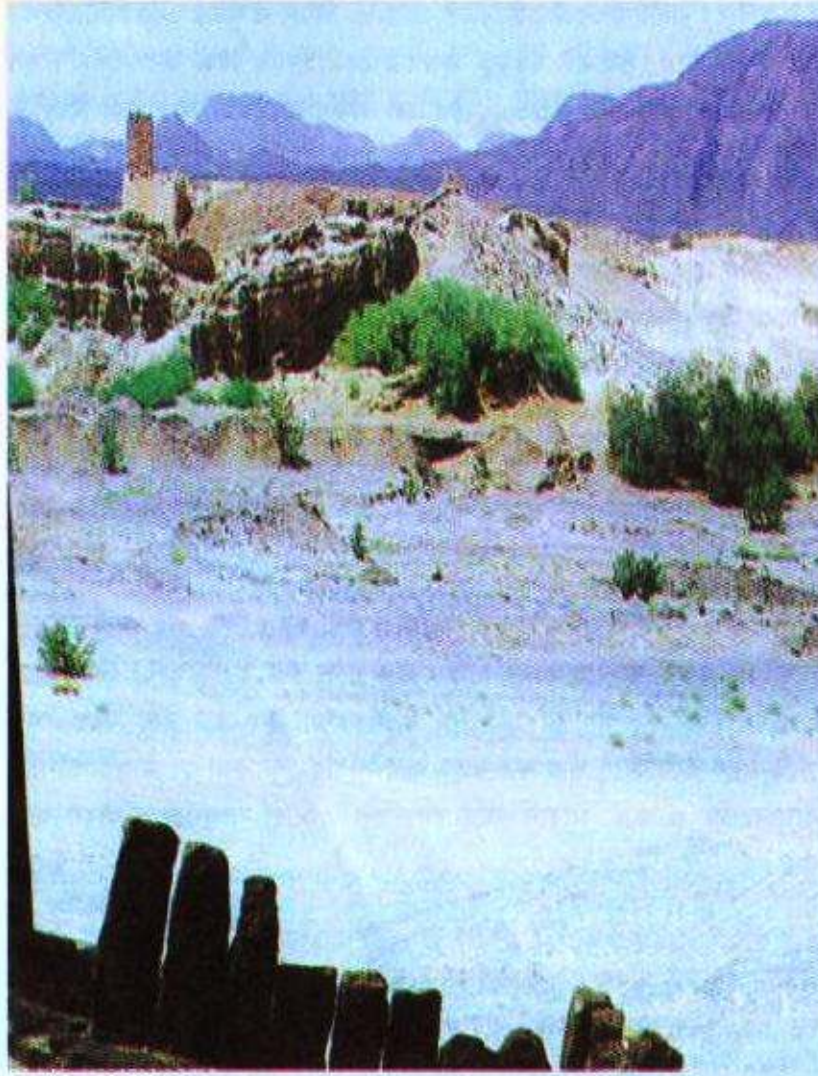
অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তি দিয়ে নির্মিত মাটির বাঁধের মাধ্যমে সাবার লোকেরা এক বিশাল সেচ ক্ষমতার অধিকারী হয়। এর ফলে, তাদের অর্জিত ফলবান ভূমি ও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বাণিজ্যিক অঞ্চলগুলোর মাধ্যমে তারা অত্যন্ত উন্নত ও বিলাসবহুল জীবনযাপন করার সুযোগ পায়। যাহোক তারা সেই আল্লাহ যিনি তাদের এত সুখ-সম্পদের অধিকারী করেছেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে বিমুখ হয়ে যায়। এজন্যই, এদের বাঁধটি ভেঙ্গে যায়, আর "আরিমের বন্যা" তাদের সব প্রাপ্য বস্তুকে ধ্বংস করে দেয়

আরিমের বন্যা-যা সাবা রাজ্যে প্রেরিত হয়েছিল

পূর্বোল্লেখিত ঐতিহাসিক তথ্যগুলোর আলোকে আমরা যখন পবিত্র কোরআনে অনুসন্ধান করে দেখি তখন আমরা লক্ষ্য করি যে এখানে একটি অত্যন্ত সারগর্ভ ঐকমত্য বিদ্যমান রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যাবলী ও ঐতিহাসিক তথ্য উভয়েই কোরআনে বর্ণিত আয়াতের সত্যতা প্রতিপাদন করে। আয়াতটিতে উল্লেখ রয়েছে যে, এ সকল লোকেরা তাদের নবীর সনির্বন্ধ অনুরোধেও কর্ণপাত করেনি এবং অকৃতজ্ঞের ন্যায় তাঁদের প্রত্যাখ্যান করেছে; পরিণতিতে তারা ভয়ংকর এক বন্যার মাধ্যমে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। নিচের আয়াতসমূহে এই বন্যার বর্ণনা রয়েছে ঃ

> "সাবাবাসীদের জন্য তাহাদের বাসভূমিতে বহু নিদর্শন বিদ্যমান ছিল, উদ্যানের দুইটি সারি ছিল ডানে ও বামে; আপন প্রতিপালকের জীবিকা ভক্ষণ কর ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। কারণ বসবাসের জন্য উত্তম এই নগরী এবং প্রতিপালক হইলেন ক্ষমাশীল।
>
> অনন্তর তাহারা অবাধ্য হইল। সুতরাং আমি তাহাদের উপর বাঁধ ভাঙ্গা প্লাবন দিলাম এবং তাহাদের দোধারী উদ্যানের পরিবর্তে অপর দুইটি উদ্যান দিলাম যাহার মধ্যে দুই বস্তুই রহিল — বিস্বাদ ফল-মূল ও ঝাউগাছ আর কিছু কুলবৃক্ষ। আমি এই সাজা তাহাদের অকৃতজ্ঞতার জন্যই দিয়াছিলাম আর আমি এরূপ সাজা চরম কৃতঘ্নদেরই দিয়া থাকি।"
>
> — সূরা সাবা ঃ ১৫-১৭

উপরের আয়াতে গুরুত্বের সঙ্গে বলা হয়েছে যে সাবার লোকেরা এমন একটি অঞ্চলে বসবাস করত যা ছিল বিশিষ্ট নান্দনিক সৌন্দর্য, ফলবান আঙ্গুর লতা ও বাগানরাজিতে পূর্ণ। বাণিজ্যিক সড়ক পথসমূহের উপরে অবস্থিত হওয়ায় সাবা নগরীতে জীবনযাত্রার মান ছিল অত্যন্ত উন্নত আর নগরীটি তখনকার সময়ে সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরীগুলোর অন্যতম ছিল।

জীবনযাত্রার মান ও পরিস্থিতি এত অনুকূলে ছিল যে দেশে, সেই সাবার লোকজনদের যা করণীয় ছিল তাহল "আপন প্রতিপালকের জীবিকা ভক্ষণ কর ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন কর" — যেমন আয়াতটিতে উক্ত হয়েছে। তথাপি তারা তা করেনি। তারা তাদের উন্নতিকে নিজেদের কৃতিত্ব

বলেই দাবি করছিল। তারা ভেবেছিল এই দেশ কেবলই তাদের নিজের, তারা নিজেরাই যেন এসব অসাধারণ অবস্থাগুলোকে সম্ভব করে তুলেছিল। কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তারা উদ্ধত হওয়াকেই বেছে নিল এবং আয়াতটির বর্ণনায় "তাহারা আল্লাহর অবাধ্য হইল"...।

যেহেতু তারা এসব সমৃদ্ধিকে নিজেদের কৃত বলে দাবি করছিল, পরিণতিতে তারা এর সবটুকুই হারিয়ে বসল। আয়াতটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, আরিমের বন্যা তাদের যা-কিছু ছিল তার সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছিল।

কোরআনে সাবার জনগণের উপর প্রেরিত শাস্তিকে বা "আরিমের বন্যা" বলে অভিহিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনের এই অভিব্যক্তিটি কিভাবে এই দুর্যোগ সংঘটিত হয়েছিল তার কথাও বলেছে।

বর্তমানে সাবাবাসীদের বিখ্যাত বাঁধটি সেচ সুবিধার উপকরণে পরিণত হয়েছে

উপরে মা'রিব বাঁধের যে ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে তা ছিল সাবাবাসীদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টিকর্ম। কোরআনে উল্লেখিত আরিমের বন্যায় এই বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং সব আবাদী জমি জলমগ্ন হয়ে যায়। বাঁধ ধ্বংসের ফলে সাবার অঞ্চলগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় অত্যন্ত দ্রুত এই রাজ্য এর অর্থনৈতিক শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং শীঘ্রই তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়

আরিম শব্দের মানে বাঁধ বা প্রাচীর। "সায়েল-আল-আরিম" শব্দটি একটি বন্যার বর্ণনা করে যা এই বাধটিতে ভাঙ্গন ঘটায়। ইসলাম ধর্মের ভাষ্যকারগণ, পবিত্র কোরআনে আরিমের বন্যা সম্বন্ধে ব্যবহৃত শব্দাবলী দিয়ে পরিচালিত হয়ে বন্যাটির স্থান ও কালের বিষয়টি সম্পর্কে উপসংহার টেনেছেন। মওদুদী তাঁর মন্তব্যে লিখেন ঃ

> "সায়েল-আল-আরিম শব্দের বর্ণনায় ব্যবহৃত "আরিম" শব্দটি দক্ষিণ আরবের উপ-ভাষায় ব্যবহৃত "আরিমেন" শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ হল, "বাঁধ", "প্রাচীর"। ইয়েমেনে চালানো খননকার্যে যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল তাতে দেখা যায় যে শব্দটি বারংবার এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ ৫৪২ ও ৫৪৩ সনে

মা'রিব দেয়াল পুনঃনির্মাণের পর ইয়েমেনের হাবেশ সম্রাট এব্রেহে (আব্রাহা)-এর আদেশে লিখিত অভিলিখনে এই শব্দটি বারবার এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাই **"সায়েল-আল-আরিম"** শব্দটি সেই বন্যাজনিত মহাদুর্যোগের বর্ণনা করে যা বাঁধটি ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে সংঘটিত হয়েছিল।"

"আমি তাহাদের দো-ধারী উদ্যানের পরিবর্তে অপর দুইটি উদ্যান দিলাম, যাহার মধ্যে দুই বস্তুই রহিল—বিস্বাদ ফলমূল ও ঝাউগাছ আর অন্যান্য কিছু কূল বৃক্ষ"। (—সূরা সাবা ঃ ১৬)। বাঁধটি ভেঙ্গে যাওয়ার পর সমগ্র দেশ বন্যাপ্লাবিত হয়। সাবার লোকেরা যে খাল-খনন করেছিল আর পর্বতসমূহের মাঝে প্রাচীর তৈরি করে যে দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছিল তা ধ্বংস হয়ে গেল, সেচব্যবস্থা ভেঙ্গে গেল। ফলে যে ভূখণ্ডটি ছিল কানন সদৃশ তা পরিণত হল জঙ্গলে। চেরী ফলের মত ফল উৎপাদনকারী খাট মোটা বৃক্ষগুলো ছাড়া আর কোন ফলবৃক্ষ অবশিষ্ট রইল না।[৪২]

"The Holy Book Was Right" — এই বইটির লেখক খ্রিস্টান প্রত্নতত্ত্ববিদ ওয়েরনার কেলার এটা গ্রহণ করেছেন যে আরিমের বন্যাটি পবিত্র কোরআনে যেভাবে বর্ণিত রয়েছে সেভাবেই ঘটেছিল, আর তিনি লিখেন যে, এমন একটি বাঁধের অস্তিত্ব আর এর ভাঙ্গনের ফলে সমগ্র দেশের ধ্বংসাবলী এটাই প্রমাণ করে যে বাগানের লোকদের যে উদাহরণটি পবিত্র কোরআনে দেখান হয়েছে তা সত্যি সত্যিই ঘটেছিল।[৪৩]

আরিমের বিপর্যয়কারী বন্যার পর পরই অঞ্চলটি মরুভূমিতে রূপান্তরিত হতে শুরু করে, আর সাবার জনগণ, তাদের চাষাবাদের ভূমি বিলীন হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আয়ের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উৎসটি হারিয়ে ফেলে। যে জনগণ আল্লাহতে বিশ্বাস বা ঈমান এনে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার আহবানে কর্ণপাত করেনি, তারাই অবশেষে এমন একটি বিপর্যয়ের মাধ্যমে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। বন্যাজনিত কারণে বড় ধরনের ধ্বংসের পর লোকেরা নানা অংশে বিভক্ত হতে শুরু করল। সাবার জনগণ বাড়ি-ঘর জনশূন্য করে উত্তর আরব, মক্কা ও সিরিয়ায় নির্বাসিত হতে শুরু করল।[৪৪]
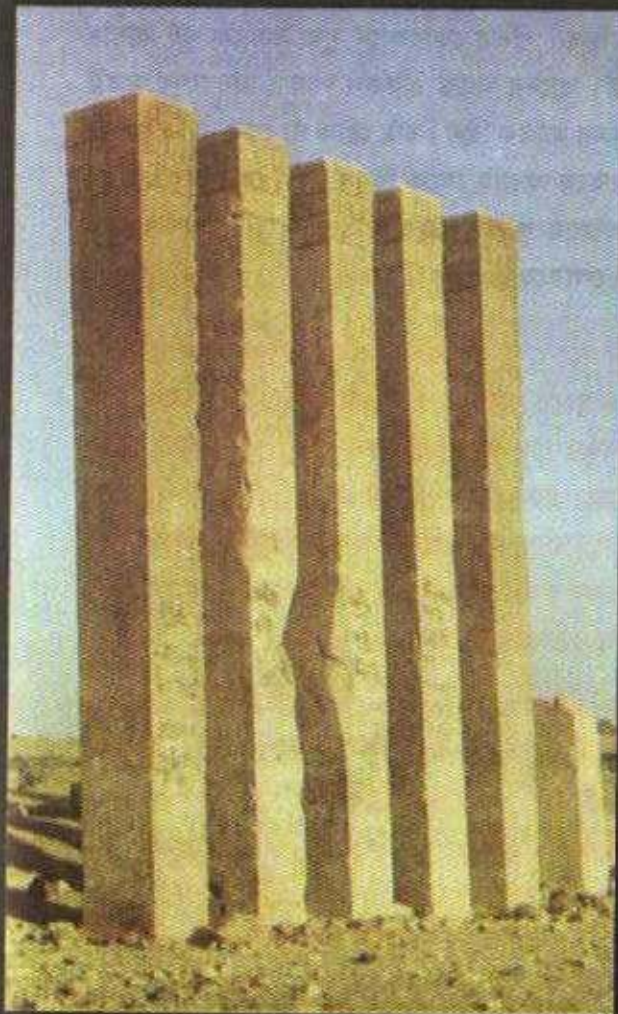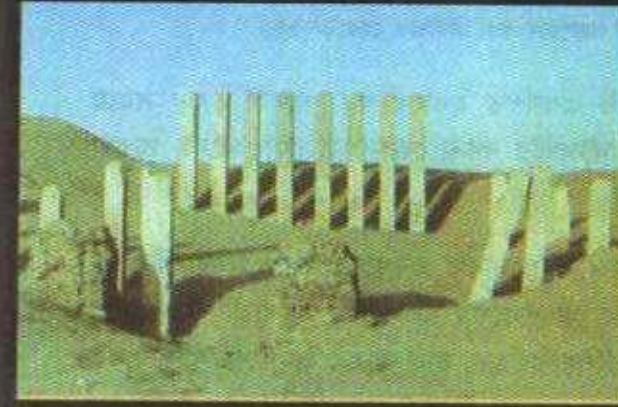
কোরআন আমাদের বলছে যে সাবার রানী সুলাইমান (আঃ) কে অনুসরণের পূর্বে "আল্লাহকে বাদ দিয়ে সূর্যের উপাসনা করত।" অভিলিখনগুলোতে লেখা তথ্যগুলো এর সত্যতা প্রতিপাদন করে এবং নির্দেশনা দিচ্ছে যে, তারা তাদের মন্দিরগুলোয় চাঁদ ও সূর্যের উপাসনা করে যাচ্ছিল. উপরে এই মন্দিরগুলোর একটি দেখা যাচ্ছে। স্তম্ভগুলোয় সাবাইয়ান ভাষায় লেখা অভিলিখন রয়েছে

ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্ট প্রকাশিত হওয়ার পর পরবর্তী কোন সময়ে প্লাবনটি সংঘটিত হওয়ায় ঘটনাটির বর্ণনা কেবলমাত্র কোরআনেই পাওয়া যায়।

যে "মা'রিব" নগরী এক সময় সাবার জনগণের বসতি নগরী ছিল তা এখন কেবলই জনশূন্য এক ধ্বংসাবশেষ মাত্র। এই ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে সেই সকল লোকের জন্য হুঁশিয়ারিস্বরূপ, যারা সাবার জনগণের ন্যায় একই ধরনের ভুল বার বার করতে থাকবে। সাবার জনগণই একমাত্র জাতি নয় যারা বন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। পবিত্র কোরআনে সূরা কাহফে দুই বাগান মালিকের গল্প বর্ণিত আছে। তাদের মাঝে একজন সাবার জনগণের মতই চিত্তাকর্ষক ও ফলবান বাগানের মালিক ছিল। যাই হোক না কেন, সেও সাবার লোকদের ন্যায় একই ভুল করে আল্লাহ থেকে বিমুখ হয়। সে ভেবেছিল যে তার প্রতি অর্পিত অনুগ্রহগুলোর কৃতিত্ব কেবলি তার নিজের; অর্থাৎ তার কাজেরই ফলস্বরূপ সে তা পেয়েছে।

> আর আপনি তাহাদিগকে সেই দুই ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করুন যাহাদের একজনকে আমি আঙ্গুরের দুইটি বাগান দিয়া রাখিয়াছিলাম এবং সেই বাগান দুইটিকে খেজুর গাছ দ্বারা (প্রাচীরের ন্যায়) পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং এতদুভয়ের মাঝে শস্য ক্ষেতও লাগাইয়া রাখিয়াছিলাম (এবং) বাগানদ্বয় পরিপূর্ণ ফলও দিতেছিল এবং কোন একটির মধ্যেও ফলের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল না এবং উভয়ের মাঝে মাঝে ঝর্ণা প্রবাহিত রাখিয়াছিলাম।
>
> এবং সেই লোকটির নিকট আরও ধন-সম্পদের উপকরণ ছিল। একদা কথা প্রসঙ্গে সে তাহার সঙ্গীকে বলিতে লাগিল, "আমি তোমা অপেক্ষা ধন-সম্পদেও অধিক এবং জনবলেও শক্তিশালী। অনন্তর সে নিজের উপর পাপ লোপনকরতঃ বাগানে ঢুকিল (এবং) বলিতে লাগিল যে, আমি ধারণা করি না যে কেয়ামত সংঘটিত হইবে, আমি যদি আমার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করি, তবে অবশ্যই এই বাগান অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট জায়গা প্রাপ্ত হইব।"

> তাহার সঙ্গীটি তাহাকে উত্তরে বলিলেন, "তুমি কি সেই পবিত্র সত্ত্বার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছ যিনি তোমাকে (প্রথমে) মাটি হইতে, অতঃপর শুক্রকীট হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অনন্তর তোমাকে সুস্থ ও নিখুঁত মানুষ হিসাবে গড়িয়াছেন আমি কিন্তু এই বিশ্বাসই রাখি যে তিনি অর্থাৎ আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক সাব্যস্ত করি না। আর যখন তুমি নিজের বাগানে উপস্থিত হইয়াছিলে তখন তুমি এরূপ কেন বল নাই যে, আল্লাহর যাহা ইচ্ছা তাহাই হয় এবং আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত (কাহারও) কোন শক্তি নাই, যদিও তুমি আমাকে তোমা অপেক্ষা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে হীন দেখিতেছ";
>
> "কিন্তু আমার মনে হয় শীঘ্রই আমার প্রভু আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাগান দিয়া দিবেন এবং তোমার এই বাগানে আকাশ হইতে কোন আপদ প্রেরণ করিবেন যাহাতে উহা নিমিষে একটি ধু-ধু মাঠে পরিণত হইয়া যাইবে অথবা উহার পানি একেবারে (ভূ-গর্ভে) অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, অতঃপর তুমি ইহা ফিরাইয়া আনিতেও কভু সক্ষম হইবে না।"
>
> পক্ষান্তরে লোকটির অর্থোপকরণ সমূহকে আপদে ঘিরিয়া লইল, অতঃপর সে উহাতে যাহা খরচ করিয়াছিল তজ্জন্য হাত মলিতে লাগিল, আর সেই বাগানের মাচানটির উপর মুচড়াইয়া রহিল এবং সে বলিতে লাগিল, "হায়! আমি যদি আমার প্রভুর সহিত কাহাকেও শরীক না করিতাম," আর তাহার জন্য এমন কোন দলও ছিল না যাহা তাহাকে সাহায্য করিতে পারে আল্লাহ ব্যতিরেকে আর না নিজেও কোন প্রতিকারে সমর্থ হইল। এই ক্ষেত্রে সাহায্য করা একমাত্র সাচ্চা-সত্য আল্লাহরই কাজ। তাঁহারই প্রতিদান সর্বোত্তম ও তাঁহারই প্রতিবিধান সর্বোৎকৃষ্ট।
>
> — সূরা কাহফ ঃ ৩২-৪৪

এই আয়াতগুলো থেকে যা বোঝা গেল তাহল, বাগান মালিক স্রষ্টাকে অস্বীকার করার মত কোন ভুল করেনি। সে আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেনি, উল্টো সে ভেবেছিল যে, এমনকি সে যদি আল্লাহর কাছে হাজির হয় তখনও সে নিশ্চিতভাবেই বিনিময়ে আরও উত্তম প্রতিদান পাবে। তার এ ধারণা ছিল যে, সে যে মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়েছিল — তা কেবলি তার নিজের সাফল্যময় কর্মকান্ডের ফলস্বরূপ।

প্রকৃতপক্ষে, এরই সঠিক মানে হল আল্লাহর সঙ্গে শরীক সাব্যস্ত করাঃ আল্লাহ তায়ালার মালিকানাধীন সব বস্তুকে নিজের বলে দাবির চেষ্টা করা আর "প্রত্যেকের নিজস্ব কিছু প্রশংসনীয় গুণ বা ক্ষমতা রয়েছে"— এটা ভেবে মন থেকে আল্লাহর ভয় মুছে ফেলা; আরও ভাবা যে আল্লাহ কিছু মানুষকে কোন না কোনভাবে অনুগ্রহ করবেনই ইত্যাদি।

সাবার লোকেরা ঠিক এই জিনিসগুলোই করেছিল এবং ভেবেছিল। তাদের শাস্তিও ছিল একই ধরনের — তাদের পুরো এলাকা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল — তাই তারা বুঝতে পারল যে, তারা নিজেরা নিজেদের ক্ষমতাবলে কোন কিছুর অধিকারী ছিল না বরং তা তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক অনুগ্রহ করে দান করা হয়েছিল।

অধ্যায় আট

সুলাইমান (আঃ) এবং সাবার রাণী

বিলকিসকে বলা হইল, "এই প্রাসাদে প্রবেশ কর", (প্রবেশ পথে) যখন সে উহার আঙ্গিনা দেখিল, তখন সে উহাকে স্বচ্ছ পানি মনে করিল এবং তাহার পায়ের গোছ উন্মুক্ত করিল। সোলায়মান (আঃ) বলিলেন, "ইহা এক বেলোয়াড়ি প্রাসাদ"; তখন বিলকিস বলিল, "হে আমার প্রতিপালক! আমি নিজে আমার নিজের উপর অবিচার করিয়াছিলাম এবং (তখন) আমি সুলাইমানের সঙ্গী হইয়া বিশ্বপ্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিলাম।"

— সূরা নমল ঃ ৪৪

দক্ষিণ ইয়েমেনের প্রাচীন দেশ সাবায় অনুসন্ধান চালিয়ে সাবার রাণী ও সুলাইমান (আঃ)-এর সাক্ষাৎকার সংক্রান্ত কিছু ঐতিহাসিক রেকর্ড খুঁজে পাওয়া গেছে। সেখানকার ধ্বংসাবশেষের উপর অনুসন্ধান চালিয়ে জানা গেছে যে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ থেকে ৯২০ সনের মধ্যে অঞ্চলটিতে "এক রাণী" বসবাস করতেন যিনি উত্তরে জেরুজালেমের দিকে ভ্রমণ করেছিলেন।

এই দুই শাসকের মাঝে কি ঘটেছিল, তাঁদের দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, তাঁদের শাসনামল এবং আরও অন্যান্য কিছু সবিস্তারে বর্ণিত রয়েছে পবিত্র কোরআনের সূরা নমলে। সূরা নমলের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে কাহিনীটি। সুলাইমান (আঃ)-এর সেনাবাহিনীর এক সদস্য হুদ হুদ পাখির বয়ে আনা তথ্যের মাধ্যমেই কাহিনীতে সাবার রাণীর উল্লেখ শুরু হয়।

অতঃপর অনতিবিলম্বেই সে (হুদ হুদ পাখি) আসিয়া পড়িল এবং বলিতে লাগিল, "আমি এমন বিষয়ে অবগত হইয়া আসিয়াছি যাহাতে আপনি অবগত নহেন এবং আমি সাবা গোত্রের এক সুনিশ্চিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। আমি এক নারীকে দেখিয়াছি তাহাদের উপর রাজত্ব করিতেছে এবং তাহার নিকট একটি বড় সিংহাসন আছে। তাহাকে এবং তাহার সম্প্রদায়কে দেখিলাম,

তাহারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করিতেছে এবং শয়তান তাহাদের নিকট তাহাদের কার্যাবলী শোভন করিয়াছে এবং সৎপথ হইতে বিরত রাখিয়াছে সুতরাং তাহারা সৎপথে চলে না। অর্থাৎ তাহারা সেই আল্লাহকে সেজদা করে না যিনি (এমন শক্তিমান যে) আসমান জমিনের লুক্কায়িত বস্তুসমূহ প্রকাশ করেন এবং যাহা তোমরা গোপন রাখ এবং যাহা প্রকাশ কর সবই জানেন। আল্লাহ এমন সত্তা যিনি ব্যতীত কেহই ইবাদতের যোগ্য নহে। তিনি মহা আরশের অধিপতি।"

সুলাইমান (আঃ) বলিলেন, "আমি এখনই দেখিব তুমি কি সত্য বলিতেছ না মিথ্যাবাদীর অন্তর্ভুক্ত।"

— সূরা নমল ২২-২৭

হুদ-হুদের কাছ থেকে এই তথ্য পেয়ে সুলাইমান (আঃ) তাকে নিম্নে এই আদেশগুলো দিলেন ঃ

"আমার এই পত্রখানা লইয়া যাও এবং ইহা তাহার নিকট অর্পণ কর, অতঃপর তথা হইতে সরিয়া থাক এবং দেখ তাহারা পরস্পর কি সওয়াল-জওয়াব করে।"

— সূরা নমল ঃ ২১

এরপর সাবার রাণী চিঠি পাওয়ার পর যেসব ঘটনার অবতারণা হয়েছিল পবিত্র কোরআনে তার বর্ণনা রয়েছে ঃ

রাণী বলিল, "হে আমার সভাসদবৃন্দ! আমার নিকট একখানা পত্র অর্পণ করা হইয়াছে যাহা শ্রদ্ধার যোগ্য। তাহা সুলাইমান (আঃ)-এর পক্ষ হইতে এবং তাহাতে লেখা আছে ঃ "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, তোমরা আমার মোকাবেলায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিও না এবং আমার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া চলিয়া আস (সত্যধর্মের প্রতি)।"

সে বলিল, "হে আমার পরিষদবর্গ। এই বিষয়ে তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, আমি তো কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না যদ্যাবধি তোমরা আমার নিকট উপস্থিত না থাক।"

তাহারা বলিল, "আমরা বড় শক্তিশালী ও রণনিপুণ লোক (তাই যুদ্ধকে সঙ্গত মনে করি) আর অধিকার তো আপনারই হাতে। সুতরাং আপনিই ভাবিয়া দেখুন কি আদেশ করিতে হয়।" রাণী বলিল, "রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে (শত্রুরূপে) প্রবেশ করে তখন উহাকে ধ্বংস করিয়া দেয় এবং তথাকার অধিবাসীগণের মধ্যে যাহারা সম্মানী তাহাদের অপদস্থ করে এবং ইহারাও এইরূপ করিবে। কিন্তু আমি তাহাদের কিছু উপঢৌকন পাঠাইতেছি, অতঃপর দেখি, প্রেরিত লোকেরা কি (উত্তর) লইয়া আসে।"

অনন্তর সেই প্রেরিত লোকেরা যখন সুলাইমানের নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি বলিলেন, "তোমরা কি আমাকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে চাও? অতএব, আল্লাহ আমাকে যাহা কিছু দিয়া রাখিয়াছেন উহা সেই সমুদয় বস্তু অপেক্ষা অনেক উত্তম যাহা তোমাদিগকে দান করিয়াছেন। হ্যাঁ, তোমরাই তোমাদের এই উপঢৌকনে গর্বিত (ইহা আমি গ্রহণ করিব না) তোমরা তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাও, বস্তুত অবশ্যই তাহাদের বিরুদ্ধে এমন সেনাদল পাঠাইতেছি; যাহাদের সঙ্গে তাহারা আদৌ মোকাবেলা করিতে পারিবে না এবং আমি তাহাদের অপদস্থ করিয়া তাড়াইয়া দিব তথা হইতে এবং তাহারা অধীনস্থ হইয়া যাইবে (চিরতরে)।"

সুলাইমান বলিলেন, "হে আমার পরিষদবর্গ! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে আমার নিকট তাহারা আত্মসমর্পণ করার পূর্বেই তাহার সিংহাসনটি আমাকে আনিয়া দিবে?" এক বলিষ্ঠকায় জ্বীন বলিল, "আমি তাহা আপনার আসন ত্যাগের পূর্বেই আপনার নিকট উপস্থিত করিয়া দিব এবং আমি উহার উপর সক্ষম, বিশ্বস্ত।"

যাহার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিল সে বলিল, "আমি তাহা আপনার চক্ষুপলক ফেরানোর পূর্বেই আপনার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিতে পারি।"

অতঃপর সুলাইমান (আঃ) যখন ইহাকে তাঁহার সমক্ষেই দেখিতে পাইলেন, তিনি তখন বলিতে লাগিলেন, ইহাও আমার প্রতিপালকের

এক অনুগ্রহ, যেন আমাকে যাচাই করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি না অকৃতজ্ঞতা, আর যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে অবশ্য নিজের কল্যাণার্থেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর যে না-শোকরি করে তবে আমার প্রভু তোয়াক্কাহীন, মহিমাময়।"

সুলাইমান আদেশ দিলেন, "তাহার জন্য তাহার সিংহাসনটির আকৃতি বদলাইয়া দাও দেখি সে সঠিক দশা পায় না কি সে ঐ সকল লোকের দলভুক্ত যারা সঠিক দশা পায় না।"

অতঃপর যখন বিলকিস আসিয়া গেল তখন তাহাকে বলা হইল। "তোমার সিংহাসনটিকি এই রকমই?" সে বলিল, "হ্যাঁ, ইহাতো যেন ঐরূপই" এবং (এও বলিল) "আমরা তো এই ঘটনার পূর্বেই (আপনার নবুয়ত সম্বন্ধে) অবগত হইয়াছি এবং আমরা (তখন হইতেই) অনুগত হইয়া গিয়াছি।"

আর গায়রুল্লার ইবাদতই তাহাকে (স্বাভাবিক কারণে ঈমান আনয়ন হইতে) রুখিয়া রাখিয়াছিল, সে ছিল সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

বিলকিসকে বলা হইল, "এই প্রাসাদে প্রবেশ কর"; (প্রবেশ পথে) যখন সে উহার আঙিনা দেখিল তখন সে উহাকে স্বচ্ছ পানি মনে করিল এবং তাহার কাপড় গুটিয়ে নিয়ে পায়ের গোছ উন্মুক্ত করিল।

সুলাইমান বলিলেন, "এতো কেবল এক প্রাসাদ যাহা কাঁচের টুকরা দিয়া মসৃণভাবে গাঁথিয়া তৈরি করা হইয়াছে।"

রাণী বলিল, "হে আমার প্রতিপালক! বাস্তবিকই আমি আমার নিজের আত্মার উপর অবিচার করিয়াছিলাম এবং এখন আমি সুলাইমানের সঙ্গী হইয়া বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিলাম।"

— সূরা নমল ঃ ২৯-৪৪

KINGDOM OF SABA

যখন সাবার রাণী সুলাইমান (আঃ)-এর প্রাসাদ দেখলেন তখন অত্যন্ত অভিভূত হলেন এবং তিনি সুলাইমান (আঃ)-এর সাথে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। সাবার রাণীর দু' রাস্তায় যাতায়াতকে দেখান হয়েছে মানচিত্রটিতে

সুলাইমান (আঃ)-এর রাজপ্রাসাদ

কোরআন শরীফের যে অধ্যায় ও আয়াতসমূহে সাবার রাণীর উল্লেখ রয়েছে, সেখানে সুলাইমান (আঃ)-এর কথাও বিবৃত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে, তাঁর যে একটি জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ ছিল তা যেমন বলা হয়েছে তেমনি অন্যান্য কথাও সবিস্তারে বর্ণিত রয়েছে।

সে অনুসারে, সুলাইমান (আঃ) তাঁর সময়কালের সবচাইতে প্রাগ্রসর প্রযুক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর প্রাসাদে ছিল চিত্তহারী সব চিত্রকর্ম ও সব চিত্রকর্ম ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য, যে কেউ সেগুলো দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত। প্রাসাদের প্রবেশ পথটি ছিল কাঁচের তৈরি। পবিত্র কোরআনে এই প্রাসাদের বর্ণনা রয়েছে আর সাবার রাণীর উপর এই প্রাসাদ কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তার বর্ণনা এরূপঃ

> তাহাকে বলা হইল সুউচ্চ সুরম্য প্রাসাদে প্রবেশ করার জন্য, কিন্তু যখন সে তা দেখিল মনে করিল এটা পানির একটি জলাশয় আর সে কাপড় উঠাইয়া পা-দ্বয় উন্মুক্ত করিল।
>
> সুলাইমান (আঃ) বলিলেন, "ইহা তো কেবলই একটি প্রাসাদ যাহা মসৃণ কাঁচখণ্ড দিয়ে মসৃণ করিয়া গাঁথা হইয়াছে।" রাণী বলিল, "হে আমার প্রভু! বাস্তবিকই আমি আমার উপর অবিচার করিয়াছি; এখন আমি সুলাইমানের সঙ্গী হইয়া বিশ্ব প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিলাম।"
>
> — সূরা নমল ঃ ৪৪

ইহুদী সাহিত্যে সুলাইমান (আঃ)-এর প্রাসাদকে "সলোমনের মন্দির" নামে অভিহিত করা হয়। বর্তমানে তথাকথিত এই মন্দির বা প্রাসাদের কেবল "পশ্চিমের দেয়াল" টুকু দাঁড়িয়ে আছে আর ঠিক একই সময়ে ইহুদীগণ কর্তৃক এই জায়গাটির নামকরণও করা হয়েছে "হাহাকারের দেয়াল" নামে।

পরবর্তীকালের ইহুদীদের অন্যায় ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কারণে কেবল এই প্রাসাদই নয় এবং জেরুজালেমের অন্যান্য স্থানসমূহও ধ্বংস হয়ে যায়। নিম্নরূপে কোরআন আমাদের এ সম্বন্ধে অবগত করছে ঃ

> এবং আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাবের মধ্যে (ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে) এই কথা বলিয়া দিয়াছিলাম যে, "তোমরা (সিরিয়া) নগরীতে দুইবার বিশৃংখলা সৃষ্টি করিবে এবং অতিশয় বলপ্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিবে

> অতঃপর সেই দুইবারের নির্ধারিত সময়কাল যখন উপস্থিত হইবে তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার এমন বান্দাদিগকে ক্ষমতাসীন করিব, যাহারা ভয়ানক যোদ্ধা হইবে। তখন তাহারা তোমাদের গৃহাভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়িবে (এবং তোমাদিগকে হত্যা করিবে) ইহা এমন একটি প্রতিশ্রুতি যাহা অবশ্যই হইবে।"
>
> — সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪-৫
>
> "অতঃপর পুনরায় তোমাদিগকে তাহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি দিয়া সাহায্য করিব এবং তোমাদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করিয়া দিব।

যদি তোমরা সৎকাজ করিতে থাক তবে তোমরা নিজেদের উপকারার্থেই সৎকাজ করিবে ;

> আর যদি তোমরা পুনরায় মন্দ-কাজ কর তবে উহাও আপন সত্ত্বার (ক্ষতির) জন্যই করিবে; অতঃপর যখন সেই পরবর্তী প্রতিশ্রুতির মেয়াদ সমাগত হইবে, তখন আমি অন্যদের তোমাদের উপর ক্ষমতাসীন করিয়া দিব, যেন তাহারা তোমাদের চেহারা বিকৃত করিয়া দেয় এবং প্রথমবার যেভাবে ঐ লোকেরা মসজিদে (বাইতুল মুকাদ্দাসে) ঢুকিয়াছিল তদ্রূপ ইহারাও যেন ঢুকিয়া পড়ে এবং যাহা কিছুতে তাহাদের ক্ষমতা চলে তদসমুদয় যেন বিনাশ করিয়া দেয়।"
>
> — সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৬-৭

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে বর্ণিত সবগুলো সম্প্রদায়ই তাদের আল্লাহ বিরোধী মনোভাব এবং আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত অনুগ্রহে তাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত ছিল। সে কারণেই তাদেরকে বিপর্যয়সমূহ ভোগ করতে হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী কোন দেশ বা রাজ্য না থাকায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে ইহুদীরা সুলাইমান (আঃ)-এর সময়কালে পবিত্র ভূমিতে জায়গা বা দেশ খুঁজে পেল; কিন্তু তখন সকল সীমার বাইরে তাদের সীমালংঘনের দায়ে আর তাদের দুর্নীতি ও অবাধ্যতার কারণে আবার তারা ধ্বংস হয়ে গেল। আধুনিককালের ইহুদীরা, যারা নিকট অতীতে ঠিক সেই জায়গায় স্থায়ী হয়েছে, তারাও আবার দুর্নীতির জন্ম দিচ্ছে, আর প্রথম সাবধান বাণী পাওয়ার পূর্বে যেমন করেছিল ঠিক তেমনি "শক্তিশালী ঔদ্ধত্যের উল্লাসে মত্ত রয়েছে তারা এখন।"

সুলাইমান (আঃ)-এর প্রাসাদ
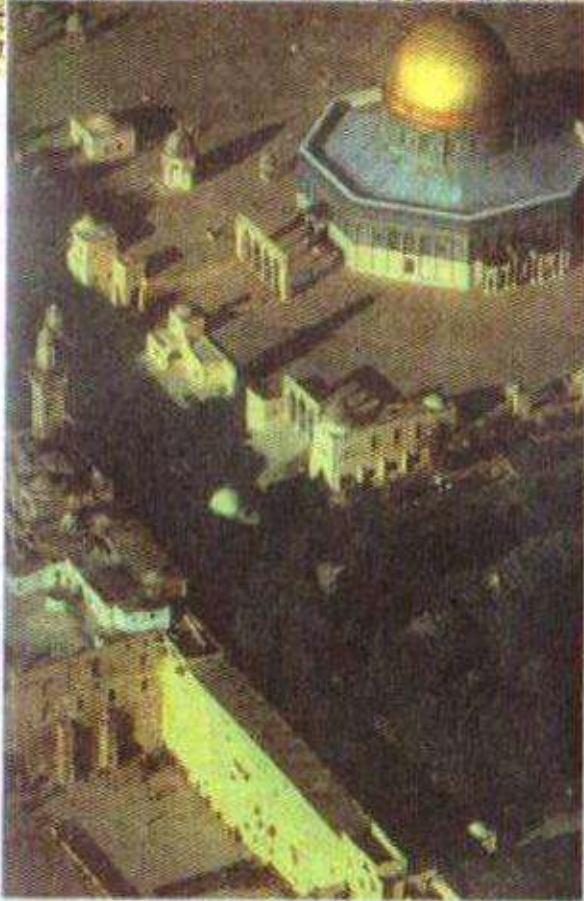
সুলাইমান (আঃ)-এর প্রাসাদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তা ইহুদীদের দ্বারা "হাহাকারের দেয়ালে" রূপান্তরিত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে মুসল- মানগণ জেরুজালেম জয় করে নেয় আর যে জায়গায় প্রাসাদটি একদা দাঁড়িয়েছিল সে জায়গায় উমরের মসজিদ এবং পাথরের ডোম নির্মাণ করে। এখনও জেরুজালেমে তা বর্তমান রয়েছে। ছবিতে ডান দিকে পাথরের ডোম গম্বুজ দেখা যাচ্ছে
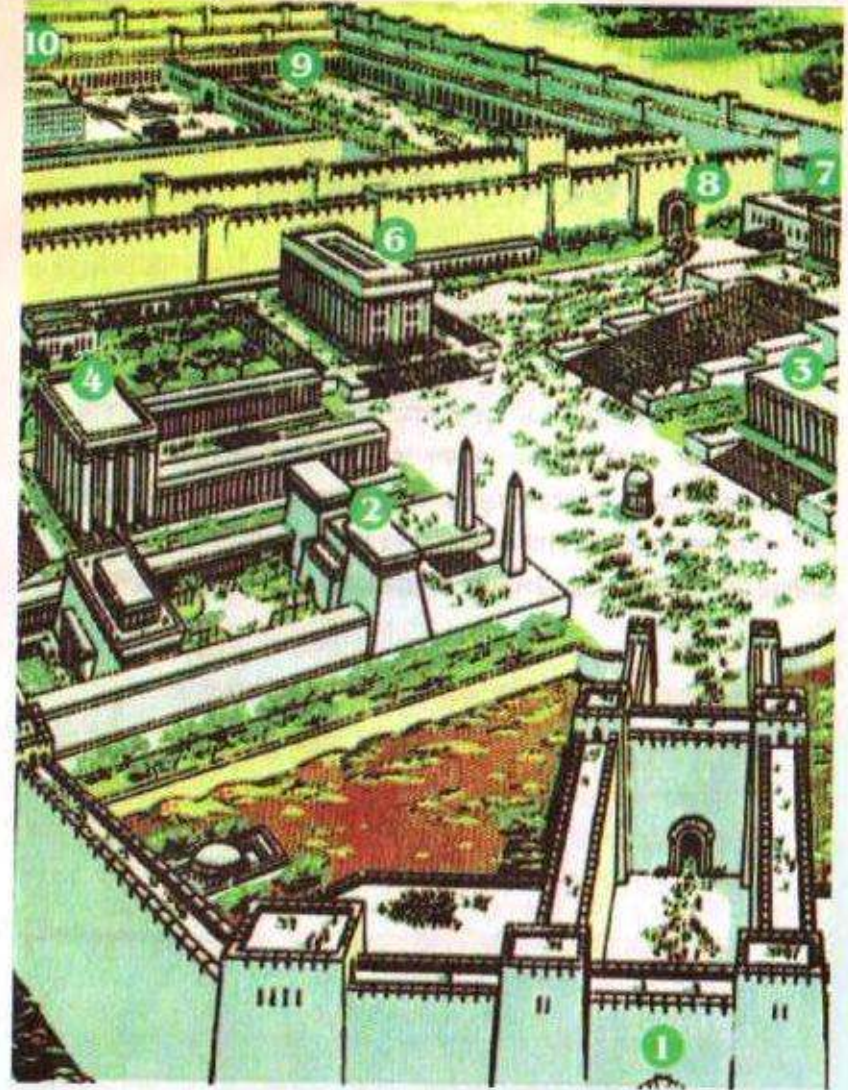
তখনকার সময়ের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে নির্মিত ছিল সলোমনের মন্দির এবং সেটির উৎকৃষ্ট দৃষ্টিনন্দন বোধ ছিল। উপরে সুলাইমান (আঃ)-এর রাজত্বকালে জেরুজালেমের কেন্দ্র দেখান হয়েছে। (১) দক্ষিণ-পশ্চিম দরজা, (২) রাণীর প্রাসাদ, (৩) সুলাইমান (আঃ)-এর প্রাসাদ, (৪) ৩২ স্তম্ভের প্রবেশ পথ, (৫) বিচারালয়, (৬) লেবাননের অরণ্য, (৭) ধর্ম প্রচারকদের বাসস্থান, (৮) প্রাসাদের প্রবেশদ্বার, (৯) প্রাসাদের প্রাঙ্গণ, (১০) প্রাসাদ

অধ্যায় নয়

গুহাবাসী সহচরবৃন্দ

আপনি কি মনে করেন যে সেই গুহাবাসী ও পর্বতবাসীগণ আমার বিস্ময়কর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি আশ্চর্য নিদর্শন ছিল ?

— সূরা কাহাফ ঃ ৯

পবিত্র কোরআনের ১৮ সূরার নাম হল "সূরা আল-কাহাফ" যার অর্থ "গুহা"। এই সূরাটি একদল তরুণের কথা বলেছে যারা তাদের শাসকের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াতে আশ্রয় নিয়েছিল একটি গুহায়। তাদের সেই শাসক আল্লাহকে অস্বীকার করত এবং ঈমানদারগণের উপর নিপীড়ন ও অবিচার করত। বিষয়টির উপর যে আয়াতগুলো রয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

আপনি কি মনে করেন যে সেই গুহাবাসী ও পর্বতবাসীগণ আমার বিস্ময়কর নিদর্শনাবলীর একটি আশ্চর্য নিদর্শন ছিল ?

সেই সময়টি স্মরণযোগ্য যখন যুবকেরা গুহায় আশ্রয় নিয়াছিল, অনন্তর তাহারা বলিয়াছিল, "হে আমাদের প্রভু! আপনার পক্ষ হইতে আমাদের উপর করুণা বর্ষণ করুন এবং এই কাজে আমাদের জন্য যথার্থতার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিন।"

অতঃপর সেই গুহায় আমি তাহাদের কর্ণে বছরের পর বছর পর্যন্ত নিদ্রার আবরণ ফেলিয়া রাখিলাম।

অতঃপর তাহাদিগকে জাগ্রত করিলাম, যেন আমি জ্ঞাত হইতে পারি যে তাহাদের উভয় দলের মধ্যে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে অধিকতর অবগত ছিল।

আমি আপনার নিকট তাহাদের সঠিক বর্ণনা করিতেছি তাঁহারা ছিলেন কয়েকজন যুবক, যাঁহারা নিজেদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছিলেন এবং আমি তাঁহাদিগকে অধিক হেদায়েত দান করিয়াছিলাম।

এবং আমি তাঁহাদের অন্তর অটল করিয়া দিলাম, যখন তাঁহারা সুদৃঢ় হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, "আমাদের প্রভুতো তিনিই যিনি আসমান-জমিনের প্রতিপালক, আমরা তাঁহাকে বর্জন করিয়া অন্য কোন মা'বুদকে ডাকিব না, কারণ তদবস্থায় আমরা গুরুতর অযথা উক্তিই করিব।

আমাদের এই স্ব-জাতিগণ যাহারা আল্লাহকে বর্জন করিয়া অন্য মা'বুদ সাব্যস্ত করিয়াছে। তাহারা সেই উপাস্যগণ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন প্রমাণ কেন উপস্থিত করে না? অতএব সেই ব্যক্তি হইতে অধিক অনাচারী কে হইতে পারে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে?

আর যখন তোমরা তোমাদের ও তাহাদের মা'বুদ হইতে ভিন্ন হইয়া গিয়াছ কিন্তু আল্লাহ হইতে (ভিন্ন হও নাই) তবে তোমরা গুহায় আশ্রয় লও; তোমাদের প্রভু তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুকম্পা প্রশস্ত করিবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের এই কাজে সফলতার উপকরণ ঠিক করিয়া দিবেন।"

আর হে শ্রোতা! তুমি দেখিবে, সূর্য যখন উদিত হয় তখন উহা তাহাদের গুহার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া সরিয়া যাইতেছে। আর যখন অস্তমিত হয়, তখন উহা গুহার বাম পার্শ্ব দিয়া সরিয়া যাইতেছে। আর তাঁহারা গুহার একটি প্রশস্ত স্থানে ছিলেন। ইহা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন। আল্লাহ যাহাকে হেদায়েত দেন সে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়, আর যাহাকে বিপথগামী করেন বস্তুত তাহার জন্য আপনি কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাইবেন না।

আর হে শ্রোতা! তুমি তাঁহাদের দেখিলে জাগ্রত মনে করিতে, অথচ তাঁহারা নিদ্রারত; আর আমি তাঁহাদিগকে (কোন সময়) ডান দিকে (আবার কোন সময়) বাম দিকে পার্শ্ব বদলাইয়া দিতে ছিলাম; আর তাহাদের কুকুরটি দহলিজের সম্মুখে হস্তদ্বয় সম্প্রসারিত অবস্থায় ছিল; (হে শ্রোতা!) তুমি যদি তাহাদিগকে উঁকি মারিয়া দেখিতে তবে তুমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিতে এবং তোমার মধ্যে তাহাদের ভয়ে আতংক সঞ্চারণ করিত।

অতঃপর এইভাবে আমি তাঁহাদিগকে জাগ্রত করিলাম, যেন তাঁহারা (এই নিদ্রা সম্বন্ধে) একে অপরের নিকট জিজ্ঞাসা করে।

তাঁহাদের একজন বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা (নিদ্রায়) কতক্ষণ ছিলে? কেহ কেহ বলিলেন, (সম্ভবত) "একদিন অথবা একদিন অপেক্ষা কিছু কম ছিলাম।"

আর কেহ কেহ বলিলেন, "ইহাতে তোমাদের প্রভুই ভাল জানেন যে, তোমরা কতক্ষণ ছিলে। এখন নিজেদের কাহাকেও এই মুদ্রাটি দিয়া শহরে পাঠাও; অতঃপর সে হালাল খাদ্য যাচাই করিয়া উহা হইতে যেন তোমাদের জন্য কিছু খাদ্য লইয়া আসে অতঃপর সে যেন (সবকিছু) সুকৌশলে সমাধা করে এবং কাহাকেও যেন তোমাদের সংবাদ জানিতে না দেয়। (কারণ) তাহারা যদি তোমাদের সন্ধান পায় তবে তোমাদিগকে হয়ত প্রস্তরাঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিবে। অথবা তাহাদের ধর্মে ফিরাইয়া নিবে। আর যদি তাহা হয় তবে তোমাদের কখনও সফল হইবে না।"

আর আমি এইরূপেই তাঁহাদের সম্বন্ধে লোক সমাজে জানাইয়া দিলাম, যাহাতে তাহারা এই বিষয়ে আস্থাবান হয় যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কেয়ামতে কোন সন্দেহ নাই। সেই সময়টিও স্মরণীয়, যখন সে সময়কার লোকেরা নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করিতেছিল তাহাদের বিষয়ে, তখন তাহারা বলিল, "তাঁহাদের (গুহা) পার্শ্বে একটি সৌধ নির্মাণ কর," তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের সম্বন্ধে খুবই ভাল জানিতেন, যাহারা নিজেদের কার্যে প্রবল ছিল, তাহারা বলিল, "আমরা নিশ্চয়ই তাহাদের গুহা পার্শ্বে একটি মসজিদ নির্মাণ করিব।

কতিপয় লোক তো বলিবে, "তাঁহারা ছিলেন তিনজন, চতুর্থ তাঁহাদের কুকুর," আর কেহ কেহ বলিবে "তাঁহারা ছিলেন পাঁচজন, ষষ্ঠ তাঁহাদের কুকুর ছিল," ইহারা তথ্যহীন কথা লইয়া হাঁকিতেছে। আর কতিপয় লোক বলিবে, "তাঁহারা ছিলেন সাতজন এবং অষ্টম ছিল তাঁহাদের কুকুর।"

আপনি বলুন, আমার প্রভুই তাঁহাদের সংখ্যা খুবই সঠিকরূপে অবগত আছেন, খুব কম লোকেই তাহাদের জানে। সুতরাং আপনি তাঁহাদের বিষয়ে মোটামুটি আলোচনা ব্যতীত অধিক তর্কে যাইবেন না এবং উহাদের সম্বন্ধে ইহাদের কাহারও নিকট কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না।

আর আপনি কোন বিষয়ে এইরূপ বলিবেন না যে, "আমি আগামীকাল উহা করিব," অবশ্য আল্লাহর অভিপ্রায়ে উহার সহিত সংযোগ করিবেন। আর যদি ভুলিয়া যান তবে (পরে) আপনার প্রভুর নাম স্মরণ করিবেন এবং বলিয়া দিবেন যে, "আশা করি আমার প্রভু ইহার (গুহাবাসীর বিবরণ) অপেক্ষা আমাকে নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ অধিকতর নিকটতম বিষয় বাতলাইয়া দিবেন।"

আর তাঁহারা নিজেদের গুহায় (ঘুমাইয়া) তিনশত বছর পর্যন্ত এবং (চান্দ্রমাস হিসাবে) আরও নয় বছর বেশি ছিলেন।

আপনি বলুন, আল্লাহই তাঁহাদের অবস্থান মেয়াদ সম্বন্ধে খুবই অবগত আছেন, সমস্ত নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের গায়েবী জ্ঞান তাঁহার নিকট, তিনি কেমন আশ্চর্য দ্রষ্টা ও কেমন আশ্চর্য শ্রোতা। তোমাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহই সহায়ক নাই এবং আল্লাহ তায়ালা নিজের আদেশের মধ্যে কাহাকেও শরীক করেন না।

— সূরা আল-কাহাফ ঃ ৯-২৬

বহু প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, ইসলামিক ও খ্রিস্টান সূত্র কর্তৃক প্রশংসিত গুহার অধিবাসীগণ রোমান সম্রাট ডেসিয়াস-এর নিষ্ঠুর নিপীড়নের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। ডেসিয়াসের নির্যাতন আর অবিচার দেখে এই তরুণ লোকগণ তাঁদের নিজেদের জনগণকে এই মর্মে সতর্ক করে দেন যেন তারা আল্লাহর ধর্মকে পরিত্যাগ না করে। তাদের এই বার্তার আদান-প্রদান তাদের জনগণের উদাসীনতা, সম্রাটের নিপীড়ন বৃদ্ধি এবং জনগণকে মৃত্যুর ভয় দর্শানো ইত্যাদি সব মিলে তাদেরকে নিজেদের বাড়ি ত্যাগে বাধ্য করল।

ঐতিহাসিক দলিলসমূহ যে ঘটনাসমূহের যথার্থতা যাচাই করে তাহল যে, যে সকল বিশ্বাসীগণ প্রাথমিক যুগের খ্রিস্টান ধর্মকে তার মৌলিক ও পবিত্ররূপে রাখার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াতেন, তাদের উপর বহু সম্রাট ত্রাস, নিপীড়ন আর অবিচারের নীতিমালা ব্যাপকভাবে কার্যকরী করত।

উত্তর-পশ্চিম আনাতোলিয়ার রোমান গভর্নর (৬৯-১১৩ সন) কর্তৃক সম্রাট ট্রায়ানাস-কে লিখিত এক চিঠিতে তিনি ঈসা (আঃ)-এর সহচর (খ্রিষ্টান)-দের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, "তাঁরা সম্রাটের প্রতিমূর্তিকে পূজা করতে অস্বীকার করায় তাঁদের শাস্তি দেয়া হয়েছে।" তখনকার সময়ের প্রাথমিক খ্রিষ্টানদের উপর যে অত্যাচার নেমে আসত তারই প্রমাণ বর্ণিত রয়েছে যে, সমস্ত ডকুমেন্টে তাদেরই একটি দলিল এই চিঠিখানা। এই পরিস্থিতিতে সে সকল তরুণ যুবকেরা; যাদেরকে অধার্মিক প্রথাসমূহে বশ্যতা স্বীকার করতে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে সম্রাটকে দেবতা হিসেবে পূজা করতে বলা হয়েছিল, তাঁরা তা মেনে নিতে পারেনি। তাঁরা তখন বলেছিলেন ঃ

> "আমাদের প্রভু স্বর্গের ও এই পৃথিবীর প্রভু; কখনও আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য কাউকে ডাকিব না, কারণ তদবস্থায় আমরা গুরুতর অযথা উক্তিই করিব।
>
> আমাদের এই স্বজাতিগণ যাহারা আল্লাহকে বর্জন করিয়া অন্য মা'বুদ সাব্যস্ত করিয়াছে তাহারা সেই উপাস্যগণ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট প্রমাণ কেন উপস্থিত করে না? অতএব সে ব্যক্তি হইতে অধিক অনাচারী কে হইতে পারে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে?"
>
> — সূরা কাহাফ ঃ ১৪-১৫

গুহাবাসীগণ যে অঞ্চলটিতে বসবাস করতেন তা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে।

এদের মধ্যে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত হল "এফেসাস" ও "টারসাস" নামে দুটি জায়গা।

প্রায় সমস্ত খ্রিষ্টান সূত্রগুলো এফেসাসকে সে অবস্থান বলে দেখান, যেখানে এই তরুণ বিশ্বাসীরা আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিছু মুসলমান গবেষক ও কোরআনের ভাষ্যকারগণও এফেসাসের ব্যাপারে খ্রিষ্টানদের সঙ্গে একমত। বাকীরা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে সেই জায়গাটি এফেসাস ছিল না এবং এরপর প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে ঘটনাটি টারসাসেই ঘটেছিল। এই আলোচনায় দু'টি বিকল্প জায়গা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা আলোচনা করা হবে। তথাপি, খ্রিষ্টানগণ, এসব গবেষক ও ভাষ্যকারগণ বলেছেন যে, ঘটনাটি প্রায় ২৫০ সনে রোমান সম্রাট ডেসিয়াসের (ডেসিয়ানাস বলেও ডাকা হয়) সময়কালে ঘটেছিল।

ডেসিয়াস, রোমান সম্রাট বলে পরিচিত নেরুর সঙ্গে মিলে খ্রিষ্টানদের অত্যন্ত নির্মমভাবে অত্যাচার করত। তার স্বল্প স্থায়ী শাসনামলে, সে একটি আইন পাস করে, যা তার শাসনাধীন প্রতিটি লোককে রোমান দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দিতে বাধ্য করেছিল। প্রতিটি ব্যক্তি এসব দেবতার জন্য উৎসর্গ করতে বাধ্য হত; অধিকন্তু, তারা যে এ কাজ সম্পন্ন করেছে তার জন্য সার্টিফিকেট নিয়ে রাজ-কর্মচারীদের দেখাতে হত। যারা তা মানত না তাদের প্রাণদণ্ড দেয়া হত। খ্রিষ্টান সূত্র হতে, এটা লেখা রয়েছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিষ্টানগণ এই পৌত্তলিক কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায় ও "এক নগর থেকে অন্য নগরে" পালিয়ে বেড়ায় কিংবা গোপন কোন আশ্রয়ে আত্মগোপন করে। খুব সম্ভবত গুহাবাসীগণ এই প্রাথমিক খ্রিষ্টান দলেরই একটি দল হবে।

ইত্যবসরে, এখানে একটি বিষয়ের উপর জোর দিতে হয়েছে ঃ এই বিষয়টি কিছু মুসলিম ও খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক ও ভাষ্যকারগণ কর্তৃক গল্পের আকারে আলোচিত হয়েছে আর বেশ মিথ্যা ও শোনা কথা তাতে যোগ হওয়ায় তা একটি উপাখ্যানে পরিণত হয়েছে। যাই হোক এই ঘটনাটি একটি ঐতিহাসিক বাস্তব অস্তিত্ব।

গুহাবাসীগণ কি এফেসাসের লোক ছিলেন ?

যে নগরীতে গুহাবাসীগণ বাস করতেন, আর যে গুহাটিতে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে বিভিন্ন উৎসমূহে বিভিন্ন স্থানের নাম নির্দেশ করা হয়ে থাকে। এর প্রধান কারণ হল ঃ মানুষ এটা বিশ্বাস করার জন্য কামনা করে যে এমন সাহসী ও নির্ভীক অন্তরের লোক তাদের শহরে বাস করত আর এই অঞ্চলগুলোর গুহাগুলোর মধ্যে বেশ মিলও ছিল। ফলে দৃষ্টান্তস্বরূপ জায়গাগুলোর প্রায় সবগুলোতেই গুহাগুলোর উপরে একটি করে প্রার্থনার জায়গা নির্মিত হয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে।

খ্রিষ্টানগণ এফেসাসকে একটি পবিত্র জায়গা বলে গ্রহণ করেছিল বলে সুবিদিত রয়েছে। কেননা বলা হয় যে, এই নগরীটিতে কুমারী মেরির একটি ঘর রয়েছে, যা পরবর্তীতে চার্চে (গীর্জায়) রূপান্তরিত করা হয়েছিল তাই। গুহার অধিবাসীগণ এই পবিত্র স্থানগুলোর কোন একটিতে বাস করতেন। অধিকন্তু কিছু কিছু খ্রিষ্টান সূত্রমতে এটাই যে সেই জায়গা ছিল সে সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
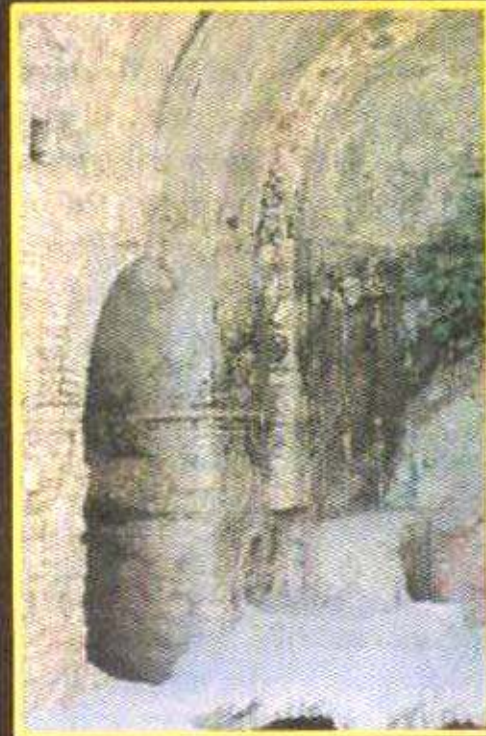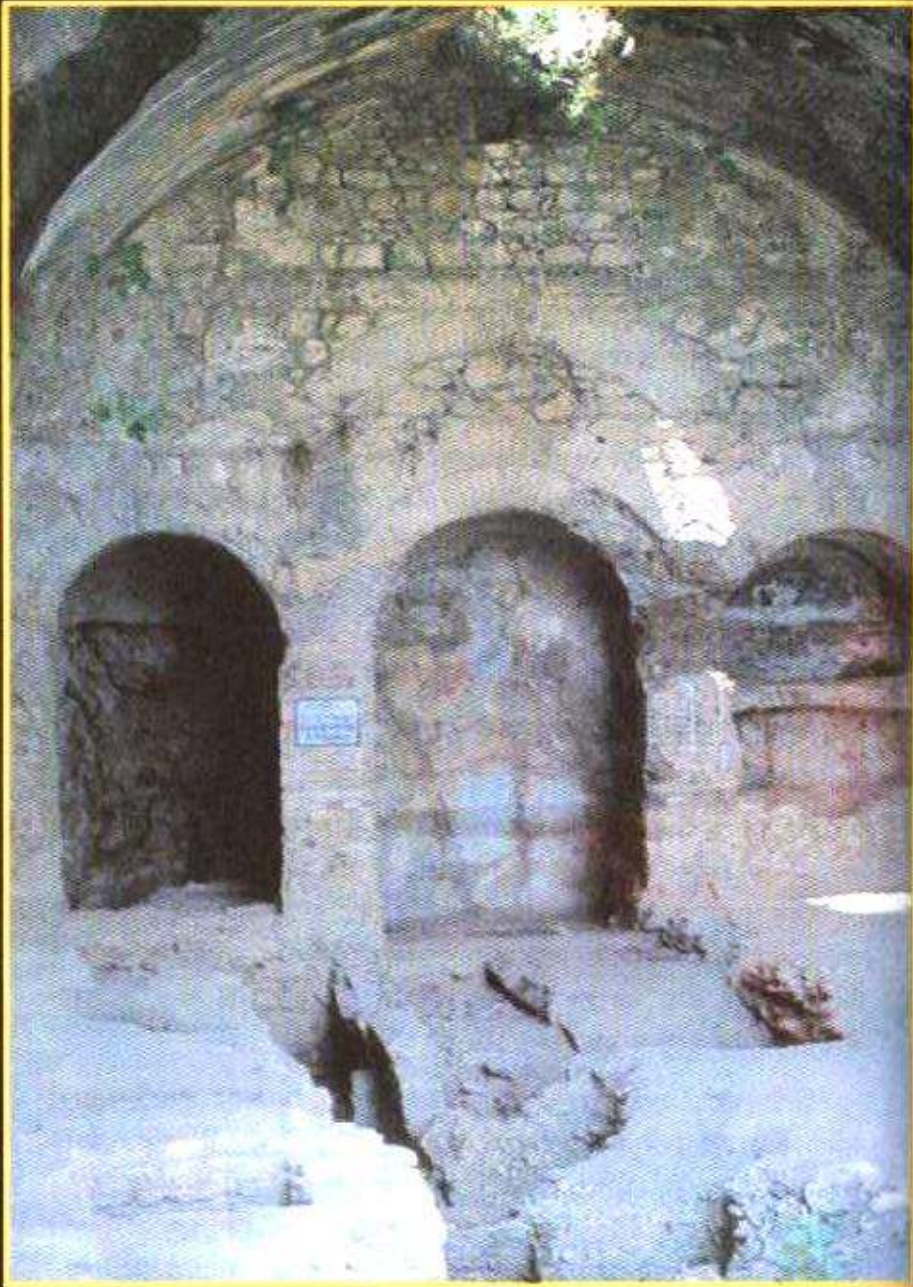
এফেসাসে গুহার
সহচরবৃন্দের গুহা বলে
অনুমিত একটি
পর্বতগুহার অভ্যন্তরভাগ
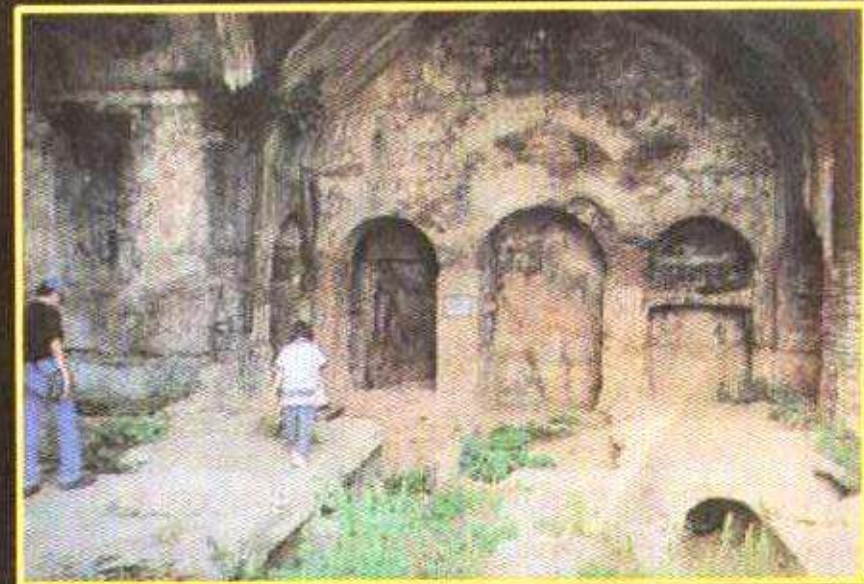
সিরিয়ার ধর্মযাজক, জেমস অব সেরুক (জন্ম ঃ ৪৫২) এই বিষয়টির একজন প্রাচীনতম সূত্র বলে জানা যায়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গীবন, জেমস-এর "The Decline and Fall of the Roman Empire" নামক বইখানিতে তার অনুসন্ধান হতে অসংখ্য বিবৃতি তুলে ধরেছিলেন। এই বই অনুসারে, যে সম্রাট এ সাতজন খ্রিস্টান বিশ্বাসীদের উপর নির্যাতন চালায় ও তাদেরকে পলায়ন করে গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করে সেই সম্রাটের নাম ছিল ডেসিয়াস।

ডেসিয়াস ২৪৯ থেকে ২৫১ সন পর্যন্ত রোমান সাম্রাজ্য শাসন করে এবং ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের উপর অত্যাচার চালানোর জন্য তার শাসনামল কুখ্যাত ছিল। মুসলিম ভাষ্যকারগণের মতে, যে অঞ্চলটিতে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল তার নাম হয় "এফেসাস" কিংবা "এফেসস"। গীবনের মতে, জায়গাটি হল, এফেসাস।

আনাতোলিয়ার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এই নগরীটি রোমান সাম্রাজ্যের একটি বৃহত্তম বন্দর ও নগরী ছিল। বর্তমানে এই নগরীর ধ্বংসাবশেষ "প্রাচীন এফেসাস নগরী" (The Antique City of Ephesus) নামে পরিচিত।

যে সময়কালে গুহাবাসীগণ লম্বা ঘুম থেকে জেগে উঠেছিলেন সে সময়ের সম্রাটের নাম, মুসলিম গবেষকদের মতে ছিল, তেযুসিয়াস (Tezusius), আর গীবনের মতে ছিল, থিওডসিয়াস-২ (Theodosius-II). রোমান সাম্রাজ্য খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পরে, ৪০৮ থেকে ৪৫০ সন পর্যন্ত এই সম্রাট শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

নিচের আয়াতটিকে উল্লেখ করে কিছু কিছু ধারা বর্ণনায় এটা বলা হয়ে থাকে যে গুহার প্রবেশদ্বারটি উত্তরমুখী ছিল আর তাই সূর্য ভিতরে প্রবেশ করতে পারত না। সেজন্য গুহার পাশ দিয়ে কেউ অতিক্রম করে গেলেও গুহার অভ্যন্তরে কি ছিল তা মোটেও দেখতে পেত না। এই সম্পর্কিত আয়াতটি আমাদের অবহিত করছে ঃ

> (আর হে শ্রোতা!) "তুমি দেখিবে, সূর্য যখন উদিত হয়; তখন উহা তাহার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া সরিয়া যাইতেছে, আর যখন অস্তমিত হয় তখন উহা গুহার বামপার্শ্ব দিয়া সরিয়া যাইতেছে। আর তাঁহারা গুহার একটি প্রশস্ত স্থানে ছিলেন। ইহা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের

> একটি। আল্লাহ যাহাকে হেদায়েত দেন সে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয় আর যাহাকে বিপথগামী করেন বস্তুত তাহার জন্য আপনি কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাইবেন না।"
>
> — সূরা কাহাফ ঃ ১৭
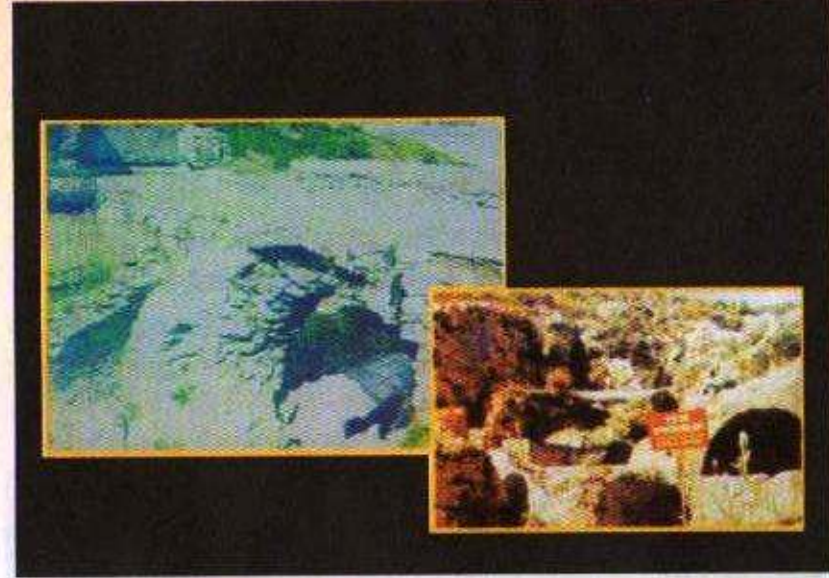
বাইরে থেকে দেখা এফেসাসের গুহা

প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ মূসা "এফেসাস" নামক তার একটি বইয়ে যে জায়গায় সাতজন বিশ্বাসীর দল বাস করত সেই জায়গাটির নাম এফেসাস বলে নির্দেশ করেন।

খ্রিস্টপূর্ব ২৫০ সনে এফেসাসে বসবাসকারী সাতজন যুবক পৌত্তলিকতা পরিহার করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। এই যুবকেরা বের হয়ে আসার পথ খুঁজতে গিয়ে পিওন পর্বতের পূর্ব ঢালে একটি গুহার সন্ধান পান। রোমান সৈন্যরা তা দেখতে পায় ও গুহার প্রবেশদ্বারে একটি দেয়াল নির্মাণ করে।[৪৫]

বর্তমানে এটা স্বীকার করা হয় যে, এসব পুরনো ধ্বংসাবশেষ ও কবরের উপর বহু ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। ১৯২৬ সনে অস্ট্রিয়ান আর্কিও লজিক্যাল ইনস্টিটিউট কর্তৃক খননকার্য চালানোর সময় এটা জানা যায় যে,

পিওন পর্বতের পূর্ব ঢালে যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে তা একটি স্থাপনা ছিল যা সপ্তম শতাব্দীর (থিওডসিয়াস-এর শাসনকালে) মাঝামাঝিতে গুহাবাসীগণের পক্ষ থেকে নির্মাণ করা হয়।

গুহার অধিবাসীগণ কি টারসাসে বাস করতেন ?

দ্বিতীয় যে স্থানটিতে গুহার সহচররা থাকতেন বলে বলা হয়ে থাকে তার নাম হল, "টারসাস"। সত্যিই পবিত্র কোরআনে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঠিক সেরকমই একটি গুহা টারসাসের উত্তর-পশ্চিমে একটি পর্বতে বিদ্যমান রয়েছে। পর্বতটির নাম হয় এনসিলাস কিংবা বেনসিলাস হয়ে থাকবে।

অসংখ্য ইসলামিক পন্ডিতের দৃষ্টিতে 'টারসাস'ই হল সেই প্রকৃত জায়গা। পবিত্র কোরআনের এক অন্যতম প্রধান ভাষ্যকার আত্‌তাবারী তাঁর "তারিখ আল-উমাম" নামক বইটিতে উল্লেখ করেন যে, যে পর্বতে গুহাটি অবস্থিত ছিল সেই পর্বতের নাম 'বেনসিলাস' এবং তিনি আরো বলেন যে পর্বতটি ছিল 'টারসাসে'।[৪৭]
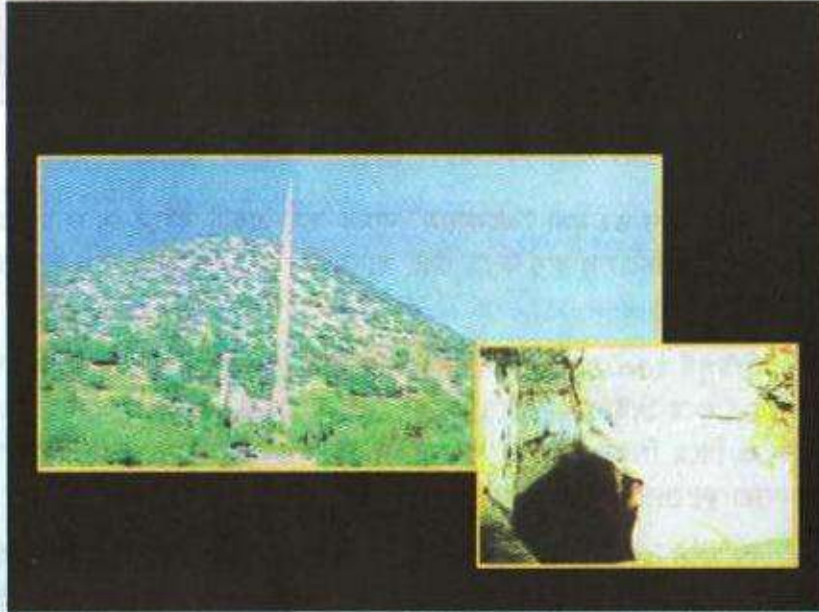
টারসাসের গুহা যেটিকে গুহার সহচরদের গুহা বলে মনে করা হয়

আবার কোরআনের অন্য আরেকজন প্রখ্যাত ভাষ্যকার মোহাম্মদ আমিন উল্লেখ করেন যে, পর্বতটির নাম ছিল 'পেনসিলাস' এবং তা ছিল টারসাসে (Tarsus)। পেনসিলাস বলে উচ্চারিত শব্দটি কখনও আবার এনসিলাস বলেও উচ্চারিত হয়। তার মতে "B" বর্ণের উচ্চারণের ভিন্নতার ফলেই শব্দটির মাঝে ভিন্নতা এসেছে কিংবা মূল শব্দটি থেকে একটি বর্ণ হারিয়ে যাওয়ার ফলেও হতে পারে যাকে বলা হয় "ঐতিহাসিক শব্দ ঘষে তুলে ফেলা।"[৪৮]

অন্য আরেকজন সুপরিচিত কোরআনের সাধক ফখরুদ্দিন আর-রাযী তাঁর কাজে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে "এমনকি যদিও এই জায়গাটিকে এফেসাস বলা হয়ে থাকে, এখানে আসলে টারসাসকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়। কেননা, টারসাসের ঠিক অন্য একটি নাম হল এফেসাস।"[৪৯]

অধিকন্তু, কাজী আল-বাইদাওয়ী ও আন-নাসাফীর বর্ণনা, আল-জালালাঈন ও আত-তিবীযান-এর বর্ণনা, এলমালি এবং অ. নাসুহি বিলমেন-এর বর্ণনা এবং অন্যান্য পন্ডিতগণের বর্ণনায় জায়গাটি টারসাস বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

তাছাড়া এ বর্ণনাগুলোর সবগুলোই পবিত্র কোরআনের ১৭ আয়াতটির ব্যাখ্যা করে, "সূর্য যখন উদিত হত তখন তা দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়ে চলে যেত, আর যখন অস্ত যেত তখন তা বাম পার্শ্ব দিয়ে দূরে সরে যেত।" তারা বলেন যে পর্বতে গুহার মুখটি উত্তরমুখী ছিল।[৫০]

ওটোম্যান সাম্রাজ্যকালে গুহার সহচরবৃন্দের বাসস্থান ও একটি কৌতূহলের বিষয় ছিল এবং এর উপর কিছু গবেষণাও চালান হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর দফতরে ওটোম্যান আর্কাইভস বা সরকারী দলিলপত্রে বিষয়টির উপর কিছু সংবাদ ও তথ্য আদান-প্রদানের আলামত বিদ্যমান আছে।

উদাহরণস্বরূপ, টারসাসের স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক ওটোম্যান রাজ্যের রাজকোষ প্রধানকে লেখা একটি চিঠিতে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ ও তদ্‌সহ একটি তথ্য যুক্ত রয়েছে যাতে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে এই ব্যাপারটিতে যে, আসহাব-ই কাহাফ (গুহার সহচরবৃন্দ)-এর গুহাটি সংরক্ষণ

ও পরিচ্ছন্ন করার কাজে লিপ্ত লোকদের বেতন দেয়ার দাবি করা হয়েছিল। চিঠির উত্তরে উল্লেখ করা হয় যে, রাজকোষ হতে শ্রমিকদের বেতন দিতে হলে জায়গাটিতে প্রকৃতই গুহার সহচরগণ বাস করতেন কিনা তা সন্ধান করে দেখা প্রয়োজন। গুহাটির প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করার ব্যাপারে চালানো গবেষণাকার্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

ন্যাশনাল কাউন্সিল কর্তৃক তদন্তের পর যে রিপোর্ট তৈরি হয় তাতে উল্লেখ করা হয়, "টারসাসের উত্তরে আদানা প্রদেশে, টারসাস থেকে দু' ঘন্টা পথের দূরত্বে একটি পর্বতে একটি গুহা রয়েছে আর কোরআনের বর্ণনার মতই এই গুহাটি উত্তরমুখী।"[৫১]

গুহার সহচরবৃন্দ কারা ছিলেন, কোথায় ও কখন তাঁরা বসবাস করতেন এ বিষয়ে যে বিতর্কের অবতারণা হয়েছিল তা সবসময়ই এই বিষয়টির উপর কর্তৃপক্ষকে গবেষণা চালানোর ব্যাপারে পরিচালিত করে আসছে, আর বিষয়টির উপর বহু বিবৃতিও রয়েছে। তথাপি এ বিবৃতিসমূহের কোনটিকেই নিশ্চিত বলে ধরা হয় না আর সেজন্য কোন সময়কালে বিশ্বাসী যুবকগণ বাস করতেন এবং কোথায় তাঁদের গুহা যা আয়াতে উক্ত রয়েছে, এসব প্রশ্নগুলো বারবারই সঠিক কোন উত্তরবিহীন অবস্থায়ই রয়ে গিয়েছে।

উপসংহার

"তাহারা কি ধরাতলে চলাফেরা করে নাই? যাহাতে তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়া লইত যে তাহাদের পূর্বে যাহারা অতীত হইয়া গিয়াছে তাহাদের পরিণাম ফল কি হইল? তাহারা ইহাদের অপেক্ষা শক্তিতে ছিল অধিকতর এবং তাহারা জমিনকে বর্ষণ, বপনও করিয়াছিল এবং যে পরিমাণ জমি ইহারা আবাদ করিয়াছে তাহারা তদপেক্ষা অধিকতর আবাদ করিয়াছিল এবং তাহাদের নিকটও তাহাদের নবীগণ মোজেযা সহকারে আসেন, বস্তুত আল্লাহ পাক এমন ছিলেন না, তাহাদের প্রতি অবিচার করিতেন। কিন্তু তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর অবিচার করিতেছিল।"

— সূরা রূম ঃ ৯

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে সমস্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছি তাদের সবারই সাদৃশ্যপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, যেমনঃ আল্লাহর আইন অমান্য করা, তাঁর সঙ্গে শরীক সাব্যস্ত করা, জমিনে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করা, অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পত্তি লোভীর ন্যায় গ্রাস করা, যৌন বিকৃতির দিকে ঝুঁকে পড়া, দাম্ভিকপ্রবণ হওয়া। আরেকটা বৈশিষ্ট্যে তাদের সাদৃশ্য ছিল তাহল যে তারা তাদের আশে-পাশের নিকটবর্তী মুসলমানদের নিপীড়ন ও তাদের প্রতি অন্যায় করত। তারা মুসলমানদের দমিয়ে রাখার প্রতিটি উপায় খুঁজে বেড়াত।

পবিত্র কোরআনে সতর্কবাণীগুলোর উদ্দেশ্য অবশ্যই কেবল ঐতিহাসিক শিক্ষা বর্ণনার জন্য ছিল না। কোরআন উল্লেখ করে যে, নবীদের ঘটনাসমূহ উদাহরণ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

যে নবীগণ বিগত হয়ে গিয়েছেন, তাঁদের উদাহরণ জ্ঞাত হয়ে তাঁদের পরে যারা আসবে, তাদের নিজেদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করা উচিত হবে।

"ইহাতে কি তাহাদের উপদেশ বর্ণিত হয় নাই যে আমি তাহাদের পূর্ববর্তী বহু গোত্র নিপাত করিয়া দিয়াছি, যাহাদের (অনেকের) বাসস্থানের উপর দিয়া উহারাও যাতায়াত করে? ইহাতে তো বিচক্ষণদের জন্য যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে।"

— সূরা ত্বাহা ঃ ১২৮

যদিও আমরা এসব ঘটনাগুলোকে উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করে দেখি তবে দেখতে পাই, অবক্ষয় ও সীমালংঘনের দিক থেকে আমাদের সমাজের কিছু অংশ কোনভাবেই সেসব সম্প্রদায়গুলো হইতে অধিক ভাল নয় — যারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং যাদের কথা এই গল্পগুলোতে বর্ণিত হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, আমাদের যুগের বেশির ভাগ সমাজেই সমকামী ও পায়ুকামীদের বড় একটা অংশ রয়েছে যারা আমাদের লূত সম্প্রদায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। সমকামীরা সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে অতীতে সডম ও গমররাহ নগরে বিদ্যমান তাদেরই সদৃশ লোকদের চাইতেও বেশি পরিমাণে সব ধরনের যৌন বিকৃতি প্রদর্শন করে থাকে। বিশেষ করে তাদেরই একটি দল পৃথিবীর বড় বড় নগরীগুলোতে বসবাস করে যারা এমনকি পম্পে শহরের লোকদের সীমাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।

যেসব সমাজ আমরা অনুসন্ধান করে দেখেছি তারা সবাই প্রাকৃতিক দুর্যোগাবলী, যেমন, ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যা ইত্যাদির মাধ্যমে শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছে। একইভাবে সেসব সমাজ বিপথগামী হয় এবং অতীত লোকদের পাপাচারগুলো বহাল রাখার সাহস করে তারা একই পদ্ধতিতে শাস্তি পেয়ে যাবে।

ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, আল্লাহ তায়ালা যখনই তাঁর ইচ্ছা হবে, তখনই যেকোন ব্যক্তি কিংবা যেকোন জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। কিংবা তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে এই দুনিয়ায় স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে দিয়ে পরকালে তাকে শাস্তি দেবেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেনঃ

"অনন্তর প্রত্যেককে তাহাদের অপরাধের দায়ে আমি গ্রেফতার করিলাম, পক্ষান্তরে তাহাদের কাহারও প্রতি প্রচণ্ড ঝটিকা প্রেরণ করিলাম, আর তাহাদের কতিপয়কে ভীষণ বিকট ধ্বনি আসিয়া আক্রান্ত করিল, আর তাহাদের কতিপয়কে ভূতলে প্রোথিত করিলাম, আর উহাদের কতিপয়কে আমি (পানিতে) নিমজ্জিত করিলাম। আর আল্লাহ এমন ছিলেন না যে তাহাদের প্রতি অবিচার করিতেন, কিন্তু তাহারাই (দুষ্টাচারে) নিজেদের প্রতি অবিচার করিয়াছিল।"

— সূরা আনকাবুত ঃ ৪০

কোরআন আরও একজন বিশ্বাসী লোকের কথা বলে যিনি ফেরাউনের পরিবারের লোক ছিলেন, আর তিনি মূসা (আঃ)-এর সময়কালে বর্তমান ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর ঈমানকে গোপন রেখেছিলেন। তিনি তাঁর জনগণকে বলেছিলেন ঃ

"হে আমার লোক সকল! আমি তোমাদের সম্বন্ধে অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনুরূপ বীভৎস দিবসের আশংকা করিতেছি যেমন নূহ সম্প্রদায় এবং আ'দ ও সামূদ এবং তাহাদের পরবর্তীদের (অর্থাৎ লূত সম্প্রদায় ও প্রমুখ) অবস্থা হইয়াছিল আর আল্লাহ তায়ালা বান্দাগণের উপর কোনরূপ অবিচার করিতে ইচ্ছা করেন না।

আর হে আমার কওম! আমি তোমাদের সম্বন্ধে সেই দিনের আশংকা করিতেছি যেই দিন ডাকাডাকি হইবে। যেই দিন (হাশরের মাঠ হইতে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া (দোযখের দিকে) ফিরিবে (তখন) তোমাদিগকে খোদার নিকট হইতে উদ্ধারকারী কেহ হইবে না, আর যাহাকে আল্লাহই বিপথগামী করেন তাহার পথ প্রদর্শক কেহ নাই।"

— সূরা মু'মিন ঃ ৩০-৩৩

সকল নবীগণই তাঁদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছেন, বিচার দিনের প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, আর ঈমান গোপনকারী ফেরাউনের পরিবারের এই বিশ্বাসী ব্যক্তিটির ন্যায় পয়গম্বরগণও তাদেরকে আল্লাহর শাস্তির ভয়ে ভীত করতে চেষ্টা করেছেন। এই সকল নবী ও রাসূলগণ তাঁদের সম্প্রদায়ের কাছে এই বিষয়গুলো বারংবার ব্যাখ্যা করে তাঁদের জীবন পার করে দিয়েছেন। তথাপি, বেশির ভাগ সময়ই যে সম্প্রদায়ের কাছে তারা প্রেরিত হতেন তারা তাঁদেরকে মিথ্যাবাদিতা, পার্থিব লাভের অন্বেষণে থাকা, কিংবা তাদের উপরে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত করত। আর কখনও এই নবীগণের বক্তব্য চিন্তা না করেই এবং নিজেদের কর্মের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন না তুলে নিজেদের ভ্রান্ত প্রথারই অনুসরণ করে গিয়েছে। তাদের কেউ কেউ অন্যায়ের ক্ষেত্রে আরও বেশি অগ্রসর হয়েছে এবং ঈমানদারগণকে হত্যা করার কিংবা তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা চালিয়েছে।

যাঁরা নবীগণকে মেনে নিয়ে অনুসরণ করেছিল এমন বিশ্বাসীদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। যাই হোক, এই বিদ্রোহী সম্প্রদায়গুলোর ক্ষেত্রে আল্লাহ কেবল নবী ও তাঁদের অনুসরণকারীদের রক্ষা করেছেন।

হাজার হাজার বছর কেটে গেলেও আর স্থান, আচার পদ্ধতি, প্রযুক্তি ও সভ্যতায় পরিবর্তন আসা সত্ত্বেও পূর্বোল্লিখিত সমাজ কাঠামো এবং অবিশ্বাসীদের প্রথাসমূহে তেমন বেশি কোন পরিবর্তন হয়নি। পূর্বে আমরা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছি যে, আমরা যে সমাজে বাস করছি তার কিছু কিছু অংশে কোরআনে বর্ণিত সমাজের দুর্নীতিগ্রস্ত গুণাবলীর সবগুলোই বিদ্যমান রয়েছে। যে সামূদ জাতি মাপজোখে পরিমাণে কম দিত (বিক্রির বেলায়) ঠিক তাদের মতই বর্তমানে অসংখ্য জোচ্চোর ও প্রতারক বিদ্যমান রয়েছে। এখানে সমকামীদের সমাজ রয়েছে। যখনই কোন অনুষ্ঠান হয় তখনই তাদের রক্ষার্থে কথা ও কাজ করা হয়। এই সমাজের সদস্যরা লূত সম্প্রদায়ের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়, যে সম্প্রদায়টি (লূত সম্প্রদায়) যৌন বিকৃতির চরমে গিয়ে পৌছেছিল। সমাজের বিরাট অংশ জুড়ে আছে সেই সকল লোকেরা যারা সাবা সম্প্রদায়ের ন্যায় অকৃতজ্ঞ ও বিদ্রোহী, ইরামের লোকদের ন্যায় সম্পদপ্রাপ্ত হয়েও অকৃতজ্ঞ, নূহ সম্প্রদায়ের ন্যায় অবাধ্য ও বিশ্বাসীদের অসম্মানকারী এবং আ'দ জাতির ন্যায় সামাজিক ন্যায়বিচারের ব্যাপারে বধির এগুলো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ নিদর্শন . . . .। আমাদের সবাইকে সবসময় মনে রাখতে হবে যে, সমাজে যেকোন পরিবর্তনই আসুক না কেন প্রযুক্তিগত উন্নতি বা প্রাগ্রসরতার যেকোন পর্যায়েই তারা থাকুক না কেন অথবা তাদের শক্তি যাই হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে এসবের কোনই গুরুত্ব নেই। এগুলোর কোন কিছুই আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারে না। কোরআন আমাদের সবগুলো সম্ভাবনার বাস্তবতার কথা মনে করিয়ে দেয়ঃ

"তাহারা কি ধরাতলে চলাফেরা করে নাই? যাহাতে তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়া লইত যে তাহাদের পূর্বে যাহারা অতীত হইয়া গিয়াছে তাহাদের পরিণাম ফল কি হইল ?

তাহারা ইহাদের অপেক্ষা শক্তিতে ছিল অধিকতর এবং তাহারা জমিনকে বর্ষণ বপনও করিয়াছিল এবং যে পরিমাণ জমি ইহারা আবাদ করিয়াছে তাহারা তদপেক্ষা অধিক আবাদ করিয়াছিল এবং তাহাদের নিকটও তাহাদের নবীগণ মোজেযা সহকারে আসেন বস্তুত আল্লাহ পাক এমন ছিলেন না যে তাহাদের প্রতি অবিচার করিতেন কিন্তু তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপরে অবিচার করিতেছিল।

— সূরা রূম ঃ ৯

"আপনি পবিত্র, আমাদের জ্ঞান নাই, কেবল ততটুকুই আছে যাহা আপনি আমাদিগকে শিখাইয়াছেন, নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী, বিচক্ষণ, প্রজ্ঞাময়"।

— সূরা আল-বাকারা ঃ ৩২

Notes

১. Max Mallowan, Nuh's Flood Reconsidered, Iraq:XXV-2,1964, P.66.

২. Ibid.

৩. Muazzez Ilmiye Cig, Kuran, Incil ve Tevrat in Siumer'deki kokleri, 2.b., Istanbul: Kaynak, 1996.

৪. Werner Keller, Und die Bibel hat doch recht (The Bible as History; a Confirmation of the Book of Books), New Work : William Morrow, 1964, pp. 25-29.

৫. Max Mallowan, Nuh's Flood Reconsidered. Iraq: XXVI-2, 1964, p. 70.

৬. Werner Keller, Und Die Bibel hat doch recht (The Bible as History; a Confirmation of the Book of Books). New York: William Morrow, 1964, pp. 23-32.

৭. "Kish", Britannica Micropaedia, Volume 6, p. 893.

৮. "Shuruppak", Britannica Micropaedia, Volume 10, p. 772.

৯. Max Mallowan, Early Dynastic Period in Mesapotamia, Cambridge Ancient History 1-2, Cambridge: 1971, p. 238.

১০. Joseph Campbell, Eastern Mythology, p.129.

১১. Bilim ve Utopya, July 1996, 176. Footnote p. 19.

১২. Everett c. Blake, Anna G. Edmonds, Biblical Sites in Turkey, Istanbul: Redhouse Press, 1977, p. 13.

১৩. Werner Keller, Und Die Bibel hat doch recht (The Bible as History: a Confirmation of the Book of Books), New York: William Morrow, 1964 p. 75-76.

১৪. "Le Monde de la Bible", Archeologie et Histoire, July-August 1993.

১৫. Werner Keller, Und die Bibel hat doch recht (The Bible as History: a Confirmation of the Book of Books), New York: William Morrow, 1964, p.76.

১৬. Ibid, pp. 73-74.

১৭. Ibid, pp. 75-76.

১৮. G. Ernest Wright, "Bringing Old Testament Times to Life", National Geographic, Vol. 112, December 1957, p. 833.

১৯. Thomas H. Maugh II, "UBar, Fabled Lost City, Found By La Team", The Los Angeles Times, 5 February 1992.

২০. Kamal Salibi, A History of Arabia, caravan Books, 1980.

২১. Bertram Thomas, Arabia Felix: Across the "Empty Quarter" of Arabia, New York: Schrieber's Sons 1932, p.161.

২২. Charlene Crabb, "Frankincense", Discover, January 1993.

২৩. Nigel Groom, Frankincense and Myrrh, Bongman, 1981, p.81.

২৪. Ibid. p. 72.

২৫. Joachim Chwaszcza, Yemen, 4PA Press, 1999.

২৬. Ibid.

২৭. Brian Doe, Southern Arabia, Thames and Hudson, 1971, p. 21.

২৮. Ca M'Interesse, January 1993.

২৯. "Hicr", Islam Ansiklopedisi: Islam Alemi, Tarihi, Cografya, Etnografya ve Bibliyografya Lugati, (Encyclopedia of Islam: Islamic World, History, Geography, Ethnography, and Bibliography Dictionary) Vol. 5/1, p. 475.

৩০. Philip Hitti, A History of the Arabs, London: Macmillan, 1979, p. 37

৩১. "Thamuds", Britannica Micopaedia, Vol. 11, p. 672.

৩২. Brian Doe, Southern Arabia, Thames and Hudson, 1971, pp. 21-22.

৩৩. Ernst H. Gombrich, Gencler icin Kisa Bir Dunava Tarihi. (Translated into Turkish by ahmet Mumcu from the German original script, Eine Kurze Weltgeschichte Fur Junge Leser, Dumont Buchverlag, Koln, 1985), IStanbul: Inkilap Publishing House, 1997, p.25.

৩৪. Ernst H. Gombrich, The Story of Art, London MCML, The Phaidon Press Ltd. p. 42.

৩৫. Eli Barnavi, Historical Atlas of The Jewish People, London: Hutchinson, 1992, p. 4. "Egypt", Encyclopedia Judaica, Vol. 6, p. 481 and "The Exodus and Wanderings in Sinai", Vol. 8, p. 575; Le Monde de la Bible, No: 83, July-August 1983, p. 50; Le Monde de la Bible, No: 102, January-February 1997, pp. 29-32; Edward F. Wente, The Oriental Institute News and Notes, No: 144, winter 1995; Jacques Legrand, Chronicle of the World, Paris: Longman Chronicle, Sa International Publishing, 1989, p. 68; David Ben Gurion, A historical Atlas Of the Jewish People, New York: Windfall Book, 1974, p. 32.

৩৬. http: // www2. plaguescape. come /a/plaguescape.

৩৭. "Red Sea", Encyclopedia Judaica, Volume 14, pp.14-15.

৩৮. David Ben-Gurion, The Jews in Their Land, New York: A Windfall book, 1974, pp. 32-33.

৩৯. "Seba" Islam Ansiklopedisi: Islam Alemi, Tarihi, Cografya, Etnografya ve Bibliyografya Lugati, (Encyclopedia of Islam: Islamic World, History, Geography, Ethnography, and Bibliography Dictionary) Vol.10, p. 268.

৪০. Hommel, Explorations in Bible Lands, Philadelphia: 1903, p. 739.

৪১. "Marib", Islam Ansiklopedisi: Islam Alemi, Tarihi, Cografya, Etnografya ve Bibliyografya Lugat, Volume 7, p. 323-339.

৪২. Mawdudi. Tefhimul Kuran, Cilt 4, Istanbul: Insan Yayinlari. p. 517.

৪৩. Werner Keller, Und die Bibel hat doch recht (The Bible as History: a Confirmation of the Book of Books), New York: William Morrow, 1956, p. 207.

৪৪. New Traveller's Guide to Yemen, p.43.

৪৫. Musa Baran, Efes, pp.23-24.

৪৬. L.Massignon, Opera Minora, v.III, pp.104-108.

৪৭. At-Tabari, Tarikh-al Umam.

৪৮. Muhammed Emin.

৪৯. Fakhruddin ar-Razi.

৫০. From the commentaries of Qadi al-Baidawi, an Nasafi, al-Jalalayn and at-Tibyan, also Elmalili, Nasuhi Bilmen.

৫১. Ahmet Akgunduz, Tarsus ve Taribi ve Ashab-i Kehf. (Tarsus and History and the Companions of the Cave).